হতাশ হইনি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

হতাশ হইনি

১ম খণ্ড

হতাশ হবেন না গ্রন্থমালার লেখকের বিচিত্র
জীবন অভিজ্ঞতার কাহিনী

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

HATASH HAINI
by Dr Partha Chattopadhyay
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing,
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

প্রচ্ছদ মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি

ISBN 81 7612 332 6

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং লোকনাথ লেজারোগ্রাফার্স
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

পিতৃদেব
সঞ্জীব বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের বই :

হতাশ হবেন না ১ম
হতাশ হবেন না ২য়
হতাশ হবেন না ৩য়
হতাশ হবেন না ৪র্থ
হতাশ হবেন না ৫ম
হতাশ হবেন না ৬ষ্ঠ
কেমন করে মানুষ চিনবেন
কেমন করে বাস্তববাদী হবেন
ঠাকুর রামকৃষ্ণের শেষ জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে অনবদ্য উপন্যাস শেষ-অমৃত
নির্বাচিত সরস গল্প
কিশোর ভৌতিক গল্প সমগ্র

গোড়ার কথা

গত দু-দশক ধরে হতাশ হবেন না গ্রন্থমালার মাধ্যমে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার সান্নিধ্যে এসেছি। তাঁরা অনেকে চিঠি লিখেছেন, অনেকে দেখা করেছেন। আমি তাঁদের সবিনয়ে জানিয়েছি, আমি কোন মনস্তত্ত্ববিদ নই, আমার কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই, আমি পেশায় চিকিৎসকও নই, আমি জীবনের বন্ধুর পথে আপনার এক সহযাত্রী। আমি জ্ঞানে ও বিদ্যায় আপনাদের অনেকের চেয়ে পিছিয়ে। আমার যেটুকু সম্পদ তা দুর্লভ জীবন-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ শিক্ষা। জীবনে প্রতি মুহূর্ত ঘা খেতে খেতে শিখতে হয়। অনেকের এক প্রজন্ম লেগে যায় শিখতে। অভিজ্ঞতারও যেমন শেষ নেই, তেমনি শিক্ষারও শেষ নেই।

'হতাশ হইনি' অকপটে লেখা আমার স্বীকারোক্তি। এ ধরনের আত্মজীবনী বাংলা ভাষায় বিরল বলে অনেকের চোখে লাগবে। কারও কারও গায়ে। কিন্তু মুখ্যত আমি দেখাতে চাই গরিবের ছেলের অতি সামান্য সাফল্য অর্জন করতে গেলেও তীব্র সংগ্রাম করতে হয়। যে কোন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়তে হয়। বার বার গড়তে হয়, বার বার ভেঙে যায়। তদুপরি সাফল্যের দরজায় কুমির-হাঙররা বসে থাকে। দেখিয়েছি সামান্য ভুল করলেই ব্যর্থতা আসে।

জীবন বড় মধুর — বিচিত্র জীবন মধুরতর। জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। ব্যর্থতা, বিচ্ছেদ, বেদনা, অশান্তি, জীবনকে যেমন বিষাদগ্রস্ত করে তোলে, তেমনি বৈচিত্র্যেও ভরিয়ে দেয়। বৈচিত্র্যই আনন্দ।

কোন মানুষই সম্পূর্ণ সফল নয়, কোন মানুষই সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়। মানুষ অন্যের কাছে সত্যি কথা বলে না। চেপে যায় নিজের দুর্বলতা, নিজের ব্যর্থতা। শুধু সাফল্যকেই বড় করে দেখায়। তাই আমরা ভাবি অমুকের জীবন বুঝি নিশ্ছিদ্র সাফল্যে ভরা। আমরা তাদের ঈর্ষা করি। মূঢ় তারা, যারা জীবনের গতি-প্রকৃতিকে বোঝে না।

'হতাশ হইনি' বইটির মাধ্যমে আমার জীবন-অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি তুলে ধরলাম। লেখার চেষ্টা করেছি আন্তরিকতার সঙ্গে। যেখানে দেখেছি কোন কোন ঘটনা অন্যকে একটু বিব্রত করতে পারে সেখানে চরিত্রগুলির নাম বদলে দিয়েছি। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা এই বই-এর উদ্দেশ্য নয়। কারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। রাগ বিদ্বেষ, ঘৃণা কিছুই নেই। কে কোন পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গে অমানবিক ও অন্যায্য

ব্যবহার করেছেন আমি তার বিশ্লেষণ করেছি। আমাকে অনেকে এখনও পছন্দ করেন না, তাঁদের প্রতিও আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ প্রতিটি মানুষের মানসিক গঠন, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আলাদা। তাই একজন হয়তো আমাকে দেবতা ভাবেন। আর একজন দানব। একজনের কোন উপকার করিনি, তাও তিনি আমাকে ভালবাসেন; আর একজনের জন্য সব কিছু উজাড় করে দিয়েছি তবু তিনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চলেন। আমি আমার বিবেকের কাছে খাঁটি থাকতে পেরেছি এতেই তৃপ্তি। তবু জনসংযোগ দিয়ে অনেক মানুষকে বশে আনা যায়, আমি যদি কাউকে আমার বশে আনতে না পারি তাহলে আমি মনে করি তা আমাব জনসংযোগের খামতি।

আমি নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে অসংখ্য ঘটনাপঞ্জী বর্ণনা করে গিয়েছি। কোন ঘটনাই অতিরঞ্জিত নয়। ঘটনাগুলি এভাবেই ঘটেছে। ধরে নিন আমি অসংখ্য ঘটনার রিপোর্টিং করেছি। আমার জীবনও একটা ঘটনা—ঘটনা না বলে দুর্ঘটনাও বলতে পারেন। কারণ প্রতিটি মানুষের জন্মই একটি দুর্ঘটনা।

হতাশ হবেন না গ্রন্থমালার পরিপূরক গ্রন্থই এই হতাশ হইনি। আপাতত দু খণ্ডে এই বই বেরুবে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল। পরবর্তী খণ্ড আরও চিত্তাকর্ষক।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে কিছু মানুষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়েছে। আশা করি তাঁরা কিছু মনে করবেন না। তেমনি আমার চলার পথে যে সব মানুষ অনিবার্যভাবে এসে পড়েছেন তাঁদের কথাও লিখতে হয়েছে।

দুর্বার নিয়তি আমাকে এখন এই রাজ্য থেকে সরিয়ে অসমে নিয়ে গিয়েছে। আমি এই বই লেখার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি, সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্ষীণ। অথচ একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমৃত্যু সাংবাদিকতায় জড়িয়ে থাকব।

জীবনে এমন ঘটে, এমন হয়। স্রোতের ফুলের মত ভাসতে ভাসতে কে কোথায় জড়িয়ে পড়ে। তাই জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অনিশ্চয়তা আছে বলেই জীবন এমন মধুর।

আমি যখন যেখানেই থাকি না কেন, আমার কলকাতার ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখবেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শান্তম্
বি সি ১১৮, সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৬৪

হতাশ হইনি

এক

জনারণ্যে একা

১৯৫৯ সালে ২৭ এপ্রিল বনগাঁ লোকাল থেকে কয়েক হাজার যাত্রীর সঙ্গে একটি যুবকও শিয়ালদা স্টেশনে নামল। যুবকটির পরনে পাজামা। গায়ে গেরুয়া রঙের খাদির পাঞ্জাবি। রোগা, মাঝারি হাইট। মুখে সরু গোঁফ। চোখে চশমা।

যুবকের ডান হাতে ধরা ছিল একটি রেক্সিনের স্যুটকেশ। তার সামনের দিকটা বিবর্ণ। একটি লক বিকল বলে সেটি শক্ত সুতো দিয়ে বাঁধা।

স্যুটকেশের ভেতর তার একটি জামা, একটি প্যান্ট, একটি গামছা, আর কিছু লেখার কাগজ।

তার পকেটে নগদ ত্রিশ টাকা। এই ত্রিশ টাকা আর ভাঙা স্যুটকেশটিকে সম্বল করে সে দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর।

যুদ্ধজয়ের আর একটি অস্ত্র তার পকেটের মধ্যে ছিল। ছোট্ট একটি অস্ত্র, কিন্তু সে মনে করত তার শক্তি অসীম। যে কোনও মুহূর্তে সেই অস্ত্রটি যে কোনও বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিতে পারে।

সেই অস্ত্রটি তার পকেটের একটি কলম। নেহাতই সাধারণ ফাউন্টেন পেন। বাজারে তার দাম পাঁচ-ছ টাকার বেশি নয়। এই কলমটিকে সম্বল করেই সে বিশ্বজয়ে বেরিয়েছে।

ওপরের যে যুবকটির পরিচয় পেলেন পাঠকেরা সেই যুবকটি আমি।

সেই যে কলম নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা শুরু করেছিলাম আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, সেই কলম নিয়ে আজও যুদ্ধ করে যাচ্ছি। কখনও জিতেছি। কখনও হেরেছি। কখনও ক্ষত-বিক্ষত, আহত রক্তাক্ত হয়ে শিবিরে ফিরে এসেছি। কখনও শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছি বিজয়কেতন। কিন্তু যুদ্ধ থামাইনি এখনও। যদিও মন বার বার বলছে, অনেক তো হল, এবার ক্ষান্ত দাও। মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, তুমি এইবার হও শান্ত।

আমার ৪০ বছরের কলম নিয়ে যুদ্ধের ইতিহাস একজন অতি সাধারণ মানুষের ইতিহাস। পাঠক ভাবতে পারেন, সাধারণ মানুষের কথা তা ইতিহাসে কেন? ইতিহাস তো রাজ-রাজড়ার কাহিনী। নিদেন পক্ষে ভি আই পি তথা বিশিষ্ট মানুষের কথা। যুদ্ধ করতে করতেই যে পদাতিকের দিন কাটে অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেয় যে, কোন যুদ্ধজয়ের ইতিহাসেই কিন্তু তার নাম থাকে না। ইতিহাস তৈরি হয় জেনারেল ও রাজাদের নিয়ে।

তবু সাধারণ মানুষের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় না। কারণ একজন বিশিষ্ট মানুষের চেয়ে একজন সাধারণ মানুষের জীবন, বেশির ভাগ মানুষের জীবনের কাছাকাছি। মহাপুরুষকে অনুসরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সংগ্রামী সাধারণ মানুষকে দেখে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া অনেক বেশি সহজ। একটি উদাহরণ দেই। সূর্য দূর থেকেই সুন্দর। সূর্যালোক সমস্ত সৃষ্টির মূলে। কিন্তু একথাও সত্যি, সূর্য থেকে সাধারণ মানুষ তার ঘরের প্রদীপটুকু জ্বালাবার মত শক্তি পায় না। এজন্যই দরকার বিকল্প শক্তি ; সাধারণ বারুদ। যা সহজেই আগুন তৈরি করতে পারে।

আর সাফল্য ও ব্যর্থতা? আমার মতে কোন মানুষ সম্পূর্ণ সফল নয়। কোন মানুষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়। এমন অনেক সফল ও কৃতী মানুষকে দেখেছি, যাদের অভাবিত সাফল্য দেখে অনেকে জ্বলে পুড়ে মরছেন ঈর্ষায়। অসংখ্য দুর্লভ সম্মানের মুকুট তাঁদের মাথায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন সামান্য নারীর কাছে। ভালবাসা পেয়েছেন লক্ষ মানুষের। কিন্তু হৃদয় পাননি নিজের স্ত্রী-পুত্রের। আবার সমাজে ধিকৃত বহু মানুষ আপনজনের কাছ থেকে পেয়েছেন হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা।

উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী অনেক মানুষকে দেখেছি এক চক্ষু হরিণের মত তাকিয়ে থেকেছেন খ্যাতি ও ক্ষমতার দিকে। অন্যদিকে সাধারণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি অতিমলিন। দেখেছি সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব আবার মহতের অতি সাধারণ আচরণ। দেখেছি সাধুর অহঙ্কার, আদর্শবানের কাপট্য, অনুজের ঔদ্ধত্য, জ্যেষ্ঠের অনুদারতা। বিদ্বানের সংকীর্ণতা, ধনীর লোভ, গরীবের আত্মত্যাগ।

দেখেছি খুব কাছে থেকে চার দশকের ইতিহাসকে। ইতিহাসের সেই সব কুশীলবদের। দেখেছি মানুষকে ইতিহাস তৈরি করতে আবার ইতিহাসকেও মানুষ তৈরি করতে।

তাই আমার কথা, আমারই একান্ত কথা নয়। শুধু আমারই বারমাস্যা নয়— আমার সময়ের ইতিকথা। শুধু সময়ের ইতিহাস নয়, আমারও মত অনেকেরই জীবন সংগ্রামের কথা। জীবনের কাছে বার বার পর্যুদস্ত হয়ে, হালভাঙা নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মত স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতেও কী ভাবে নিজের ওপর আস্থা বজায় রেখেছি। কেন হতাশ হইনি, একথা তারই ইতিকথা।

কলকাতায় আসাটা আমার দরকার হয়ে পড়েছিল এই জন্যই যে দেশের বাড়িতে আর একবেলা অন্ন সংস্থান করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল আমার পক্ষে।

ছাব্বিশে এপ্রিল বি-এ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে মাকে বলেছিলাম কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছি মা।

কালই?

হ্যাঁ, আর দেরী করে কি হবে। যেতে যখন হবেই তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ব্রজেনবাবু বললেন কালই চলে এসো কলকাতায়।

ব্রজেনবাবু মানে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাদের বাংলার লেকচারার। আমারই মত

যুদ্ধ করতে করতে শেষ জীবনে কলেজে অধ্যাপক হয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকেই চাকরি করছিলেন। চাকরি করতে করতেই ইন্টারমিডিয়েট, বি এ, এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিকেশন বিভাগে অফিসার হন। শেষমেশ সে চাকরিতেও ইস্তফা দিয়ে বাংলার অধ্যাপনা নিয়ে চলে আসেন গোবরডাঙ্গা কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির সুবাদে অনেক সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। যেমন অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ) নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রশান্ত সরকার. ফণী চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ।

তাঁদের সঙ্গে মিলে একটি সংবাদ সাপ্তাহিকের পরিকল্পনা করেন ব্রজেন বাবু। নাম দর্পণ। সম্পাদক ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৫৮ সালে লাহা পেন্ট হাউস, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু থেকে প্রকাশিত হত দর্পণ। ব্রজেনবাবু কলেজে আসার সময় ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে আসতেন দর্পণের কপি। সে সময় লাইনো টাইপে ছাপা, আগা-গোড়া পেশাদারিত্বে ভর্তি এই পত্রিকাটি দেখে আমার লোভ হত লেখার জন্য। ব্রজেনবাবু আমার একটি দুটি লেখা ছাপাতেনও।

একদিন বললেন, বি-এ পরীক্ষা দিয়ে কি করবে ঠিক করেছ?

তরুণকান্তি ঘোষ আমায় বলেছেন, যুগান্তরে চাকরি দেবেন, সেই আশায় আছি স্যার।

তাহলে চলে এসো কলকাতায়। দর্পণে কাজ শিখে নাও। রেজাল্ট বেরুতে তো তিনমাস।

কলকাতায় যেতে তো আপত্তি নেই স্যার। কিন্তু একটা থাকার জায়গাতো চাই।

হ্যাঁ তা তো চাই। সেটা তোমাকেই যোগাড় করতে হবে। যতদিন না চাকরি পাও আমি বরং তোমায় কিছু হাত খরচার ব্যবস্থা করে দেব। তবে এমনি দেব না। আমাকে একটা বই লিখতে হবে। এম-এ ক্লাশের ছেলেদের জন্য সাহিত্য সমালোচনা ; সেটি লেখার ব্যাপারে তুমি আমায় সাহায্য করবে।

বাবাকে বাড়ি গিয়ে বললাম। বাবা বললেন আমি গিয়ে শিবদাসকে বলে দেখি ওদের বাড়ি তোমায় থাকতে দেয় কিনা। শিবদাস মানে আমার জ্যেঠতুতো বোনের স্বামী। আমাদের জামাইবাবু। দীনেন্দ্র স্ট্রিটে তাঁর বাড়ি। নিরহঙ্কার মানুষ। পরনিন্দা কখনও তার মুখে শুনিনি। ছোটবেলা থেকে আমায় ভালবাসতেন। শুনে রাজি হয়ে গেলেন।

জামাইবাবুদের এক সময় স্টিমারের ব্যবসা ছিল। যশোর খুলনায় কপোতাক্ষতে লঞ্চ সার্ভিস ছিল। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। তবে দেশ খুলনা হলেও দীনেন্দ্র স্ট্রিটে জামাইবাবুর পৈত্রিক বাড়ি। সেখানেই থাকতেন তিনি।

জামাইবাবু টুকটাক ব্যবসা করতে চেষ্টা করেছেন, জমেনি। বাড়ি ভাড়ার আয়েতেই তাঁদের সংসার চলত। জামাইবাবুর আমি বার্ডেন হতে চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম সাময়িক মাথা-গোঁজার আশ্রয়। বাবা জামাইবাবুকে বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। খবর শুনেই আমি লাফাতে লাফাতে গিয়ে ব্রজেনবাবুকে খবর দিলাম। স্যার থাকার জায়গা পাওয়া গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে?

হ্যাঁ স্যার। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে। ওখান থেকে রোজ এসপ্ল্যানেড যেতে অসুবিধা হবে না।

তুমি তাহলে আর দেরী কোর না। কালই চলে এসো।

কালই?

হ্যাঁ, আজতো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। গোরডাঙ্গায় তোমার আর কাজ কি। একটা দিন সময় নষ্ট করা মানে জীবন থেকে একটা দিন চলে যাওয়া।

ব্রজেনবাবুর কথা মত আর দেরী না করে পরদিনই থার্ড ট্রেনে উঠে বসলাম।

তখনও পর্যন্ত শিয়ালদা সেকসনে ইলেকট্রিফিকেশন হয়নি। এখনকার মত বীভৎস ভিড়ও হত না বনগাঁ লোকালে। বসার জায়গা পাওয়া যেত। সকালবেলার দিকে তখন চারটি ট্রেন যেত কলকাতায়, আমরা বলতাম, ফার্স্ট ট্রেন, সেকেন্ড ট্রেন, থার্ড ট্রেন। ফোর্থ ট্রেন যেত নটার সময়। গোবরডাঙ্গা থেকে শিয়ালদা পৌঁছতে তখন লাগত পাকা দু ঘণ্টা।

কলকাতা আমাদের কাছে ছোটবেলা থেকেই ছিল স্বপ্নের শহর। সকলেই স্বপ্ন দেখত একদিন একদিন না একদিন কলকাতায় গিয়ে পাকাপাকি ভাবে বাসা বাঁধবে।

আমাদের স্বপ্ন কখনও কলকাতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। যদি আমার ছোটবেলা কলকাতাতেই কাটত তাহলে হয়তো কলকাতা ছেড়ে আর দূরে কোথাও যাবার জন্য মন উতলা হত। যেমন কলকাতা থেকে আমারই মত ভাগ্যান্বেষণে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিল আরও বহু তরুণ। তারা আজ অধিকাংশই কর্মক্ষেত্রে সফল। অনেকেই কোটি টাকার মালিক। তাঁরা টাকা চেয়েছিলেন, টাকা পেয়েছেন। কিন্তু আমি তো টাকা পয়সা চাইনি আমার ভাগ্যের কাছে। আমি শুধু চেয়েছিলাম স্বেচ্ছা সৈনিকের মত কলম নিয়ে যুদ্ধ করে যেতে।

একটি কবিতায় লিখেছিলাম —

'তোমরা চেয়েছ কেউ বেয়নেট
বন্দুক, কেউ কাস্তে।
চেয়েছ অর্থ, ঘটাতে অনর্থ
আমি চাহিয়াছি বাঁচতে।
বাঁচার অর্থ, নয় বার বার মরা
জীবন যুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়া।
কোন প্রলোভনে আর নই আমি লুব্ধ
কলম, আমার কলম নিয়েই যুদ্ধ।

কলকাতায় আসতাম ছোটবেলা থেকেই। গ্রামের ছায়াঘেরা শান্ত পরিবেশে মানুষ হলেও কেন জানি না কলকাতা আমাকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করত।

আমার পিসিমার বিয়ে হয়েছিল একজন জজের সঙ্গে। পিসেমশাই রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন বালিগঞ্জে। প্রতি বছর বড় দিনের সময় বাবা আমাকে পিসিমার বাড়ি

নিয়ে আসতেন। দু এক দিন থাকতাম।

পিসিমার তিনতলা বাড়ি। ওই বাড়িতে আমার আকর্ষণ ছিল আমার আর এক ভাইপো বাবলুর গল্পর বই। দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী, শারদীয় শিশুসাথী আরও নানা গোয়েন্দা গল্প পড়তে পড়তেই আমার সময় চলে যেত।

আমি নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম ওই বইগুলি পড়েই।

আর একটি আকর্ষণ ছিল কলকাতার রাস্তা। কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। বাড়ি দেখতাম, মানুষ দেখতাম, ভাল পোশাক পরা কলকাতার ছেলে-মেয়েদের দেখতাম।

সে সময় ঘুম ভাঙত রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দে। হাইড্রেনটের জল পাইপে করে ভিজিয়ে দেওয়া হত রাস্তা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝকঝকে হয়ে উঠত কলকাতার রাস্তাঘাট। বাবার সঙ্গে মর্নিংওয়াকে যেতাম, সাদার্ন এভিন্যু ধরে লেকের দিকে। সে সময় সাদার্ন এভিন্যুর অন্যতম আকর্ষণ ছিল জাহাজ বাড়ি। মাল্টি স্টোরিড কোন বাড়ির চিহ্ন ছিল না সে সময়। লেকের পাশে ছিল মিলিটারিদের তৈরি লেক হাসপাতালের লম্বা ব্যারাক। গোলপার্কের দিকে যত এগিয়ে যাওয়া যেত চোখে পড়ত ঝোপ ঝাড়। মনে আছে এখন যেটি হাল ফ্যাশনের অভিজাত পল্লী কেয়াতলা, সেখানে আমার এক মামার জমি ছিল। সেই জমি দেখতে গিয়েছিলাম। চারিদিকে বাগান গাছ গাছালি। ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা জমি। আরও এগুলে গোলপার্ক। রামকৃষ্ণ মিশনের বাড়ি তখনও হয়নি। ওদিকটা বাগান আর ধানক্ষেত ছিল।

এইসব দেখে কলকাতার রোম্যান্টিক স্বপ্ন বুকে নিয়ে গ্রামে ফিরতাম। পিসিমার বাড়িতে আমরা রবাহুত কিনা, গরিব আত্মীয় বলে কম খাতির পাচ্ছি কিনা এনিয়ে একদম ভাবিনি।

মনে আছে উজ্জ্বলা সিনেমায় বাবা আমাকে সিনেমা দেখাতে গিয়ে গিয়েছিলেন— চন্দ্রশেখর। সে সময় ঝকঝক তকতক করত উজ্জ্বলা। চন্দ্রশেখর সে সময়কার হিট ছবি। সেই প্রথম আশোককুমার ও কানন দেবীর নাম জানলাম। আজও ছবির নানা সিকোয়েন্স মনে আছে। বড়দিনের সময় একবার ভবানীপুরে মেলায় একটি ছেলের দুটি মাথা দেখেছিলাম। অবাক বিস্ময়ে অনেকদিন ধরে ভাবতাম এও কি সম্ভব।

কলকাতা আমার চোখে যে মোহাঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে তাতে আমি কলকাতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। আমাকে কলকাতা টানত। দুর্নিবার ভাবে টানত।

টানাটানির সংসার। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্লিষ্ট হয়ে পড়লে কলকাতা আমায় হাতছানি দিত আয় আয়।

শিয়ালদা থেকে নেমে মানিকতলা যাবার একটি প্রাইভেট বাস ধরলাম। তখন বাসের নূন্যতম ভাড়া ছিল ৭ পয়সা। আসলে ভাড়া ছিল এক আনা। এখন কেউ আনা কাকে বলে জানে না। দশমিক মুদ্রা প্রচলনের আগে ষোল আনা দিলে এক টাকা পাওয়া যেত। আধুলি, সিকি, দু আনি, এক আনা, দু পয়সা ছিল তামার। ছোট বেলায় আমি আধ পয়সাও দেখেছি। সাত বছর বয়সে আমি যখন প্রথম বাজার করতে যাই। তখন এক

পয়সায় এক ভাগা পুঁটি মাছ কিনেছিলাম। এখনকার হিসেবে পাঁচশ গ্রাম। দাম এক পয়সা।

মানিকতলায় নেমে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়িতে এলাম। এই রাস্তা আমার অপরিচিত নয়। কলেজে উঠে অনেকবার এক একা কলকাতা এসেছি। দিদির বাড়ি অনেকবার গিয়েছি। রামমোহন রায় রোডে জ্যাঠামশাইর বাড়িও গিয়েছি অনেকবার।

বাগমারিতে একটি ছাপাখানায় আমার সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা বিদ্যার্থী ছাপাতে দিয়েছিলাম। সে সময় প্রায়ই আসতাম এই রাস্তায়।

মানিকতলায় নেমে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়িতে কড়া নাড়লাম।

জামাইবাবু বেরিয়ে এলেন। অভ্যর্থনা জানালেন। এসো এসো বাড়ির খবর ভালো তো সব? কাকীমা ভাল? কাকাবাবু এলেন না? বীণাদি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম করলাম।

বীণাদি বললেন তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে নিচের ঘরে। ঘরটা দেখে নেবে চল।

নিচে বাথরুমের পাশে একটা ঘর। উত্তর দিকে একটা জানালা। কিন্তু পাশেই একটি বড় বাড়ি থাকার জন্য আলো হাওয়া কিছুই আসে না। দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়। ঘরের মধ্যে একটি ক্যাম্প খাটও ছিল। কেমন ঘর তা বাছ বিচারের সময় নেই। ভিক্ষের চাল কাঁড়া না আকাঁড়া তা দেখার অধিকার নেই।

আমি যে আশ্রয় পেয়েছি তাতেই আমি ধন্য। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম। আমি কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছি। দৌড়ের প্রথম রাউন্ডটাতে আমি জিতে গেলাম।

দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়িতে প্রথম দিনটি দিদিদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করলাম। এবার আমার কাজ হল একটি ভাল খাবার জায়গা খুঁজে বার করা। কারণ রোজ রোজ তো আর দিদি জামাইবাবুর বার্ডেন হওয়া যায় না।

মানিকতলা ব্রিজের ঠিক নিচে ডানধারে একটি রেস্তোরাঁর সন্ধান মিলল। দুবেলা খেতে মাসে ষাট টাকা পড়াবে। আমার পকেটে ত্রিশটি মাত্র টাকা। আয় বলতে তরুণ কান্তি ঘোষের দেওয়া মাসের ত্রিশ টাকা মাসোহারা। সেই মাসোহারার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। সেটি বলতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৫৬ সালে। কীভাবে একটি আশা আকাঙ্ক্ষার ভ্রূণের জন্ম হচ্ছে সেকথা জানতে পারবেন পাঠক। যুদ্ধ আমাকে খালি হাতেই করতে হবে সেই ধারণাই ছিল আমার। যেমন জন্মেছি ক্ষয়িষ্ণু এক জমিদার বংশে, বিত্তহীন এক পরিবারে এক অব্যবস্থচিত্ত পিতার সন্তান আমি, তার খেসারত দিতে প্রস্তুতই ছিলাম। কিন্তু কি করে কে যে আমার হাতে কলম ধরিয়ে দিল। বলল যুদ্ধ করো যুদ্ধ করো। পিছন ফিরে দেখো না। এগিয়ে চল সামনে—

॥ দুই ॥

হায় চিল সোনালি ডানার চিল

দুপুরের খাওয়া সেরে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের সেই অন্ধকার ঘরটিতে এসে ঢুকলাম। আলো জ্বালতেই দু'তিনটে ইঁদুর ছুটে পালাল। দেওয়ালে অনেকদিন কলি ফেরেনি। সামনে

এক চিলতে খোলা উঠোনে কল থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ছে। দোতলায় দিদিরা থাকেন। তিনতলায় এক ভাড়াটিয়া পরিবার।

চৌকিতে একটি চাদর ও বালিশ পেতে দিলাম। ঘরে পাখা নেই। অবশ্য তখনও পর্যন্ত আমি পাখার তলায় কখনও ঘুমোইনি। আমাদের গোবরডাঙ্গার বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না। গরমের সময় হাত পাখাই সম্বল। যতদিন ছোট ছিলাম গরম লাগলে বাবাকে বাতাস করতে বলতাম। কখনও মাকে।

ভেতরের দিকে ঘর হওয়ায় বাইরের রোদ্দুর এ ঘরে ঢুকতে পারত না বলে ঘরটা ঠাণ্ডাই ছিল। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাসকে ছায়া-ছবির মত মনের পর্দায় প্রত্যক্ষ করে চলেছিলাম। একের পর এক ছবি আসছে, চলে যাচ্ছে। কোথা থেকে কেটে গেল জীবনের একুশটা বসন্ত।

চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি বাড়ির ছবি। তিন বিঘে জমির ওপর দুমহলের এক প্রাসাদ। সামনের দিকটা অক্ষত থাকলেও, তার ভেতরের দিকটা জীর্ণ হয়ে গেছে। পলেস্তারা খসে পড়ে কঙ্কালের পাঁজরের মত ইট বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ির সামনে একটি মাঠ। তার মধ্য দিয়ে বিশাল দুটি দরজা পেরিয়ে দেউড়ি। অর্থাৎ দারোয়ানদের পাহারা দেবার জায়গা। সেটা পেরুলেই এক দিকে সেরেস্তা। তার সামনে খোলাচত্বর। তার উত্তরে বিশাল পুজোর দালান।

পুজোর দালানের পিছনে আর একটি মহল। কিন্তু সেই দিকের বিশাল প্রসাদ আরও ভেঙে পড়েছে।

এটি ছিল গোবরডাঙ্গা দেওয়ানজি বাড়ি। আমরা বলতাম ও বাড়ি। শৈশবে বাবা-মা মারা যাবার পর অভিভাবকহীন আমার বাবা তাঁর নিজের অংশটি তাঁর আপন খুড়তুতো দাদার কাছে বিক্রি করে আমার ছোট পিসির কাছে চলে গিয়েছিলেন। পিসেমশাই জজ। বাংলার বিভিন্ন জেলায় বদলি হতেন। বোহেমিয়ান ছোট ভাইকে কর্মক্ষম করার জন্য পিসি তাঁকে মোটর ড্রাইভিং শিখিয়ে লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ বড় চাকরি করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর ছিল না। কিন্তু বাবার ধাতে কোন চাকরি করা ছিল না। ড্রাইভিং লাইসেন্স তাঁর কাজে লাগেনি। তারও দু একটা অন্য চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু টিকতে পারেননি। বংশানুক্রমে সেই রক্তধারা আমার মধ্যেও সংক্রামিত। আমি ছ'বার চাকরি বদল করেছি। আমি এখনও কর্ম করে যাচ্ছি। কিন্তু প্রতিদিনই মনে হয় চাকরি ছেড়ে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে ঘরে বসে পায়ের ওপর পা তুলে খাই। কিন্তু কর্তব্য টেনে ধরে। দায়িত্ববোধ বাধা দেয়। আবার সকালে উঠে অফিস যাই।

আমার বাবার জীবন দেখে মনে হয়েছে পৃথিবীতে মানুষের দারিদ্র্য দুটি কারণে। একটি হল জন্মসূত্রে। দরিদ্রের ছেলে দরিদ্র হয়েই জন্মায়। এবং দরিদ্র বলেই সে জীবন সংগ্রামের সঠিক পথ জানে না। আর একদল দরিদ্র হয়, উদ্যোগের অভাবে। তারা যা পেয়েছিল উদ্যোগের অভাবে তা গুছিয়ে তুলতে পারে না। আবার নতুন কোন উদ্যোগ নিতেও ভয় পায়। আমার বাবা ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। একথা ঠিক,

শৈশবে তিনি বাবা-মাকে হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত সহায়-সম্পদহীন ছিলেন না। আমার ঠাকুর্দার নেই নেই করেও বেশ কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু বাবা কিছুই ধরে রাখতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত পৈত্রিক বাড়িতে তাঁর নিজের অংশও তিনি খুড়তুতো দাদার কাছে বেচে দিয়ে পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ভাড়াবাড়িতে বাস করতেন। সে ভাড়াও তিনি নিয়মিত যোগাতে পারতেন না।

আমি জন্মেছিলাম এমন এক ভাড়া বাড়িতে। আমাদের পৈত্রিক দেওয়ানজি বাড়ির খুব কাছেই। তারপর বাবা গ্রামের গরিবদের পাড়ায় নাথ সম্প্রদায়ের এক পরিবারের এক ভাই-এর একটি অংশ কিনে ঘিরে নিয়ে সেখানে বাস করতে থাকেন।

বাড়িটিতে দুটি ঘর। প্রকৃতপক্ষে একটি ঘর। আর একটি ঘর একটি ঘরের মধ্য দিয়েই যেতে হয়। এক চিলতে উঠোন। উঠোনের এক অংশে ছিল গোয়ালঘর। আর এক অংশে মাটির রান্নাঘর। ওই বাড়িটি নিয়ে বিক্রেতার ছোট ভাই ও তার বউ আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। আমাদের ওই বাড়িতে কোন পায়খানা ছিল না। প্রাতঃকৃত্য করতে যেতে হত দূরে বাগানে কিংবা মাঠে। জল আনতে হত বহুদূরের টিউবওয়েল কিংবা পুকুর থেকে। আমাদের বাড়িতে কোন ঘড়ি ছিল না। আমরা সময় ঠিক করতাম ট্রেনের আওয়াজ শুনে।

আর যেটা ছিল না সেটা নগদ টাকা। কারণ বাবার কোন আয়ই ছিল না। একমাত্র দু-চার টাকা তিনি যে হাতে পেতেন সেটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মধ্যস্বত্বের দরুন প্রজাদের কিছু খাজনা।

কিন্তু সে খাজনার পরিমাণ এতই কম ছিল যে তা আদায় করতে গেলে খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশি হয়ে উঠত। বাবা যে কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন তা হল আদায়ে বেরুনো। সকালে বেরিয়ে যেতেন, চার পাঁচ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে বেলা তিনটার সময় শুকনো মুখে ফিরে বলতেন, বেটাচ্ছেলেরা আজ কিছুই দিল না।'

মা বিরস বদনে বলতেন — 'তাহলে আজ কী রাঁধব? ঘরে একদম চাল বাড়ন্ত। বিকেলে হাটে না গেলে রাতে খাওয়া হবে না।'

বাবা বলতেন, 'দেখি হাটে গিয়ে কাউকে ধরতে পারি কিনা। তুমি আজকের রাতের ব্যবস্থা তো করে রাখো ...'

আমাদের প্রতিবেশীদের অবস্থাও এমন কিছু ভাল ছিল না। আমাদের চারপাশে ছিল যে সব পরিবার তারা বিড়ি বাঁধার কাজ করত। কেউ কেউ দোকানে কাজ করত। রাস্তার উল্টো দিকে থাকত ন্যাড়া কামার। হাপর টেনে লোহার জিনিসপত্র তৈরি করত। পিছন দিকে ছিল মাহিষ্যদের পাড়া। তারা কেউ দিন মজুর। কেউ দর্জি, দোকানদার। তাদের ছেলেরাই আমার বন্ধু। খেলার সাথী। যদিও তারা পরবর্তীকালে কেউই হাইস্কুল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

আমাদের চারপাশের মানুষেরা অধিকাংশ নিরক্ষর। বউদের চরিত্রও খুব ভাল ছিল না। একদিন দেখলাম এক বিধবার বাচ্চা হল। তখন জানতাম যে বিধবাদের ছেলেপুলে হয় না। অনেক পরিবারে বিধবা কোন মহিলার সঙ্গে সহবাস করার রীতিও ছিল।

আমারই এক সহপাঠীর মাকে দেখতাম বিধবার পোশাক। কপালে সিঁদুর নেই। অথচ বন্ধুটি একজনকে বাবা বলত। তার (বাবা) ও মা ওই বাড়িতে এক সঙ্গে থাকত। একদিন আমাদের সামনের বাড়িতে এক যুবক দুটি যুবতীকে নিয়ে ভাড়া এল। যুবতী দুটি খুব একটা বাইরে বেরুতো না। যাওয়া আসার পথে তাদের বাড়ির রোয়াকে বসে থাকতে দেখতাম। একদিন একজন এসে আমার সঙ্গে আলাপ করল : খোকা তুমি কোথায় থাকো?

আমি বললাম, এই বাড়ি।

তোমরা বুঝি নতুন এসেছ?

হ্যাঁ। এই তো গত রোববার এসেছি।

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বনগাঁ।

তোমার সঙ্গে আর একজনকে দেখেছিলাম সে কে গা?

ও পুঁটুর কথা বলছ। ও আমার বোন হয়।

এমন সময় সঙ্গের মহিলাটি বেরিয়ে এসে বলল, এই মনো কার সঙ্গে কথা বলছিস?

: ওই বাড়ির খোকা। দ্যাখ পুঁটু মুখটা কী সোন্দর খোকাটার।

পুঁটু সেকথায় আমল না দিয়ে বলল। ভেতরে আয়, তোকে না বাবু বলে দিয়েছে বাইরে বেশি বেরুবিনি। এই বলে এক রকম জোর করে তাকে ঘরে নিয়ে গেল সঙ্গের মেয়েটি।

মাকে গিয়ে বলতে মা আমাকে এক ধমক, তোকে বলেছি না ওই সব উটকো লোক ডাকলে সাড়া দিবি না।

আমি তখনও বুঝিনি, ওরা কারা? কেন ওরা ঘর থেকে বেরোয় না। ওরা একটু ডেকেছে বলে মায়ের তত আপত্তি কেন?

বুঝলাম কিছুদিন পরে।

একদিন সকালে নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে গিয়ে দেখি সামনের বাড়ির বারান্দায় প্রচুর ভিড়। একটা ষণ্ডামত লোক এসে ওই বাড়ির সেই মহিলা ভাড়াটিয়া দুটিকে বার করে একটি মোটা রুল দিয়ে নির্মমভাবে পিটোচ্ছে। দুজনেরই পরনের শাড়ি খসে গেছে। মাটির ওপর আছাড়ি পিছাড়ি খেতে খেতে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, তোমার পায়ে পড়ি বাবু, আর মেরো না। ওগো আমায় বাঁচাও। কে কোথায় আছ তোমরা।

কিন্তু জনতা নির্বাক। কারও মন গলছে না। কারও মুখে কথা সরছে না।

সেই ষণ্ডামত লোকটি ভিড় দেখে একবার মার থামিয়ে লেকচার দিতে লাগল।

এরা দুজন কে জানো? বনগাঁ বাজারের খানকি। ভদ্দরলোকের পাড়ায় ব্যবসা ফাঁদতে এসেছে। খবর পেয়ে আমরা বনগাঁ থানা থেকে আসছি। আজ এদের একদিন। কি আমারই একদিন।

তখন পাঁচ ছ'বছর বয়স হবে আমার। খানকি কথাটা এ পাড়ায় প্রচলিত গালাগালি। কেউ কারও ওপর রাগ হয়ে গেলেই বলত। খানকি মাগী ..... তোর মা খানকি। বোন

খানকি। ছেলেরাও কথায় কথায় মুখ খিস্তি করত। যেসব কথাও মুখেও আনা যায় না, সে সব কথা অনায়াসে উচ্চারণ করত। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ছিল সম-কামী। ছোট ছোট ছেলেরা তো বিড়ি খেতই। অনেক বউরাও বাড়িতে বিড়ি খেত। আর কারণে অকারণে পরস্পরের মধ্যে খিস্তি খেউড় করত।

সেই নির্মম অত্যাচার, আলুথালু বিবসনা নারীর অসহায় আর্তনাদ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তারপর থেকে সারাজীবন কোন নারীকে অসহায় দেখলেই আমার মনটা হু হু করে উঠত তার প্রতি সহানুভূতিতে। আমার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, আমার নারী শত্রু হবে। পুরুষের মত অনেক নারীও আমার সঙ্গে নির্মম শত্রুতা করেছে। কিন্তু আমি প্রথম সুযোগেই নারী শত্রুকে ক্ষমা করেছি। কোন নারী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে শুনলেই ছোটবেলায় এই ঘটনাটার কথা আমার এখনও মনে পড়ে। আমাদের পাড়ায় দেহ ব্যবসায়িনী ও স্বৈরিণী রমণীরা থাকত। এ নিয়ে কেউ কিছু বলত না। এক রমণী পর্যায়ক্রমে নানা পুরুষের রক্ষিতা হয়ে থাকত। রক্ষিতা রাখাটা পাড়ায় কোন অসম্মান বলে বিবেচিত হত না। আর একটি দেহোপজীবীনী আমাদের পাড়াতেই একজনের জমিতে চালা বেঁধে বাস করতে এল। এই মেয়েটি ও তার মা সেখানে বাস করত। নানা জায়গা থেকে পুরুষ খদ্দেররা তার কাছে আসত।

তখন আমি উঁচু ক্লাসে পড়ি। একদিন সন্ধ্যার সময় স্কুলের কয়েকটি ছেলে আবিষ্কার করল ভিন গাঁয়ের এক যুবক ওই রমণীর বাড়িতে ঢুকেছে। ছেলেরা এক বদমতলব আঁটল। তারা বাড়িতে চড়াও হয়ে যুবকটিতে বার করে আনল। তারপর তার ওপর চাঁদা করে মার চলল। তাতেও তারা ক্ষান্ত হল না। তারা ছোকরাটিকে নিয়ে শীতের রাতে পুকুরে ডুব দিতে বাধ্য করল। তারপর ভিজে কাপড় জামায় তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল এরপর আবার এলে এর চেয়ে খারাপ অবস্থা হবে।

আমাদের পাশের বাড়ি এক বিধবা তার এক ছেলেকে নিয়ে থাকত। তাকে আমরা ভূপতির মা বলতাম।

শুনতাম ভূপতির মা এক নামকরা ডাক্তারবাবুর রক্ষিতা। তিনি রোজ সন্ধ্যায় সাইকেল হাঁকিয়ে ওই বাড়িতে আসেন। একদিন সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়ে ফিরছি। দেখি কে চোখে টর্চ মারছে। আসলে ওটি ছিল সাইকেলের আলো। সাইকেলটি বাড়ির সামনে এমনভাবে দাঁড় করানো ছিল যে মনে হচ্ছিল কারও হাতে টর্চ রয়েছে বুঝি। আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কে টর্চ মারছে? কে ওখানে?

এমন সময় সাইকেলের মালিক বেরিয়ে এল।

কে চেঁচাচ্ছে? তারপর একটু আমাকে দেখে বললেন, ওহ ধানী লঙ্কার ঝাল। বড় বাড় হয়েছে তাই না? যা-পালা।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেলাম। কিন্তু এতদিন পরে সেই রহস্যময় রাতের পুরুষটিকে দেখে ফেললাম।

উনি আমাদের পাশের গ্রামের এক বিখ্যাত ডাক্তার, এক ডাকে তাঁকে লোকে চেনে।

এই পরিবেশের মধ্যে আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম। বাবা-মা দুজনেরই বারণ ছিল

আমি যেন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে না মিশি। কিন্তু আমি শুনতাম না। তখন এত ছোট যে ভিন পাড়ায় যাবার মত সাহসও নেই। আমি নিষেধ না মেনে ওদের সঙ্গেই মার্বেল খেলতাম, ডাঙ্গুলি খেলতাম। পুকুরে সাঁতার দিতাম। অঘ্রাণে ধান কাটা হয়ে গেলে নিচু ধানী জমি বিশাল প্রান্তরে পরিণত হত। প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। এই বিস্তৃত প্রান্তরকে বলা হত বিল। শীতে এই বিলে ঘুড়ি ওড়াতাম আমরা। অথবা ফাঁদ পেতে বক ধরতাম।

বর্ষাকালে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যেতাম পুকুরে। কাটা ঘুড়ির পিছনে পিছনে দৌড়তে গিয়ে কতবার হাফর অর্থাৎ কাদার মধ্যে পড়েছি তার ঠিকানা নেই।

বাড়িতে চোরের মত গুটি গুটি করে ফিরলে জুটত বকুনি। বাবা থাকলে নিষ্ঠুরভাবে মারতেন। তিনি মারতেন বেত দিয়ে। পিঠে দাগ পড়ে যেত। কিন্তু পড়াশোনার চেয়ে আমাকে আকর্ষণ করত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, পুকুর। ধুলোভরা রাস্তা। এ আমার প্রথম শৈশবের কথা।

॥ তিন ॥

হলুদ বনে বনে

আমার যখন সাড়ে তিন বছর বয়স তখন আমার ছোটবোন শান্তার জন্ম। সে সময় বাড়িতেই আঁতুরঘর হত। আমিও জন্মেছিলাম তিনু রক্ষিতদের বাড়িতে। তিনু আমারই বয়সী। তিনুর মায়ের সঙ্গে আমার মা গঙ্গাজল পাতিয়েছিলেন। সমাদ্দার পাড়ায় যখন আমরা চলে আসি যখন তখন আমার বয়স এক বছর। তার দুবছর পরে আমার বোনের জন্ম। আমার এই দুবছর বয়সের স্মৃতিও কিছু কিছু মনে পড়ে। হাজারি নামে একজন পড়শী আমাকে কোলে নিয়ে বেড়াত। আমি তাকে প্রশ্ন করতাম এটা কী? ওটা কী? হাজারি বলত, এটা দেওয়াল। এটা আকাশ। আমি বলতাম—'আমি দেওয়াল খাবো। আকাশ খাবো।

হাজারির বউএর নাম ছিল গুরুদাসী। গুরুদাসী আমাদের সঙ্গে পাশের গ্রাম ইছাপুরে আমার পিসতুতো দাদার বিয়েতে গিয়েছিল। আমার বোনের টাইফয়েডের সময় সে এসে শুশ্রূষাও করেছে। এক কথায় সে এক সময় আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল।

হাজারি একদিন মারা গেল। তার মৃতদেহের সামনে গুরুদাসীর সে কী আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। এই গুরুদাসীকে নিয়ে আমার একটি ভূতের গল্প আছে (হাজারির বউ)। আমার বোনের যেদিন জন্ম হয় সে রাতটার কথা মনে আছে। অন্যদিনের মত সেদিনও যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবার পাশে। আমাদের বাড়িতে একটি মাত্র সিঙ্গল খাট ছিল। সেটিতে আমি ও বাবা ঘুমোতাম। মা নিচে বিছানা পেতে শুতেন।

বাবা ও মা পালা করে আমায় গল্প শোনাতেন. গল্প না শুনলে আমার ঘুম আসত না। মা বলতেন রূপকথার গল্প। বাবা শোনাতেন আমাদের বংশ গৌরবের কথা। বলতেন, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে দেওয়ান। আমার বাবা রাসবিহারী গোবরডাঙ্গা

জমিদারদের বড়তরফের দেওয়ান ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর দেওয়ানের পদ উঠেই গেল। আমার ঠাকুর্দা রাধামোহনও দেওয়ান ছিলেন। আমাদের আদিনিবাস বর্ধমান। গোবরডাঙ্গা জমিদারদের দেওয়ানগিরি করতে এসে ঠাকুর্দা দেওয়ান বাড়ি তৈরি করেন। জমিদারবাড়ির আদলেই এই বাড়ি তৈরি। তবে ওদের বাড়ি দুর্গোপুজো হত বলে আমাদের বাড়ি দুর্গাপুজো হত না, জগদ্ধাত্রী পুজো হত, ধূমধাম করে।

রাসবিহারীরা দু ভাই। রাসাবিহারী ও কুঞ্জবিহারী। রাসবিহারী বড়। কুঞ্জ বসিরহাটে ওকালতি করতেন। কুঞ্জকাকার দুই ছেলে কুমুদদা ও পঙ্কজদা। পঙ্কজদার কাছেই আমার অংশ বিক্রি করেছি। তখন ছোট ছিলাম। অতশত বুঝিনি। পঙ্কজদা বললেন ঃ তুমি তো আর এ বাড়িতে বাস করো না। বাইরে বাইরে থাকো। তোমার অংশটা তুমি আমাকে এখন ছেড়ে দাও। পরে যদি কখনও ইচ্ছা হয় বাস করবে তা হলে তখন তোমায় দিয়ে দেব।

জ্ঞাতিদের হিংসার মধ্যে থাকতে চাইনি। তাই আলাদা থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু এ বাড়িতে এসে দেখছি ভুল করেছি। এ নরকপুবী। এখান থেকে চলে যেতেই হবে। আবার আমরা (ও বাড়িতে) ফিরে যাবো। এবারই পঙ্কজদাকে গিয়ে বলব—

কিন্তু বলব বলব করে আর বলা হয়নি বাবার। একদিন শুনলাম পঙ্কজ জেঠামশাই মারা গেছেন। তাঁদের কলকাতার রামমোহন রায় সরণির বাড়িতে তাঁর ছেলেদের বিয়েতে গিয়েছি। এবার শ্রাদ্ধতে বাবার সঙ্গে গেলাম। ঘটা করে শ্রদ্ধা হল তাঁর।

বাবার আর দেওয়ানবাড়িতে ফিরে যাওয়া হল না। বাবা গল্প করতেন, গোবরডাঙ্গার দেওয়ানদের কী প্রতাপ ছিল সেদিন। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কোন সাধারণ লোক শিস দিতে দিতে বা টেরিকেটে যেতে পারত না।

মাঝে মাঝে বাবা ভূতের গল্প বলতেন। গা ছমছম করা ভূতের গল্প। বাবারা ছিলেন নয় বোন। ছোট বোন নাকি অল্প বয়সে মারা যায়। বাবা তাকে অনেকদিন দোতলার সিঁড়িতে একা একা বসে থাকতে দেখেছেন। বাবার নয় বোনের মধ্যে তিন বোনকে আমি দেখেছি। বড় সেজো ও ছোট। মেজ পিসীমার সঙ্গেই জজ সাহেবের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর এক ছেলে রেখে তিনি মারা যান। তখন পিসেমশাই ছোট পিসীকে বিয়ে করেন। ঠাকুর্দার দুই বিয়ে। প্রথমা স্ত্রীর মেয়ে ছিল না। দুই ছেলে বিজয় আর এক ছেলে শক্তি। দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে জীবন ও সঞ্জীব। এদের মধ্যে শক্তি ও জীবনের অকালমৃত্যু হয়। জীবন জেঠামশাইয়ের একটি নোট বই আমি আবিষ্কার করেছিলাম। তার মধ্যে অনেক গান ও কোটেশন ছিল। বোঝা যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। পিসীমা আমার সম্পর্কে বলতেন, আমি নাকি জীবনের সব গুণগুলি পেয়েছি। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাবার কোন অনুরাগ ছিল না। ছোটবেলায় বাবা মা মারা যাবার পর অভিভাবকহীন অবস্থায় তাঁর পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাও শেষ করতে পারেননি। তাঁকে কোন হাতের কাজও শেখানো যায়নি।

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY AGARTALA, TRIPURA RRRLF 92307

তিনি খাস জমি, বাগান, পুকুরের অংশ বিক্রি করেছেন। যত্রতত্র ধার করেছেন। অভাবের জ্বালায় এক জমি দুবার বিক্রি করেছেন। নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে সাইকেল নিয়ে সেটি বিক্রি করে আমার বোনের চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছেন। শোওয়ার খাট বিক্রি করে আমার ইস্কুলের বকেয়া বেতন দিয়েছেন। মায়ের গা থেকে একে একে সোনা খুলে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ঘটি বাটি বিক্রি করেছেন। বড়লোক হবার আশায় লটারির টিকিট কেটে গেছেন সারা জীবন। মেলায় গিয়ে যথাসর্বস্ব দিয়ে জুয়া খেলেছেন।

আমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল লাভ অ্যান্ড হেট। বাবার পাশে শুয়ে বাবার মুখ থেকে গল্প শুনতে শুনতে আমি বড় হয়েছি। অসুখ হলে চারপাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বাবা আমায় কোলে করে দুমাইল দূরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন। বাবা আমার পাঁচবছর বয়সে হাতেখড়ি দেবার জন্য নিয়ে গেছেন ভাটপাড়া গুরুগৃহে। সেখানে পঞ্চানন তর্কবাগীশ আমাকে শাস্ত্রমত হাতেখড়ি দেন। বাবার আকর্ষণ আমার কাছে এত গভীর ছিল যে যখন ক্লাশ টুতে পড়ি তখন আমার দাদামশাই ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ও মাকে খুলনার জেঠুয়াজালালপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই আমার মামার বাড়ি। বাবা সেখানে আসতেই আমি বাবার সঙ্গে চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হই। বাবা আমাকে রেখেই চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি বায়না ধরি আমি এখনই বাবার সঙ্গে চলে যাবো। বাবা আমাকে তখন সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হন।

আমার জীবনে ভালবাসার যে কোরকগুলি তখন ধীরে ধীরে ফুটছিল তা বাবাকে দিয়ে শুরু। কিন্তু সারাজীবন ধরে ভালবাসার আধারের সন্ধান করে গিয়েছি। কিন্তু ভালবাসা বিনিময়ে সমান ভালবাসা চায়। কিন্তু সারাজীবন ধরে ভালবাসার ফিরিওয়ালা হয়েই কাটালাম। বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে সমান ভালবাসার প্রতিদান পেলাম না। তাই চিরদিনই কাঙাল থেকে গেলাম। এই কাঙালপনার জন্য অনেক অপমান আঘাত সহ্য করে জীবনের সায়াহ্নে এসে এখন মোহমুক্ত হয়েছি। ধরে নিয়েছি শরৎচন্দ্রের ভাষায় সংসারে একদল মানুষকে শুধু দিয়েই যেতে হবে। বিনিময়ে পাওয়ার আশা করা চলবে না কিছুতেই। এই উপলব্ধিই আমার জীবন থেকে ছেঁচে তোলা সাত রাজার ধন এক মাণিক।

আমার বোন শান্তা যেদিন ভূমিষ্ঠ হল পাশের ঘরে তখন আমি ঘুমিয়ে। অস্ফুট চাপা কথা বলার শব্দ, মায়ের গোঙানি, তারপর এক নবজাত শিশুর কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে আমি পাশে হাতড়ে দেখেছিলাম বাবা নেই। আমি কেঁদে উঠেছিলাম।

বাবা তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এসে আমার পাশে বসলেন। তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

আমার মাথা চাপড়ে বললেন, ঘুমোও। কাল ভোরে উঠে একটা মজার জিনিস দেখতে পাবে।

মজার জিনিসটা যে কি তা তখনই জানার আমার আগ্রহ ছিল না। কারণ তখন আমার ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বাবা বললেন, তোমার একটা বোন হয়েছে কাল রাতে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, বোন আমি নেবো না। এখনই ওকে বনে রেখে এসে একটা ভাই নিয়ে এসো।

আমি শুনেছিলাম বোনের চেয়ে ভাই-ই নাকি ভাল। নয়তো ভাই ও বোনের তফাত আমার বুদ্ধিতে ধরা পড়ার মত নয়। খাট থেকে নেমে কৌতূহল ভরা চোখ নিয়ে পাশের ঘরে যেতে দেখি মা শুয়ে আছেন। পাশে কাপড়ে জড়ানো পুতুলের মত একটি সজীব পদার্থ।

আরও কাছে যাবার চেষ্টা করতেই আমার সোনামাসীমা বললেন, উঁহু, উঁহু এখন আঁতুড়, কাছে যাবে না।

আমি পিছু হঠে এলাম।

আমার বোনের জন্মের সময় গতখালি থেকে মায়ের এই জেঠতুতো বোনকে আনা হয়েছিল।

এই বোনের জন্মের আর চার বছর পরে ১৯৪৭ সালে আমার ভাই-এর জন্ম হয়। তবে তার জন্ম হয়েছিল ইছাপুরে আমার সেজো পিসীর বাড়ি। তার চারবছর পরে আমার যখন আর একটি বোন জন্মাল তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা আরও ভেঙে পড়েছে। তিন ভাই বোনকে নিয়ে বাবা-মা হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রায় দিনই মায়ের খাওয়া জুটছে না। তখন আমার অবস্থা বুঝবার মত বয়স হয়েছে।

মনে আছে সেই বোন যখন জন্মাল। তখন আমি একা একা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর ওকে তুমি নিয়ে নাও। তাহলে অন্তত আমাদের ক্ষুধার অন্ন থেকে ভাগ বসাবার মত একজন কমে যাবে। ঈশ্বরের কাছে সেদিন এক নবজাতকের মৃত্যু প্রার্থনা করেছিলাম তা মনে করলে আজও আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। অথচ এই আমি বি·ছু দিন আগে বাবা যখন নিমোনিয়ায় মরো মরো তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম ঃ ঠাকুর তুমি আমার জীবন নিয়ে বাবার জীবন ফিরিয়ে দাও।

ইতিহাস বইতে তখন বাবরের প্রার্থনার কথা পড়েছি। তাঁর জীবনের বিনিময়ে নাকি হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে বাবা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন। আমি অক্ষতই ছিলাম। কিন্তু আমার সেই সদ্যোজাত বোনটি নদিনের বেশি বাঁচেনি। টকটকে ফর্সা রঙ। পুতুলের মত তার টানা টানা দুটি চোখ আমার চোখে এখনও ভাসছে।

বাবা নাম রেখেছিলেন, জগদ্ধাত্রী। এই দারিদ্র্যের মধ্যে এক নবাগতার আগমন তাঁদের বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন করেনি। ক'দিন ধরে জগদ্ধাত্রী ভুগছিল। শেষ রাতে মায়ের ডুকরে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

আঁতুড় ঘরে নিস্পন্দ শিশুর মৃত দেহটি বুকে নিয়ে মা কাঁদছেন। আর আমি? কোথায় পালাব? আমার ভেতরের খুনীটাকে আমি তো নিজেই ধরে ফেলেছি ততক্ষণে। অথচ

মুখে কিছু বলতে পারছি না, বলতে পারছি না। আমিই তার মৃত্যু কামনা করে তাকে সরিয়ে দিয়েছি।

শিশুর মৃতদেহের সামনে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ছুটে চলে গেলাম বাইরে। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্র। তখন চিনতাম না। এখন ওই নক্ষত্রকে চিনি।

কালপুরুষ।

জগদ্ধাত্রীর মৃত্যুর প্রায় তিনবছর পর আমার সবচেয়ে ছোট বোন গায়ত্রীর জন্ম। তিন বছর ধরে যে অপরাধবোধ আমায় কুরে কুরে খেয়েছিল ছোট বোন জন্মানোর পর তা কিছুটা প্রশমিত হল। আমার মনে হয়েছিল জগদ্ধাত্রীই আবার জন্ম নিয়েছে। যদিও জগদ্ধাত্রীর মত অমন গায়ের রঙ সে পায়নি। তবু আমি তাকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছি। তার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান এক যুগের। দ্বিতীয়ত জগদ্ধাত্রীর মৃত্যুর ঘটনার পর আমি আর কারও মৃত্যু চাইনি বরং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাদের দারিদ্র্য আমরা ভাইবোন সবাই ভাগ করে নেবো।

আমি যখন পাঠশালায় পড়ি তখন মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দানবটা আমাদের গ্রাম পর্যন্তও ধাওয়া করেছে।

পাঠশালা বসত আমাদের সাবেক বাড়ি মনে দেওয়ান বাড়ির কাছারি আর দেউড়িতে। দেউড়ির ওই ঘরের এক কোণে এক বিশাল লোহার সিন্দুক ছিল। আর ছিল বহুদিন আগে থেমে যাওয়া এক বিশাল দেওয়াল ঘড়ি।

দেওয়ান পরিবারের গৌরবের সময় চলে সেই কবেই। যাঁরা সঙ্গতিসম্পন্ন সেই জেঠামশাইদের দুই পরিবারই কলকাতায়। পিছনের ধসে পড়া অংশে শুধু আমাদের এক জ্ঞাতি দাদা আর এক জ্ঞাতি পিসীমা থাকতেন।

কলকাতায় বোমার ভয়ে তখন অনেক কলকাতাবাসী গ্রামে ফিরে আসছে। অনেকে ধার-দেনা করেও বাড়ি মেরামত করে কলি ফিরোতে শুরু করেছে।

ননী ডাক্তারের ডাক্তারখানা স্টেশনের ওপরে। রেললাইন পেরিয়ে যেতে হয়। ম্যালেরিয়ায় কাহিল হয়ে বাবার সঙ্গে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। দেখি রেললাইনের ধারে জঙ্গল কেটে হোগলার ছাউনি হচ্ছে। বাবা বললেন, গোরারা আসবে। গোরা মানে ব্রিটিশ সৈন্য। কিন্তু এত জায়গা থাকতে তারা এখানে ছাউনি করল কেন তা জানতাম না।

আকাশে প্লেন দেখেলেই গ্রামের সকালে অবাক হয়ে দেখত। এই সব প্লেন নাকি কলকাতায় বোমা ফেলবে। সেই বোমার আতঙ্কেই পালাচ্ছে মানুষ।

পাঠশালায় একজন মষ্টারমশাই এসেছিলেন। জিতেন মাষ্টার। গ্রামেরই লোক। কিন্তু এতদিন কলকাতার কোন কলেজে পড়াতেন। এখন বোমার ভয়ে দেশে ফিরেছেন। চুপচাপ না কাটিয়ে পাঠশালার ছেলেদের পড়াতেন।

ইস্কুলে পড়াশোনায় নাকি ভালই ছিলাম আমি। পড়া ধরলে চটপট পড়া বলে দিতে পারতাম। টানা রিডিং পড়ে যেতে পারতাম গড় গড় করে।

কীভাবে এই গড়গড় করে রিডিং পড়ার খ্যাতি রটে গেল চারদিকে। বড়রা দেখা হলেই একটি খবরের কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলত, এই এটা পড়ে শোনা তো।

হাইস্কুলের ছেলেরা ইস্কুলে যাবার পথে দেখা হলে আমাকে তাদের পড়ার বই এগিয়ে দিয়ে বলত, এই একটু পড়ে শোনা না। আমি বুঝতে পারতাম না, রিডিং পড়ার মধ্যে কৃতিত্বের কি আছে।

ক্লাশ টুতে ওঠার পর স্কুল দেওয়ানজি বাড়ি থেকে উঠে পাশের চারু পালের বাড়ি চলে গেল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আরও দূরে যমুনা নদীর ধারে একটি বাড়িতে উঠে গেল। পাশ দিয়ে বহে চলেছে ক্ষীণস্রোতা যমুনা। বোশেখ মাসে তাঁর হাঁটু জল। বর্ষায় টল টল করত। তবু তাকে পূর্ণ যৌবনা বলা যেত না। কচুরিপানায় বোঝাই হয়ে থাকত এক একটা তীর।

এখানে এক নতুন মাস্টারমশাই পেলাম। সন্তোষ মাস্টার। রোগা লম্বা। বড় বড় চোখ। খাড়া নাক। সব সময় রেগে আছেন। মুখে হাসি নেই। বুকে দরদ নেই। আর একজন ছিলেন বিষ্টু মাস্টার। তিনি বাকী সময় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কালেক্ট করতেন।

স্কুলের পড়াশোনার চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল টিফিন পিরিয়ডে মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ানো। নৌকো নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। মাঠে ছাড়া ঘোড়ার পিঠে ওঠা।

দেওয়ানজি বাড়িতে তখন খোলা হয়েছে খিচুড়ি কেন্দ্র।

বাবার আদায়পত্র একদম বন্ধ। চালের দাম হু-হু করে বাড়ছে। চাষীরা খাজনা দিতে চাইছে না।

একদিন বাবা মাকে বললেন। যাই একটু খুলনা থেকে ঘুরে আসি। খুলনায় যে জমি আছে তা থেকে কিছুই আদায় হয় না। জমিটা যদি পারি বিক্রি করে আসব। তবু তো কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

বাবার ততদিনে এজমালি সম্পত্তি থেকে নিজের সব অংশ বিক্রি করা হয়ে গেছে। বাগান পুকুরের সব অংশ শরিকদের বেচে দিয়েছেন বাবা।

মা বলতেন, আর কি রইল ছেলেপুলেদের জন্য? তাদের তো একটা ভবিষ্যৎ আছে।। বাবা বলতেন। আমি কারও জন্য ভাবি না। ভেবে কি হবে? জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

ঃ তুমি বলেছিলে, এই বাড়ি ছেড়ে ভদ্র পাড়ায় চলে যাবে?

ঃ হ্যাঁ। বাড়ি তো খুঁজছি। তবে পঙ্কজদা বলেছিলেন, আমার অংশটা টাকা পেলে ফেরৎ দেবেন। কিছু টাকা যোগাড় করতে পারলেই— সেজন্যই তো খুলনার ধানী জমিটা বেচতে চাইছি।

তিন চারদিনের জন্য খুলনা গিয়ে বাবা তার নিরুদ্দেশ। পনের দিন হয়ে গেল। দু

ভাই বোনকে নিয়ে মা বাড়িতে একলা। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি চাল ধরে নিয়ে নিয়ে চালাচ্ছেন। মা তাঁর ডান হাতের দুটো আঙুল নামিয়ে আমার সামনে মেলে ধরলেন। ধরতো একটা আঙুল। আমি একটা ধরতেই মা মনমরা হয়ে বললেন। নাঃ আজও তোর বাবা আসবে না। তুই এক কাজ করতে পারবি? ন্যাড়া কামারের বাড়ি থেকে ধারে দু পয়সার মুড়ি আর এক বাটি চাল আনতে পারবি? আমার কাছে আর নগদ পয়সা নেই।

আমি বললাম আমাদের আগের আটআনা বাকী পড়ে আছে। শ্যামার মা বলেছে সৈ পয়সা শোধ না করলে আর ধার দেব না।

মা বললেন। সেজন্যই তো তোকে পাঠাচ্ছি। তুই ছেলেমানুষ, তোকে না বলতে পারবে না।

ন্যাড়া কামারের মুখে এক মুখ পাকা দাড়ি। মাথায় পাকা চুল। বাড়িতে ঢুকতেই তার কারখানা। সেখানে হাপরের গনগনে আগুনে গরম লোহা পিটিয়ে ন্যাড়া কামার দা, কাস্তে বঁটি তৈরি করত।

ন্যাড়া কামারের একমাত্র মেয়ে শ্যামা আমার সমবয়সী। গ্রামে ছেলেমেয়ের নামে বাবা মাকে ডাকার রীতি। যেমন ন্যাড়া কামারের বউকে আমি বলতাম শ্যামার মা। মাটির ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আমি বললাম ও শ্যামার মা— মা এক বাটি চাল ধার চেয়েছে।

শ্যামার মা বলল এর আগে পর পর দুদিন চাল নিয়ে গেছে তোর মা, এখনও ফেরত দেয়নি। আর আমি চাল দিতে পারব না বাপু। বাজারে চালের মণ হয়েছে চল্লিশ টাকা।

আমি বিড় বিড় করে বললাম, বাবা সেই খুলনা গেছে, এখনও ফেরেনি কিনা—

ঃ তোর বাবা ফেরেনি, তা আমি কী করবো গা। যা-না, খিচুড়ি কেন্দ্রে তো দুবেলা করে পেটভরা খিচুড়ি দিচ্ছে।

আমি অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি শ্যামা ছল ছল চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

যাচ্ছিলাম, শ্যামার মা ঘর থেকে এক কৌটা চাল এনে বলল, এই নিয়ে যা আজকে। আর এলে কিন্তু পাবি না। এই শেষ বলে দিলাম।

পর দিন দুপুরে খিচুড়ি কেন্দ্রে গেলাম।

মাকে বলে যাইনি, কেননা, মা বলেছিল না খেয়ে মরে যাবো তবু কাঙালিদের সঙ্গে খিচুড়ি খেতে পারব না।

আমি বলেছিলাম, আমাদের ইস্কুলের অনেক ছেলেই তো নিচ্ছে মা। আর খিচুড়িটা ভালই করে। ওর মধ্যে তরকারিও দেয়। আবার শুনছি আসছে রোববার নতুন কাপড়ও দেবে। তোমার নামটা লিখিয়ে আসব।

মা এক ধমক দিয়ে বলল, জানতে পারলে তোর বাবা আস্ত রাখবে না। দেওয়ানজি বাড়ির বউ বিনা পয়সায় কাপড় নেবে! খবরদার ও কথা মুখে আনবি না।

কিন্তু এক বাটি চালে পরদিন হবে না। অথচ পেটের খিদে তো মানে না। হয়তো মা আজ নিজেই আর এক বাড়ি যাবে চাল ধার করতে—

খিচুড়ি কেন্দ্রের সামনে এসে দেখলাম প্রচুর ভিড়। আমার পাড়া থেকে অনেকে এসেছে সঙ্গে বাসন নিয়ে। ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলাদের সংখ্যাই বেশী।

দেওয়ানজি বাড়ির পুজোর দালানের উঠোনে বড় বড় কড়াইতে খিচুড়ি ফুটছে। তদারক করছেন আমাদের জ্ঞাতি দাদা, সুধীরদা। আরও কয়েকজন মাতব্বর গোছের লোক আনাগোনা করছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্যই এই লঙ্গরখানা।

বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট লাইন পড়ে গেল। সবাই লাইনে দাঁড়িয়েছে। আমাকে বিন্দের মা বলল, তুইও দাঁড়িয়ে যা।

খিচুড়ির গন্ধে আমার খিদেটা আরও চনমন করে উঠল। কিন্তু অসহায় ভাবে আমি বললাম, আমি কী করে নেবো—পাত্তর আনিনি।

বিন্দের মা বলল, যা বাড়ি থেকে চট করে দৌড়ে একটা কাঁসার বাসন নিয়ে আয়।

এমন সময় সুধীরদা এসে সবাইকে ধমক দিয়ে গেলেন। কেউ লাইন ছাড়বে না। লাইন সোজা করো। তা না হলে কিন্তু কাউকে দেওয়া হবে না।

আমার দিকে চোখ পড়ে যেতেই সুধীরদা বলল, তুই এখানে কেন? খিচুড়ি নিবি নাকি? নিতে পারিস, আজ রান্নাটা ভাল হয়েছে। নিবি তো বাড়ি থেকে একটা পাত্তর নিয়ে আয়।

আমি এক ছুটে বাড়িতে গেলাম। মা কি আজ ভাত রেঁধেছে? আমি কি মাকে লুকিয়ে একটা পাত্তর নিয়ে যেতে পারব?

বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই মা দরজা খুলে দিলেন কিন্তু মার মুখ উৎফুল্ল। আমাকে বললেন, কোথায় ঘুরছিস হটর হটর করে। তোর বাবা এসেছে, তোকে খুঁজছে।

সত্যি?

আমি এক লাফে ঘুরে ঢুকতে যেতে মা বললেন, উঁহু উঁহু, পায়ে জল না দিলে আমি ঘরে ঢুকতে দেবো না।

পা ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখি বাবা প্রচুর জিনিস নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরে বসে। আমায় বললেন, তুই কোথায় ছিলি। এই দেখ তোর জন্য চানাচুর ভাজা এনেছি।

আর বাবা একটা পুঁটলি খুললেন, আমি ভাবলাম বুঝি খাবার জিনিস বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পুঁটলি থেকে বেরুল চাল— সোনালি রঙের বড় বড় দানা।

বাবা বললেন ; খুলনায় বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। যে প্রজারা আমাদের ধানী জমি কিনল ; তাদের কাছ থেকেই দু পালি চাল চেয়ে নিয়ে এলাম। আমাদের জমির গত বছরের চাল। গোলা থেকে বার করে দিল। শেষ বারের মত নিয়ে এলাম। শেষের দিকে বাবার মুখটা করুণ হয়ে উঠল।

॥ চার ॥

আমায় বেত মেরে কি তোলাবি মা

নদীর ধারে আমাদের পাঠশালায় টিফিন পিরিয়ডটা ছিল ক্লাশের চেয়ে বেশি আকর্ষণের। এই টিফিনের কোন ধরাবাঁধা সময় ছিল না। সন্তোষ আর বিষ্ণু মাস্টারের যখন খেয়াল হত তখনই টিফিন দিয়ে দিতেন। টিফিনে ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে গেলে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন। তারপর ঘুম ভাঙলেই সামনে যাকে পেতেন তাকে ডেকে বলতেন, এই ডাক ডাক সবাইকে ডাক। সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনটে ছেলে চিৎকার করত— টিফিন হয়ে গেছে।

রিলে পদ্ধতির মারফত এই ডাক অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেত। এবং ছেলেরা ফিরে আসত।

টিফিনে আমাদের ক্লাশ টুয়ের ছেলেদের একটা আড্ডা ছিল। আমাদের মধ্যে অসিত অনেক বই পড়ে তার গল্প বলত।

সে ইতিমধ্যেই দেব সাহিত্য কুটিরের রোমাঞ্চকর সিরিজের অনেক বই পড়ে ফেলেছিল। আমাদের আর এক বন্ধু বিমান ছিল ছিপছিপে ফর্সা সপ্রতিভ। সেও অনেক গল্প করত। একদিন আমার পায়ে চাপড় মেরে বলেছিল, তুই কী ফর্সারে, দেখবি তোর সঙ্গে খুব ফর্সা একটা মেয়ের বিয়ে হবে। আমাদের দলের লিডার ছিল দুর্গা। তার বাবা ছিলেন জমিদার বাড়ির পুরোহিত। কিছুদিন আগে তার বাবা মারা গিয়েছেন। আমি জীবনে প্রথম একজনকে জানলাম যে পিতৃহীন হয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্মশান সম্পর্কে তার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে।

স্কুলের কাছেই ছিল কালাকুণ্ডর শ্মশান। যুগীদের বউরা কারও ওপর রাগ হলে অভিশাপ দিত, কবে কালাকুণ্ডর ঘাটে যাবি! কবে যম তোকে নেবে?

দুর্গা তার বাবার মৃতদেহ দাহ করতে রাতে কালাকুণ্ডর ঘাটে গিয়েছিল।

আমাদের ইস্কুলের সামনে দিয়ে প্রায়ই মৃতদেহ যেত ঃ বলহরি হরি বোল।

তখনও পর্যন্ত আমার মৃত্যু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। জগদ্ধাত্রীর জন্ম ও মৃত্যু তার অনেক পরে। তখন আমার চোদ্দ পনের বছর বয়স।

দুর্গার কথা ভেবে আমি মাঝে মাঝে শিউরে উঠতাম। আমার মা ও বাবা যদি এখন মারা যায়! আমি সবাইকে গভীর ভাবে আঁকড়ে ধরতাম বলেই হয়তো আমার হারাবার তত ভয় হত। প্রকৃতপক্ষে আমি কোনদিনই একা চলার মত মানসিকতা অর্জন করিনি। বাবা মা কেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এমনকি পোষা গৃহপালিত পশু-পাখিকেও আমি ছেড়ে থাকতে পারতাম না। আমার মনে হত এদের সকলের সঙ্গে যেন আমার নাড়ির যোগ রয়েছে।

বন্ধুদের প্রতি আমি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম। যার ফলে একের পর এক বন্ধুরা যতদূরে সরে থাকার চেষ্টা করেছে আমি তাদের বার বার খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। তাদের সামান্য উপকার করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। কেউ

নিস্পৃহতা দেখিয়েছে। তাচ্ছিল্য করেছে অথবা সাংসারিক নানা ঘটনার টানাপোড়েনে দূরে সরে থেকেছে। আমি সমস্ত অভিমান ভুলে তাদের কাছে ছুটে গিয়েছি। আমার আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র-কন্যা সকলের প্রতি কেন আমার এই তীব্র আকর্ষণ? আটত্রিশ বছর আগে আলাপ হওয়া এক বিদেশিনীর সঙ্গে বাকী জীবন চিঠি পত্রে সম্পর্ক বজায় রেখেছি। স্কুল জীবনের পত্রবন্ধুর সঙ্গে পত্র বিনিময়ে এখনও আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

আমি জানি এই আকর্ষণই আমার দুর্বলতা। সংসারে খুব বেশি করে যারা চায় তারাই দুঃখ পায় বেশি। নির্লিপ্ততা, নিস্পৃহতাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পুরাতনকে বর্জন করতে হয়। নতুনকেও ঝাড়াই বাছাই করতে হয়। কাঙালের মত নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করতে নেই। তাই সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, যাচ্ছে। তবু আমি যেন খেয়া ঘাটের পাড়ে একা বসে আছি শেষ খেয়ায় যদি কেউ আসে, অপরাহ্নের ছায়ালোকে তাকেই আবার গ্রহণ করব দু'দণ্ডের জন্য।

ছুটির সময় বাড়ি যেতে যেতে দেখলাম মিছিল আসছে।

কিসের মিছিল? পনের কুড়ি জনের মত ছেলে। মিছিলের সামনে যে ছিল তার দু'হাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবি। ততদিনে সে ছবি আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছে।

কয়েকজনের হাতে তিনরঙা পতাকা। স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভাসা ভাসা কানে আসত। আমাদের বাড়িতে না আসত খবরের কাগজ, না ছিল রেডিও যে পাড়ায় বাস সেখানে তারা উদয়াস্ত নিজেদের সমস্যাতেই বিভোর। গোরা সৈন্যদের ছাউনি, আকাশে বোমারু প্লেনের আনাগোনা আর মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো সংলাপ থেকে বুঝতাম, যুদ্ধ চলছে জোর কদমে। আর সেই সঙ্গে জেনেছিলাম জাপানিদের সঙ্গে রয়েছেন নেতাজী। তিনবছর আগে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছেন।

ইংরেজরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে বলেছিল, কিন্তু দেয়নি। তবে এখন নাকি তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। কিন্তু জিন্না মুসিলমানদের এক নেতা তাতে বাধা দিচ্ছেন।

বাবা বলতেন, তোমাকে যেবার হাতেখড়ি দিতে নিয়ে গেলাম ভাটপাড়ায় তখন ৪২-এর আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় ছাত্রদের ওপর গুলি চলেছে। প্রায়ই হরতাল হচ্ছে। ভালয় ভালয় তোমার হাতেখড়িটা যে দিতে পেরেছি তা গুরুবল। এই গুরুবলেই তোমার সব আপদ-বিপদ কেটে যাবে।

বন্দেমাতরম্।

সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল বন্দেমাতরম্।

জয় হিন্দ্।

জয় হিন্দ্।

হঠাৎ অসিত চেঁচিয়ে উঠল : বন্দেমাতরম্। আমি ও আর দুটি ছেলে বলে উঠলাম—বন্দেমাতরম্।

তারপর অনেকবার বললাম—বন্দেমাতরম্। কোথা থেকে এল এ মন্ত্র — তা

জানিনি। দেশকে মা বলা রাজদ্রোহিতা না সাম্প্রদায়িক চিন্তা তাও মনের কোণে জাগার মত বয়স নয়।

শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম, বন্দেমাতরম্ শব্দের মধ্যে জাদু আছে। যা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক অনাস্বাদিত পুলকে দেহমন ভরে যায়।

আমার সামনে রাস্তাঘাট বাগান, গাছ, মাঘ মাসের হিমেল বিকেল সমস্ত স্বপ্নের মত মনে হল। দুর্গা বলত ঃ সে বনগাঁয় তার দিদির বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে সিনেমা দেখতে গিয়ে যুদ্ধের ছবি দেখেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান বোমা ফেলছে। কলকাতাতেও জাপানিরা বোমা ফেলে গেছে।

আমি বলেছিলাম, যদি ওরা আমাদের এখানে বোমা ফেলে?

দুর্গা বিজ্ঞের মত বলেছিল, দূর ওদের সঙ্গে নেতাজী আছেন না। কলকাতায় শুধু ভয় দেখানোর জন্য বোমাটা ফেলেছিল। আর ফেলবে না.....

মিছিলটা চলে যেতে আমরা খানিকক্ষণ হো হো করে হেসে নিলাম।

তারপর পুরনো ছড়াটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলাম।

সারে গামা পাধানি
বোম ফেলেছে জাপানি।
বোমেব ভেতর কেউটে সাপ।
বৃটিশ বলে বাপরে বাপ।

পরদিন ইস্কুলে যেতে সন্তোষ মাস্টার গম্ভীর গলায় বললেন, কাল বন্দোমাতরম্ বলেছিল কারা?

সারা ক্লাস চুপচাপ। মাস্টারমশাই কীভাবে খবর পেলেন? তবে কি কোন ছাত্র বলে দিয়েছে?

কিছুক্ষণ পরে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে অসিত, দুর্গা উঠে দাঁড়াল।

তোরা বন্দেমাতরম্ বলেছিস?

হ্যাঁ স্যার। আমি বললাম।

প্রচণ্ড বেগে তাঁর ডান হাতের একটি চড় এসে পড়ল আমার গালে।

তোরা কি আমায় জেল খাটিয়ে ছাড়বি? নরাধমের দল। আমার ইস্কুলের ছেলেরা স্বদেশী করছে, এত বড় আস্পর্ধা। সন্তোষ মাস্টার হাতের ছাপটি দিয়ে অসিত ও দুর্গাকে মারতে লাগলেন। বিষ্ণু মাস্টার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সন্তোষ মাস্টারকে থামালেন — সন্তোষবাবু করছেন কি, মরে যাবে যে—

হাতের ছপটি ফেলে দিয়ে রোগা সন্তোষ মাস্টার হাঁফাতে লাগলেন।

আর আমি সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম এক মহৎ কিছু অর্জন করেছি। কি সে তা সেদিন বুঝিনি।

আজ বুঝেছি, দেশকে ভালবাসার মত অনির্বচনীয় আনন্দ আর কিছু নেই। সেদিন থেকে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই দেশপ্রেমকে জীবনের গভীর মূল্যবোধের অঙ্গীভূত করে দেখে এসেছি।

আমাদের বাড়িতে একটি ছেঁড়া বই ছিল। তার নামটি মনে আছে (রাজ-রানী।) সেই বই-এর একটি জায়গা আমি বার বার পড়তাম ঃ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়।

বাড়িতে গিয়ে এই মারের কথা মাকে বলব কিনা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম। শুনে মা হয়তো আমাকেই বকবেন। বলবেন, তুই কেন পাকামো করে বন্দেমাতরম বলতে গিয়েছিলি। তাই কী করব ঠিক করতে পারছিলাম না।

বাড়ি গিয়ে দেখলাম ফর্সা লম্বা এক বয়স্ক ভদ্রলোক খাটের ওপর বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমার বোন খাটের এক পাশে শুয়ে। ভদ্রলোকে চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। গায়ে একটা ফতুয়া। মা বললেন, দ্যাখো তো এঁকে চিনতে পারো কিনা। আমি আন্দাজে বললাম — দাদু।

মা বললেন, কীকরে চিনলি? বড় হয়ে দেখিসনি তো একবারও।

আমি মায়ের কাছে দাদামশাইয়ের গল্প শুনতাম। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার তালা থানার অধীনে জেঠুয়া জালালপুরে মামার বাড়ি। কিন্তু মা খুব বেশী দিন গ্রামের বাড়িতে থাকেননি। যখন পাঁচবছর বয়স তখন মায়ের মা, আমার দিদিমা মারা যায়। আমাদের ঘরে তাঁর একুশ-বাইশ বছরের একটি ছবি ছিল। রীতিমত সুন্দরী। দাদামশাইও সুন্দর দীর্ঘদেহী। তবে দিদিমা একটু বেঁটে ছিলেন। আমার মামা বেঁটে ছিলেন। কিন্তু মা ছিলেন নাতিদীর্ঘ আবার বেঁটেও নন। বাবা ও মায়ের রূপও তিনি পেয়েছিলেন। অল্প বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় দাদামশাই আর বিয়ে করেননি। মেয়েকে তার মামা-মামীমার কাছে রেখে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। আজ কাশী, কাল বৃন্দাবন। আবার কখনও বসিরহাট, সাতক্ষীরে। তাঁর ছিল যজমানির ব্যবসা। গুরুগিরি করতেন। শুদ্ধাচারে থাকতেন। পান তামাক চা কিছুই খেতেন না।

একমাত্র ছেলে ইসলামকাটি থেকে স্কুলে পড়াশোনা করত। যে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত তাদের বাড়ির মেয়েকেই মামা বিবাহ করেন। তখন তিনি সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন।

মায়ের লেখাপড়া বেশিদূর হয়নি। তিনি মামীমার কাছে পড়তেন। ঘরে বসে পড়াশোনা করে তিনি বাংলা লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। তাঁর গল্পের বই পড়ার নেশা ছিল। সারাজীবনে তিনি অজস্র বাংলা গল্প উপন্যাস পড়েছেন। শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি বউঠাকুরানীর হাট, নৌকাডুবি তার প্রিয় বই। মায়ের মামা জামশেদপুর পুরসভায় কাজ করতেন। মায়ের জীবন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। মামাদের সংসারে থেকে তিনি গৃহকর্মে নিপুণা হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এই সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মত দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে সুন্দরী তরুণী স্ত্রী ও আশ্রিতা বালিকা ভাগ্নিকে রেখে তিনি একদিন আত্মহত্যা করেন।

পরিবারটির মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। দাদু এসে মাকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যান। তারপর সেখান থেকেই ষোল বছর বয়সে মায়ের বিবাহ হয়ে যায়। বাবাও সেসময় বাউন্ডুলে যুবক। লেখাপড়া এগোয়নি। বাবা-মা অভিভাবক নেই। দিদিদের বিয়ে হয়ে

গেছে। ওই উদভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে মাতৃহীনা মায়ের বিয়ে হয়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে দাদু তাঁর ঘোরার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি আমার শৈশবে দু-একবার এসেছেন। কিন্তু জ্ঞান হবার পর আমার সঙ্গে দেখা সেই প্রথম।

আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই দাদামশাই বললেন, কোন ক্লাশে পড়ছ?

কেলাশ টু।

কুক্কুট বানান করতি পারো?

আমি ঘাবড়ে গেলাম।

মা বললেন, ও ভাল বাংলা রিডিং পড়তে পারে। পাড়ার লোকেরা ওকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রিডিং পড়া শোনে।

দাদু বললেন, শুধু পড়লি হবে নানে। লিখতি হবে। বানান মুখস্ত করতি হবে।

দাদামশাই দিন দুয়েক থাকলেন। আমায় কত গল্প শোনালেন। প্রথম মুখস্ত করালেন বংশপঞ্জী।

বাবার নাম। ঠাকুর্দা নাম। তার বাবার নাম। তারপর মায়ের দিকের পূর্বপুরুষদের নাম।

বললেন—ইতিহাস খালি খালি পড়ি কী হবে? বংশের ইতিহাসই আসল ইতিহাস।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা আপনার বাপ ঠাকুর্দার নাম বলতি পারে না। তোমাদের কোন মেল জানো?

আমি নিরুত্তর। দাদামশাই বললেন — খড়দ মেল। কাশ্যপ গোত্র। আমরা হলাম শাণ্ডিল্য। এবার পুরী গিয়ে সেখানে এক পাণ্ডা আমার বাপ ঠাকুদ্দার নাম বলি দিল। এত লোকের নাম ঠিকুজি ওদের খাতায় টোকা আছে।

তারপর মাকে বললেন : ফুটি, তোকে একবার তীর্থ করাতি নিয়ে যাবো। বাবা কালী, তুমি যদি সমদ্দুর দ্যাখো, অবাক হয়ে যাবা— বড় বড় ঢেউ এই ধরোগে দোতলা বাড়ির সমান।

আমি বললাম, টেনে নিয়ে যায় না—?

দাদু বললেন, সমুদ্দুর কিছু নে যায় না। সমুদ্দুরে ডোবার ভয় নেই। তবে চান করার কায়দা আছে। তুমি যদি কায়দা না জানো, বালির মধ্যে গড়াগাড়ি খাবা। গায়ে ব্যথা পাবা।

মা মুখ বেঁকিয়ে অভিমান ভরে বললেন ঃ তুমি তো শুধু গল্প শোনাও, এখানে গিয়েছি, ওখানে গিয়েছি। বিয়ের পর একবার জালালপুরেও যেতে পারলাম না। কত বউ ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাচ্ছে। আমার সব থেকেও কেউ নেই।

দাদু বললেন, অনেকদিন পরে আমিও জালালপুর যাচ্ছি। তুই যাবি? সঞ্জীবের সঙ্গে কথা বলে নে। তাহলি আমরা কালই রওয়ানা হয়ে যাবো।

কিন্তু বাবা শুনে বললেন : না-না তা কি করে হয় আমি আর কদিন পরে মহালে খাজনা আদায়ে বেরুবো এই সময়—

মাকে কোনদিন বাবার মুখের ওপর ঝগড়া করতে দেখিনি। সেদিনও করলেন না।

শুধু তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

দাদু নীরব। বাবা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, ঠিক আছে যাও। ছেলেকে সাবধানে নিয়ে যেও।

॥ পাঁচ ॥

বাংলার মুখ

মছলন্দপুর স্টেশন থেকে আমাদের খোলাপোতার বাস ছাড়ল। খোলাপোতায় বাস বদল করে বসিরহাট হয়ে ইটিণ্ডাঘাট। ইটিণ্ডায় নেমে খেয়ায় ইছামতী পেরিয়ে পাটকেল ঘাটার একটি মিনিবাসে উঠলাম। মাঝপথে কিছুক্ষণের জন্য বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাটকেল ঘাটা পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে নদীর ঘাটে সারি সারি নৌকোয় হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল। কোন কোন নৌকোয় উনুনে রাতের রান্না চাপিয়েছে মাঝিরা। দাদু একটা ছই তোলা নৌকা ভাড়া করলেন।

দাদু বললেন, আমরা ইসলামকাটি হয়ে যাবো। ইসলামকাটিতে কেষ্টর শ্বশুরবাড়িতে থাকব দুদিন। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে মাঝিরা নৌকা ছাড়ল। ধীরে ধীরে পাটকেল ঘাটার আলো ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল। নৌকার ভেতরে টিম টিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। অন্ধকারে নদীর বুকে দাঁড় টানার ছপ ছপ আওয়াজ। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

অনেক রাতে ইসলামকাটিতে এসে পৌঁছলাম। পরদিন সকালে উঠে দেখলাম এক নতুন দেশে এসে হাজির হয়েছি। এটি মামার শ্বশুরবাড়ি। মামা মামী দুজনেই বাইরে থাকেন। মামা তখনও রেলের চাকরি পেয়ে কাঁচরাপাড়াবাসী হননি। এদিক ওদিক চাকরির চেষ্টায় ঘুরছেন।

এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার সঙ্গে মা আলাপ করিয়ে দিলেন। কেষ্ট মামার শাশুড়ি। দেখে বললেন, আরে কালী কত বড় হয়ে গেছে।

মা বললেন, তোমার খুব ছোটবেলায় তোমার গায়ে এগজিমা হয়েছিল। এই দিদা তোমায় যত্ন করেছেন। এগজিমা আর হয়নি মাসীমা। কী ভোগাটাই না ভুগলে সে সময়।

আমি একটু পরে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাটির বাড়ি। বিরাট উঠোন। বাগান। গোয়াল ঘর। ধানের গোলা। বাড়ি থেকে নদী দেখা যাচ্ছে। কত নাম না জানা পাখি গাছের ডালে। মাঘ মাসের শিরশিরে হাওয়া। গাছের ডাল আমের বউলে ভরে গেছে।

ইসলামকাটিতে দু'দিন কাটিয়ে তারপর দিন সকাল বেলাই নৌকো ধরে আমরা পৌঁছলাম জেঠুয়াতে। সেখান থেকে দু-মাইলের মত হাঁটা রাস্তা। কিন্তু দেখতে দেখতে দু-মাইল রাস্তা পেরিয়ে জালালপুরে এসে পৌঁছলাম।

জালালপুর এক আশ্চর্য মায়াঘেরা গ্রাম। মামার বাড়িতে একটি বিরাট উঠোন। সেখানে ধান ঝাড়া ধান মাড়াই হয়। পাশেই ধানের গোলা। উঠোনকে ঘিরে দু'পাশে মাটির বাড়ির সারি। একদিকে আমার দাদামশাইয়ের বাড়ি। বিপরীত দিকে মায়ের দুই

জেঠামশাইয়ের বাড়ি। শোওয়ার ঘর থেকে অনেকখানি হেঁটে গেলে রান্নাঘর। সেখানে পাশাপাশি শরিকদের উনুন। তার পাশে ঢেঁকি। সেটাও পর্যায়ক্রমে শরিকেরা ব্যবহার করেন।

বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া শিব মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ। আর একটু এগিয়ে গেলে পুকুর। পরবর্তীকালে এই পুকুরে একটি ছোট বিমান ভেঙে পড়েছিল। বিদেশী যাত্রীবাহী বিমানটিব যাত্রীরা নাকি বহু গভীরে মাটির মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। পরে জল ছেঁচে মাটি কেটে মৃতদেহ ও বিমানের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়।

মামার বাড়িএসে আমার কোথাও হারিয়ে যাবার মানা থাকল না। বামুনপাড়া পার হয়ে কলুপাড়া। ওদিকে সতু ডাক্তারের বাড়ি। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার তাও হাতুড়ে। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করাতো। ডাক্তার হিসাবেও তাঁর দারুণ পসার।

গ্রামের একদিকে ছিল মুসলমানপাড়া। এতদূরে যে ওই পাড়ায় কখনও যাইনি। শুধু দোলের শোভাযাত্রা নিয়ে সংকীর্তন করতে কবতে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে আমরা সে পাড়া দিয়ে যখন একবার যাচ্ছিলাম তখন দেখি মুসলমানেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড গালাগালি দিচ্ছে।

কেন - হিন্দুদের নগর সংকীর্তন মসজিদের পাশ দিয়ে নাকি যাওয়া নিষেধ। বাজনা বাজানো তাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এতে তাদের ধর্মে লাগছে। সম্ভবত তাদের রাগাবার জন্যই ওই রাস্তা দিয়ে নগর সংকীর্তন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা প্রতিবছরই নাকি ঘটত।

জালালপুরে গোবরডাঙ্গার মত অত ঝোপঝাড় ও জঙ্গল ছিল না। ঘন বসতি পার হলেই পড়ত পুকুর। প্রত্যেক পাড়াতেই একটা দুটো পুকুর। গাছ বলতে নারকেল সুপারি আর বাবলা গাছই বেশি। ভেরেণ্ডা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা এক একটা বাড়ি। মামার বাড়ির পাশেই ছিল ঘটকদের বাড়ি। ওদের বাগানে নানা রঙের ফুল ফুটে থাকত। পাকা চুল কালো গায়ের রঙ ছোট-খাটো মানুষ ঘটক মশাই নিজে হাতে ফুল গাছের তদারক করতেন। ফুলে হাত দিলে বলতেন, ফুল হল গিয়ে গাছের শোভা। খবরদার ফুল তুলবা না।

কত প্রজাপতি এসে বসত। কত পাখি বসত গাছের ডালে। লেজ ঝোলা, দোয়েল, কাঠঠোকরা। মন্দিরের গায়ে তক্ষক সাপের বাসা ছিল। রোজ সন্ধ্যা হলেই ডাকত তক্ষক, তক্ষক।

শুনে ভয়ে বুক কেঁপে উঠত।

মা বলতেন : অভিশাপ না থাকলে তক্ষক সাপে কাউকে কামড়ায় না।

আমাদের ছোটদের একটা বিরাট দল হয়ে গেল কিছুদিনের জন্য। এ গল্প সে গল্প। ভূতের গল্প হত প্রায়ই। গতখালির ভূতের গল্প তখন মুখে মুখে চাউর হয়ে গিয়েছিল। নানা পল্লবিত হয়ে সে গল্প আমাদের মামার বাড়ির গ্রামেও চলে এসেছিল।

আমার একা চলা ফেরার পথে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একজন। তাকে

আমরা কনেক বলে জানতাম। সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে। লোকটি ওই গ্রামের পাগল। কিন্তু সেয়ানা পাগল। আমাকে দেখলেই সে চোখ পাকিয়ে এগিয়ে আসত। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যেত। আমি ছুটে পালিয়ে আসতাম।

দেখতে দেখতে আমের বউলে গুটি ধরে এল। গুটি গুলোও বড় হতে শুরু করল। চোত মাস শেষ হতে চলল। সারা মাস ধরে চলেছে গাজন। শিব উমা সেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিবায়নের ছড়া বলা গাজনের অঙ্গ। উমা গ্রামের বউ। শিব আত্মভোলা নিষ্কর্মা বাঙালি স্বামী। একটা ছড়া ছিল ঃ উমা বলছে শিবকে,

হাটে যাও বাজারে যাও শোন আমার কথা।
হাট-বাজারতো যেমন তেমন, এনো তামাকের পাতা।

চোত শেষ হয়ে বোশেখ এল।

বড় বড় তালগাছগুলো তালশাঁসে ভরে উঠল। দু-একদিন ঝড়ও হয়ে গেল। মায়ের জেঠুতুতো ভাই-বোন ছিল অনেকগুলি। এদের মধ্যে দুই বোন ননী ও ঝনি। বাবা মা নেই। দাদারাই অভিভাবক। ননী-ঝনি ছিল আমার খেলার সাথী। ননী বড় বলে বেশি সময় পেত না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। ঝনি আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়।

একদিন সকালে দেখি পুকুরপাড়ে ফেলে ঝনিমাসীকে নির্মমভাবে মারছে তার দাদা। বিছানায় প্রস্রাব করা তার রোগ হয়ে গিয়েছিল। এই রোগের জন্য যে রোগী নিজে দায়ী নয়, তা কে বোঝাবে। মারই ছিল একমাত্র ওষুধ।

ঝনিমাসীকে পরবর্তীকালে দেখেছি আমার কলকাতার বাসায় আসতে। সে তখন বিবাহিতা কিন্তু স্বামী পরিত্যক্তা। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসত। আমি ও মা তাকে অনেক বলেছিলাম যে তুমি কেন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমাদের কাছে থাকো।

প্রথম প্রথম বেশ ভালভাবেই থাকত। কিন্তু কিছুদিন পরেই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করত ঝনিমাসী। তারপর পুটলি-পোঁটলা নিয়ে চলে যেত। কোথায় যে যেত কয়েক বছর তার হদিশ পাওয়া যেত না। তারপর আবার একদিন আমি অফিস থেকে ফিরে শুনতাম ঝনীমাসী এসেছে।

সেদিন দুপুরবেলা বেশ জোরে জোরে বাতাস বইছিল। জষ্টি মাস পড়ে গেছে। দুপুরবেলা আমরা আমবাগানেই কাটাই।

সেদিনও থলি নিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গাছতলায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় ধপ করে একটা আম পড়তেই আমি ছুটতে গিয়ে একটি শুয়ে থাকা কুকুরের ঘাড়ের উপর পড়লাম। কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁক করে আমার বাঁ পায়ের গোড়ালিতে কামড়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে পায়ে একটি যন্ত্রণা অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি তিনটি দাঁত বসে গিয়ে ক্ষত হয়ে গেছে রক্ত পড়ছে।

এই অবস্থায় অন্যান্য বাচ্চারা চিৎকার করে উঠল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুটলাম। মা বেরিয়ে এলেন। কী হয়েছে?

আমায় কুকুরে কামড়েছে।

মা হাউমাউ করে উঠলেন। দাদু ছুটে এলেন। কী হল?

মা বললেন ঃ কালীকে কুকুরে কামড়েছে। কতবার পই পই করে বলেছি, দুপুরে বাড়িতে ঘুমো। গরমের মধ্যে বাগানে যাসনি। ঠিক হয়েছে এবার দাদু কোথা থেকে একটি ছপটি নিয়ে এলেন। অমন শান্ত নিরীহ মানুষটির দুচোখ যেন হিংস্র জন্তুর মত হয়ে গেল। তিনি আমাকে বাঁ হাত দিয়ে জাপটে ধরে নির্মমভাবে মারতে লাগলেন।

দাওয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মা কাঁদতে লাগলেন।

এই ঘটনার ক'দিন পরেই বাবা এসে পড়লেন মামার বাড়িতে। না, কেউ তাঁকে খবর দেয়নি। তিনি খেয়ালি মানুষ, নিজেই চলে এসেছেন ঘুরতে ঘুরতে।

বাবা যখন আসেন সে সময় বাগানী মাসীমার স্বামীও (মায়ের এক জেঠতুতো বোন) এলেন। বাগানী মাসীমার ছেলে জয়দেব আমারই বয়সী। আমারই খেলার সঙ্গী। দুই জামাই-এর আগমনে জালালপুরের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে হই-চই পড়ে গেল। গ্রাম বাড়ির প্রথা অনুসারে জেলেদের ডেকে পুকুরে টানা জাল ফেলা হল।

আর টানা জালে একটা বিরাট পাঙাশ মাছ ধরা পড়ল। মাছটিকে তুলতে গিয়ে একটি জেলের হাতে মাছটা তার কাঁটা এমন ভাবে বিঁধিয়ে দিল যে লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল। অথচ কাঁটাটি এমনভাবে বিঁধেছে যে টেনে তুলতে পারল না। তখন লোকটিকে কাঁটা বেঁধা অবস্থায় মাছ সমেত উঠোনে নিয়ে আসা হল। সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে।

সতু ডাক্তারকে ডাকা হল। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, তোমরা দু'জন ধরে কাঁটাটা টেনে তোল। তখন দু'জন লোক লোকটির হাত টেনে কাঁটা বার করল। তার হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটি। ঠিক সে সময় আমি বললাম জয়দেবকে — আমার বাবার জন্য মাছটা ধরা হয়েছে। জয়দেব প্রতিবাদ করল : আমার বাবার জন্য ধরা হয়েছে।

এবার আমি সোচ্চারে প্রতিবাদ করলাম। জয়দেবও ছাড়বার পাত্র নয়। আমি ছোটবেলা থেকে দুর্বল। তদুপরি মারকুটে স্বভাবের ছিলাম না। কাউকে মারধর করতে যে সাহস লাগে তা আমার ছিল না—আজও নেই। সেজন্য সমবয়সীরা অনেকে আমাকে মেরেছে। আমি সহ্য করেছি। কখনও আঘাত ফিরিয়ে দিইনি। আমার এই শারীরিক দুর্বলতা আমাকে কিছুটা নির্বিরোধ করে তুলেছে। কিন্তু তা বলে কখনও ভীরু করেনি। আমাদের দুজনের মধ্যে মারপিঠ লেগে গেল। বড়রা এসে ছাড়িয়ে দিল।

বাবার সঙ্গে দেখা হল একান্তে।

কেমন আছ বাবা? খুব রোগা হয়ে গিয়েছ। বাবা বললেন।

এবার আমি কেঁদে ফেললাম। বাবা, আমি এখানে থাকব না।

কী হল বাবা?

আমাকে দাদু মেরেছে। প্রচণ্ড মেরেছে।

কেন মেরেছে?

কুকুরে কামড়েছিল।

বাবা চমকে উঠলেন।

কুকুরে কামড়েছে? বল কী?

মা এলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। কালী বলছে কী? ওকে নাকি কুকুরে কামড়েছে? বাবা রীতিমত উদ্বিগ্ন।

মা বললেন — এর মধ্যে তোমাকে লাগানো হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, কুকুরে কামড়াবে ছাড়া কী হবে? আমার কি কোন কথা শোনে তোমার ছেলে? আমি আর ওকে সামলাতে পারছি না। তুমি ওকে নিয়ে যাও।

ঃ ডাক্তার দেখেছে?

সে তোমায় বলতে হবে না। পোষা কুকুর। কোন ভয় নেই। কুকুরটা মরেও যায়নি। তা ছাড়া ওঝা ডাকা হয়েছিল। পাট বেঁধে দেখা গেছে বিষ নেই। কুকুরে কামড়াবার পরের দিন দাদু ওঝা ডেকে এনেছিলেন। ওঝা আমাকে ঝাড়ফুঁক করল। তারপর এক গোছা পাট নিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে দুজনে দুদিক ধরে টানতে লাগল। আমাকে বলেছিল ঃ লাগছে খোকা? আমার লাগছিল না। কোন অনুভূতিই হচ্ছিল না।

ওঝা তার মধ্যে মন্ত্র পড়তে লাগল জোরে জোরে। দশ মিনিট পরে বলল ঃ লাগছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, এইবার লাগছে। ওঝা বলল : আর বিষ নেই। এরপর থেকে সবাই নিশ্চিন্ত।

বাবা শুনে বললেন, তবুও কুকুরের কামড়— তাই বিশ্বাস হয় না। কদিন ধরে বাঁ চোখটা লাফ দিচ্ছিল জানো— তা ভাবলাম তোমাদের কোন বিপদ আপদ হল নাকি— বসিরহাটে হরিপদর কাছে (মায়ের আর এক জেঠতুতো দাদা। বসিরহাটে থাকতেন) গেলাম। সে কোন খবর দিতে পারল না। আম তাই চলে এলাম। এবার চলো, ফিরে যাই। পাঁচমাস তো কাটালে।

মা বললেন—আমি তো জষ্টি মাসটা কাটিয়ে যাবো ঠিক করেছি। বাগানী সবে এয়েছে। আবার কবে দেখা হবে জানি না। এই তো আটবছর পরে এলাম। বাবা আর কিছু বললেন না।

শেষ রাতে বাবা চলে যাবেন। আমি রাতে বায়না ধরেছিলাম, আমায় নিয়ে যাও। আমি এখানে থাকব না—বাবা আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন, ঠিক আছে বাবা, তোমায় নিয়ে যাবো।

বাবার ইচ্ছা ছিল আমাকে ফেলে চুপি চুপি চলে যাবেন।

কিন্তু শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। চারিদিকে মরা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে। হ্যারিকেনের নিষ্প্রভ আলোয় বাবা জামা কাপড় পরে যাবার জান্য তৈরি।

মাকে বলছেন — সাবধানে থেকো। আমি আষাঢ় মাসে এসে নিয়ে যাবো। তখন খুলনায় আসতে হবে একবার। সে সময় আসবো।

মা বললেন — তুমিও সাবধানে যেও। তোমার ও সময় না আসলেও চলবে। বাবা নিয়ে যাবেন, সে রকম কথা আছে।

এমন সময় আমি ঘুম থেকে তড়াক করে উঠে বাবাকে বললাম। আমায় না নিয়ে

কোথায় যাচ্ছ?

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম বাবার হাত দুটি ধরে। দাদু ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন মা বোঝাচ্ছেন। কিন্তু আমি কেঁদেই চলেছি।

শেষ পর্যন্ত জষ্টিমাসের এক শেষ রাতে গ্রামের নির্জন পথ ধরে বাবার সঙ্গী হয়ে আমি চলতে লাগলাম। আকাশের তারারা জ্বল জ্বল করছে মাথার ওপর। কলাক্ষয় হতে হতে কৃষ্ণপক্ষের ফালি চাঁদ উঠেছে শেষরাতে। কয়েকটি গাছে পাখিরা উঠে ডাকতে শুরু করেছে কিচির মিচির করে।

জালালপুর পার হয়ে জেঠুয়ায় নদীর ঘাটে এসে নৌকোয় উঠলাম। এবার বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। সেদিন আসার সময় রাতের অন্ধকারে যে নদীকে দেখতে পাইনি আজ দেখলাম। বেশ চওড়া নদী। মাঝ নদীতে নৌকো পড়তেই আমি চোখে জল দেবার জন্য নদীর জলে হাত দিতে গেলেই মাঝি বারণ করল ; জলে হাত দেবেন না খোকাবাবু। কুমির আছে নদীতে। কোনখানে ঘাপটি মেরি তিনি বসে আছেন, তা কে জানে।

ঃ তুমি কুমির দেখেছ?

ঃ কত? তবে শীতকালি আলি দেখতেন—চরায় শুইয়ে রোদ পোহাচ্ছে কত কুমির। এদিকে তো শুনি কত গোরু, বাছুর, মানুষ টেনে নেয় প্রায়ই।

বাবা বললেন ঃ আমার সঙ্গে যাচ্ছ, কথার অবাধ্য হবে না বাবা। বাপ-মায়ের কথার অবাধ্য হলে হাতে হাতে শাস্তি পেতে হয়।

পাটকেলঘাটা কটার সময় পৌঁছব মাঝি?

মাঝি বলল ঃ তিনঘণ্টা তো লাগবেই।

কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম সূর্য উঠছে একটা গোল সোনালি থালার মত। কে যেন সিঁদুর লেপে দিয়েছে পুবের আকাশে। সূর্য তো প্রতিদিনই ওঠে। কিন্তু এক একদিন সেই নৈমিত্তিক ঘটনাকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। মনে হয় এই যে সারা আকাশ রাঙিয়ে সূর্য ওঠা তা শুধু আমার জন্যই। এই যে রূপালি জলের রেখা, দাঁড়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ, মাঝে মাঝে শুশুকের ভেসে উঠে ডুবে গিে. নদীর বুকে আবর্ত কাটা। ওই যে দুপাশে সবুজ বন রেখা, নীরব শান্ত, স্রোতস্বিনী এক বিস্ময়কর নীরবতার মধ্য দিয়ে নিরন্তর দাঁড় বেয়ে চলা এ যেন শুধু আমারই জন্য। যেদিন দাদুর কাছে মার খেয়েছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল বেঁচে থাকা অর্থহীন। এ পৃথিবীতে কেউ আমায় ভালবাসে না। কিন্তু এখন আমার মনে হল, না, পৃথিবীর সবাই আমাকে ভালবাসে। নয়তো আজ এমন করে সূর্য উঠত না। এমন সুন্দর এক সকাল কেউ আমাকে উপহার দিত না।

বসিরহাটে মায়ের দুই জেঠতুতো দাদা থাকতেন, হরিপদ মামা আর বিষ্ণুমামা। হরিপদ মামা কোর্টেকাজ করতেন। সেই সূত্রে তাঁর শহরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বিষ্ণুমামা হাসপাতালে কমপাউন্ডার ছিলেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুমামা টিবি রোগে

আক্রান্ত হয়ে বিশ বছরের মত কল্যাণী হাসপাতালেই কাটিয়ে দেন। হতভাগা টিবি রোগীরা হাসপাতালে আসার পর সামাজিক পুনর্বাসনের ভয়ে নিরাময় হওয়ার পরও হাসপাতাল ছেড়ে যেতে ভয় পান। জোর করে তারা হাসপাতালে থেকে যান। মেন্টাল হাসপাতালেও আমি এমন বহু লোক দেখেছি। বিষ্ণুমামা আর কোনদিন পরিবারে ফিরে যাননি। হাসপাতালেই তিনি একদিন মারা যান।

হরিপদ মামা খুব দিলদরিয়া মেজাজের লোক ছিলেন। লোকজন খাওয়াতে ভালবাসতেন। নিজের প্রভা-প্রতিপত্তির কথা লোককে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে আনন্দ পেতেন। এইভাবে অতিমাত্রায় খোলাখুলি কথাবার্তা বলার জন্য শত্রুতার ফাঁদে পড়ে তিনি কিছুদিন চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। পরে তিনি আবার চাকরি ফিরেও পান।

আমাদের পেয়ে হরিপদ মামা খুব যত্ন করলেন।

মিলনী সিনেমার কয়েকটি পাস নিয়ে আমাদের সিনেমা দেখালেন। প্রথম দিন, শহর থেকে দূরে, দ্বিতীয় দিন, মানে না মানা।

সেই প্রথম সিনেমা দেখা। ১৯৪৫ সাল। সিনেমার গল্প কিছুই বুঝিনি। শুধু ছবিগুলো নড়ছে চড়ছে কথা বলছে এটা দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে গোবর ডাঙ্গায় যখন সিনেমা আসে তখন আমি সিনেমার পোকা হয়ে গিয়েছিলাম। এমনকী ক্লাস পালিয়ে বনগাঁর হীরামহল সিনেমা, বনগাঁ টকিজ ও হাবড়ার রূপকথা সিনেমা হলে নিয়মিত সিনেমা দেখতে যেতাম।

বসিবহাটে হরিপদ মামার বাড়ির পাশ দিয়েই বহে যেত ইছামতী। বাড়ির সামনে দিয়ে মসৃণ পিচের রাস্তা। দিনরাত হুশ হুশ করে গাড়ি যেত রাস্তা দিয়ে। মামার ছেলেমেয়েদের সাথে হই হই করে কটা দিন কেটে গেল। বসিরহাট থেকে মার্টিন রেলে চেপে কলকাতা পৌঁছলাম। উঠলাম কালিগঞ্জে পিসিমার বাড়ি।

কলকাতায় গিয়ে বাবার প্রথম কাজ হল আমার দেহে কুকুরের বিষ আছে কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দিহ ন হওয়া। এজন্য তিনি একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে একটি ওঝার সন্ধান পান। ওই ওঝা থালা পড়া দেয়। থাকে চেতলায়।

ওঝার কাছে বাবা নিয়ে গেলেন। তখন কালীঘাটে সরু কাঠের পুল পেরিয়ে ডোবা আর জঙ্গলে ভরা অঞ্চল ছিল চেতলা। সেখানে একটি বাড়িতে যেতে ওঝার সঙ্গে দেখা হল। তিনি সব শুনে আমাকে মাটিতে আসনে বসতে বললেন। তারপর একটি থালা মন্ত্রপূত করে পিঠে লাগিয়ে ছেড়ে দিলেন। দেখলাম থালাটা পিঠের সঙ্গে সেঁটে আছে।

ওঝার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যেন এইটাই তিনি আশা করছিলেন।

বললেন, বিষ হয়েছে। নামেনি। কুকুরটা কী পাগলা ছিল?

আমি বললাম, না, তবে রাস্তার কুকুর।

ওঝা বাবাকে বললেন, থালাটা কেমন সেঁটে গেছে দেখছেন? তার মানে বিষ নামেনি।

বাবা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, তাহলে কী হবে?

ঃ কোন চিন্তা নেই। বিষ নেমে যাবে। মন্ত্রশক্তি এখনও আছে' এই বলে ওঝা অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠন করে থালাটা পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

॥ ছয় ॥

শকুন্তলার আংটি

ক্লাস থ্রিতে উঠে হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। রেল স্টেশনের পাশে ইস্কুলের নাম গোববডাঙ্গা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়। সিপাহী বিদ্রোহেরও এক বছর আগে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোবরডাঙ্গার জমিদাররা। তাঁদের আস্তাবলে এই স্কুল শুরু। পরবর্তীকালে খাঁটুরা গ্রামের আর একটি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে এর নাম হয়েছিল গোবরডাঙ্গা খাটুরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।

হেডমাস্টার বঙ্কিম বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কালো বলিষ্ঠ চেহারা। মাথাটা গোল। ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্ত। অশ্বিনী দত্তের বাণী ঃ 'সত্য-প্রেম-পবিত্রতা' ইস্কুলের সমস্ত ক্লাশে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। বরিশালের ভাষায় কথা বলতেন। তাঁকে ছেলেরা প্রচণ্ড ভয় করত। আমি তাঁকে আগে আর একবার মাত্র দেখেছিলাম। ইস্কুলের মাঠে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন দেখানো হবে অর্থাৎ নানারকম রঙিন স্লাইড। তা দেখবার জন্য স্কুলের মাঠ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা সবাই হই-চই করছে। এমন সময় এক কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে দেখা গেল মুহূর্তের মধ্যে সবাই চুপ।

সবাই ফিসফিস করে বলতে শুরু করল ঃ হেডমাস্টার। হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার আসতেই ম্যাজিক ল্যান্টার্ন শুরু হল একটি সিংহের ছবি ঃ তলায় লেখা Ope.. your eyes ঃ চোখ খোল। দুনিয়ার দিকে তাকাও।

সেই বঙ্কিমবাবুর কাছে গিযে দাঁড়াতে হল ভর্তির জন্য।

বাবার বন্ধু ছিলেন শিব মাস্টার। বাবা নিয়ে গেলেন শিব·· বুর কাছে। শিববাবু আমাকে ও বাবাকে নিয়ে ঢুকলেন বঙ্কিমবাবুর ঘরে।

ঃ কী চাই? ভর্তি হইব বুঝি?

শিববাবু বললেন, সঞ্জীব আমার বন্ধুলোক। এরই ছেলে।

কোন কেলাসে ভর্তি হইব?

বাবা বললেন, আমার তো মনে হয় ও ফোরেই ভর্তি হতে পারবে। ক্লাস টু পাঠশালায় পড়েছ। থ্রিতে উঠে খুলনায় চলে গিয়েছিল। বাড়িতে পড়েছে একবছর।

হেডমাস্টার বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হয়ে একটা কাগজ পেনসিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, ইংরাজিতে নিজের নাম, বাবার নাম, গ্রামের নাম ল্যাখো।

ইংরাজিতে আমার বিদ্যা তখন বি এল এ ব্লে, সি এল এ ক্লে পর্যন্তই। এ বি সি ডি লিখতে পারি। তবে বড় হাতের ও ছোট হাতের অনেক অক্ষরের মধ্যে গণ্ডগোল

হয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা হাতে লিখলাম।

বঙ্কিমবাবু বললেন, ফোরে নিতে পারবো না। তবে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করতে পারি। পাঁচটাকা আনছেন? এই স্লিপটা লইয়া ওই ঘরে কেরানি বাবুর কাছে যান। আর দ্যাখো ইংরাজিটা কিন্তু ভাল করিয়া শিখবা। ইংরাজি যে জানবে সে বিশ্বজয় করতে পারবে।

বাবা বললেন ঃ প্রণাম করো। হেডমাস্টার মশাইরে প্রণাম করো। আজ তুমি হাইস্কুলে ভর্তি হলে।

অনেক দিন আগে বাবার একবার প্লুরিসি হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর শরীরটা ভেঙে যায়। প্রায়ই বুকে বেদনা হত। বাসক পাতা দিয়ে গরম জলের সেঁক করতে হত।

তার ওপর বাবার ছিল সিগারেটের নেশা। প্রতিদিন এক প্যাকটে সিগারেট না হলে তাঁর চলত না। নিজে খেতেন, লোককেও দিতেন। বাবা সিগারেটের নানা ব্র্যান্ড বদল করে শেষ পর্যন্ত কাঁচি সিগ্রেট ধরেছিলেন।

বাজারে কালো কামারের সোনা-রুপোর দোকানে বিকেলের দিকে আড্ডা দিতে যেতেন। হাটবারে গিয়ে দাখিলা নিয়ে বসতেন। কোন প্রজা হয়তো বলতো হাটবারে খাজনার টাকাটা দেবো ছোটবাবু। আমিও বাবার সঙ্গে যেতাম। কোন প্রজাকে দেখতে পেলে বাবা ছুটে গিয়ে ধরতেন।

ও রমজান আলি। এদিকে শোন। এই নিয়ে তোমার কিন্তু চার সনের খাজনা বকেয়া পড়ল। আজ অন্তত দু সনের বকেয়া মিটিয়ে দিতেই হবে।

রমজান বলল, আর আর পারব না বাবু। এক ঝুড়ি বেগুন এনেছিলাম। পাইকার যা দাম দিল তাতে তেল নুন কিনতেও পারব না .... পরের হাটে নেবেন।

বাবা বললেন ঃ এইভাবে তুমি কত হাট ঘোরালে বলতো রমজান। তোমার কী ধম্মো বলে কিছু নেই। দাও আট গণ্ডা পয়সা অন্তত দাও। একসনের দাখলে লিখে দেই।

রমজান কিছুতেই ভিজল না। সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

বাবা যেন একটু ক্লান্ত হয়েই দোকানে ফিরে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে কালো কামারকে একটা সিগারেট দিয়ে বললেন ঃ দেখেছ কালো। কালে কালে কী হল। কাঁচি সিগ্রেট খাচ্ছি বলে মনেই হচ্ছে না। আগে এখানে বসে কাঁচি খেলে সারা ঘর ম-ম করত।

কালো কামার সায় দিয়ে বলল ঃ যা বলেছেন ছোটবাবু। যা দিনকাল পড়ছে। ভেজাল সবই ভেজাল।

একটু পরে বাবা বললেন, আট আনা পয়সা হাওলাৎ দাওতো কালো। আজ তো একটা পয়সাও আদায় হল না। কিছু বাজার করে তো নিয়ে যেতে হবে। শরীরটাও ভাল লাগছে না, বাড়ি চলে যাই।

কালো কামার বিনা বাক্যব্যয়ে একটা আধুলি বার করে দিল।

হাট থেকে ফিরে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথমে জ্বর। তারপর পেট খারাপ। শেষ পর্যন্ত রক্ত আমাশা।

একমাসের ওপর বিছানায়। সে সময় কীভাবে যে সংসার চলছিল তা আমি জানি না। তবে তখনও খুলনার জমি বেচা টাকার কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এর আগে আমার ছোট বোন ভুগল টাইফয়েডে। দেখা গেল মায়ের হাতের সোনার চুড়ি দেরাজের মাথায় যেখানে থাকত, সেখানে নেই। সারা বাড়ির কোথাও নেই।

মা বাবাকে বললেন তুমি নিয়েছ? বাবা যেন গাছ থেকে পড়লেন। আমি? আমি নিতে যাবো কেন? তাহলে হয়তো দেখো বাইরের কোন লোক যারা রুগী দেখাতে আসত তাদের কেউ নিয়েছে।

সে চুড়ির কোন হদিস পাওয়া গেল না।

বোন সেরে উঠতে না উঠতে বাবার এই অসুখ।

মাসখানেক পরে বাবা সেরে উঠলেন। বললেন, আমি কলকাতায় আবার দিদির কাছ থেকে ঘুরে আসি।

কলকাতা থেকে রাতেই বাবা ফিরে এলেন। মাকে বললেন, ফনী ডাক্তার তো চেঞ্জে যেতে বলেছিল। কিন্তু চেঞ্জে যাওয়া বললেই তো যাওয়া যায় না। তাই দিদির কাছে গিয়েছিলাম যদি কিছু সাহায্য করেন। দিদি বললেন, তা তুমি বৌজকে (বাবার ভাগ্নে) বলো। বিমলকে (বৌজের ভাল নাম) অনেক বলে রাজি করিয়েছি। মাসে ত্রিশ টাকা করে পাঠাবে। আর ট্রেন ভাড়ার জন্য একশ টাকা নিয়ে এসেছি।

মা বললেন, কোথায় যাবে কত দিনের জন্য যাবে কিছু ঠিক করেছ?

বাবা বললেন ভাবছি কাশীবাসী হবো। বছরখানেক থেকে আসি।

বছরখানেক? ছেলের লেখাপড়া?

এক বছরে কোন ক্ষতি হবে না। ফিরে এসে ক্লাশ ফোরেই ভর্তি হবে। শরীরটা তো আগে বুঝলে কিনা।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম। উৎসাহের আতিশয্যে আমি বলে উঠলাম। আমায় নিয়ে যাবে তো বাবা?

মা ধমকে উঠলেন। 'তুই এখনও ঘুমোসনি?'

বাবা বললেন, আমরা সবাই যাবো।

কবে বাবা?

শিগ্রি। তবে এখন ইস্কুলে কিছু বোল না। হেডমাস্টারকে আমিই বলবো।

মাকে বললেন, ওগো শুনছ? কাশীতে কুন্দ থাকে না? ঠিকানা জানো?

মা বললেন, না। ওর বিয়ের পর কখনও তো আসেনি। বিয়ের আগে আমার প্রথম ছেলেটা হওয়ার সময় সেই যে এসেছিল। তখন আমরা গোবিন্দ রক্ষিতের বাড়ি থাকতাম। তবে শুনেছি কাশীতে ভাল বিয়ে হয়েছে। জামাইয়ের বড় ব্যবসা। ছেলেপুলেও হয়েছে। এক ছেলে কালীর চেয়ে (আমার ডাক নাম) বছর দুয়েকের ছোট। তবে রানীদির ঠিকানা আছে।

রানীদি?

বাঃ রানীদিকে ভুলে গেলে? একবার জালালপুরে দেখেছিলে। জেঠামশাইয়ের বড় মেয়ে। কুন্দর দিদি। ওরাও তো কাশীতে থাকে। ঠিকানাটা লেখা আছে।

ওঃ সেই যার সতীন আছে?

হ্যাঁ। জামাইবাবুর দুই বউ। রানীদি ছোট বউ। তবে দুই সতীনে শুনেছি খুব ভাব। কেউ বাইরে থেকে থেকে দেখে বুঝতে পারবে না, ভাববে দুই বোন বুঝি।

ঠিক আছে, তাহলে তোমার রানীদিকেই চিঠি লিখে জানিয়ে দাও, আমরা যাচ্ছি।

প্রথমে গিয়ে ওদের বাড়িতে উঠব। তারপর একটা বাড়িটাড়ি ভাড়া নিয়ে নেবো।

এরপর থেকে রোজ কাশীর গল্প হতো। মা বলতেন, অনেক ভাগ্যে লোকে কাশীতীর্থ দর্শন করে।

ন্যাড়া কামারের বউ শ্যামার মা জিজ্ঞাসা করে, সেই ভাল দিদি। কিছুদিন কাশীবাসী হয়ে এসো। আমার ভাগ্যে তো আর হল না। আর তোমার বোন যখন ওখানে আছে।

মার পেটের বোন নয় শ্যামার মা। আমার জেঠতুতো বোন। তবে একই বাড়ি আমাদের। এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি। দিদির স্বভাবটা খুব ভাল। ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিল। মামীমার কাছে মানুষ। বাপের বাড়ি আসলে জেঠিমাই মায়ের মত দেখত। নিজের মেয়েদের সঙ্গে আলাদা করেনি। যাবার আগে তোমার ধারধোর মিটিয়ে দেব শ্যামার মা। তা হ্যাঁ কত যেন পাবে?

মুড়ির দরুন আট আনা। তা তোমার সময় মত দিও কালীর মা। কবে যাবে তোমরা?

দেখি, চোতমাসে তো যেতে নেই। বোশেখ মাসটা পড়ুক। কালীর বাবার ইচ্ছে পুণ্যে করে তবে যায়। ওই সময়টা কিছু আদায়পত্র হয়তো।

দেখতে দেখতে পয়লা বোশেখ এসে পড়ল। চোত মাস পড়তে না পড়তেই গ্রামে গাজনের সন্ন্যাসীরা বেড়িয়ে পড়ে। তবে এখানে জালালপুরের মত শিবায়নের ছড়া কাটা হয় না। শুধু গাজনের সন্ন্যাসীরা 'তারকেশ্বরের সেবা লাগে মহাদেব' বলে ভিক্ষা করতে আসে। তারপর চোত সংক্রান্তির দিন শশীকুণ্ডুর পুকুরে শিবের মাথায় জল ঢালা হয়। কদিন ধরে সন্ন্যাসীদের নানা খেলাধুলো চলে। সবশেষে হয় ঝাঁপ খাওয়া। তেতলা সমান উঁচু ভারা থেকে জালের ওপর ফেলে দেওয়া হয় সন্ন্যাসীদের। নিচে জালের ওপর রাখা হয় ধারালো বঁটির ফালা। সিঁদুর মাখানো। সিঁদুরে পিঠ লাল হয়ে যায়, কিন্তু পিঠের কোথাও কেটে যায় না। রক্ত পড়ে না এতটুকুও। ঢাকের শব্দে বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব এই ....চিৎকার ডুবে যায়।

পয়লা বোশেখ গোষ্ঠ বিহারের মেলা বসে জমিদার বাড়ির মাঠে। মেলা ছড়িয়ে পড়ে যমুনার পাড়ে নিচু জমিতে। তাকে আমরা বলি আবরা। গরমের সময় সেখানে সবুজ মাঠ। বর্ষা এলে ডুবে যায়। সেখানে আসে ম্যাজিক। একটা মানুষের দুটো মাথা। বিদ্যুৎ কন্যা। হাঁড়ি-কলসি-মশলা, মাদুর।

ওইদিন দেওয়ানজি বাড়ির দেউড়িতে পুণ্যাহ। দুই শরিক দুদিকে হাত বাক্স নিয়ে বসে। একদিকে বাবা। অন্যদিকে বাবার জেঠতুতো দাদাদের পক্ষে গোমস্তা মশাই বসেন।

এবার কুমুদ জেঠামশাই তাঁর দুই ছেলে কানুদা ও ভানুদা সপরিবারে এসেছেন।

দেওয়ানজি বাড়ির মাঠে বিকেলে খেলতে গিয়ে কানুদার মেয়ে দীপুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আমারই বয়সী। সুন্দর মুখশ্রী। সম্পর্কে ও আমার ভাইঝি। কিন্তু এই প্রথম দেখা।

আমি খুব লাজুক। চট করে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি না। ভীষণ মুখচোরা। দীপু এসে আমার হাত ধরে বলল ঃ তোমার নাম কালী—আমার কাকা হও। পুঁচকে কাকা, বলে হো হো করে হেসে উঠল।

আমি লজ্জা পেলাম।

দীপু বলল, আমি দীপু। এসো আমরা কুমির কুমির খেলি।

কিছুক্ষণের মধ্যে দীপুর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

মাকে গিয়ে বাড়িতে বললাম, দীপুর কথা।

মা বলল, ও কানুরা এসেছে বুঝি। এই তো গত বছর শিশুরা এসে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেল। বোমার ভয়ে ওরা এসেছিল।

মা, দীপু বড্ড ভাল। বড়লোক বলে কোন অহঙ্কার নেই।

মা বললেন ঃ অহঙ্কার থাকবেই বা কেন? একই পরিবারের ছেলেমেয়ে তোমরা, ভাগ্যদোষে তোর বাবা ভিটেছাড়া .....

ঃ মা, আমরা কি ও বাড়িতে আর ফিরে যেতে পারি না?

মা বললেন, সে ভাগ্য কী আমার আর হবে বাবা। শ্বশুরের ভিটেয় কখনও সাঁঝের বাতি দিতে পারলাম না। তুই যদি মানুষ হোস তাহলে একটা বড় বাড়ি করবি। তার সামনে থাকবে লোহার গেট। আমার বড্ড শখ লোহার গেটওয়ালা বাড়ির।

রাতে স্বপ্ন দেখলাম একটা গেটওয়ালা বাড়ির সামনে ভেতরে আমি দাঁড়িয়ে। সামনে লোহার গেট তালাবন্ধ। তার ওপারে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—দীপু।

আমি বললাম ঃ দীপু? তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসো।

দীপু বলল ঃ এটা তোমাদের বাড়ি।

আমি বললাম, এটা আমাদের আসল বাড়ি না, এ বাড়ি ভাড়া করেছি। আমাদের আসল বাড়ি দেওয়ানজি বাড়ি।

দীপু বলল—ধ্যুৎ। ও তো আমাদের বাড়ি।

আমি বললাম, ওটা আমাদেরও বাড়ি। তোমার দাদু আমার বাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই তো আমি আলাদা বাড়ি করেছি।

তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসো।

দীপু বলল ঃ কী করে যাবো? তুমি তো গেটে তালা দিয়ে রেখেছে।

আমি বললাম, দাঁড়াও আমি চাবি নিয়ে আসছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার ঘরে হাতড়ে হাতড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। কী ভীষণ গরম পড়েছে। আমাদের এই ঘরে একটুও হাওয়া আসে না। আচ্ছা আমি যে বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেখানে কি ঘরে হাওয়া আসে? শীতের

দিনে রোদ্দুর এসে লুটোপুটি খায়? দীপুকে যদি আসতে বলি সত্যি সত্যি সে আমার বাড়ি আসবে তো?

সেই স্বপ্নে দেখা দীপু আমার সারা জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে ছিল। তার কিছুদিন পরেই দীপুরা চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই শৈশব স্মৃতি আমি সারাজীবন সঞ্চয় করে রেখেছিলাম।

তার অনেক বছর পরে যখন আমি চাকরিতে ঢুকেছি তখন রামমোহন রায় রোডে পঙ্কজ জেঠামশাইয়ের বাড়িতে দীপুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন সে শাড়ি পরা তন্বী তরুণী। কী একটা কাজে বেড়াতে এসেছিল। আমার সঙ্গে বউদি পরিচয় করিয়ে দিলেন—এ হল দীপু।

আমি বললাম — আমি কালী কাকা।

দীপু আন্দাজে চিনতে পেরে একটু হাসল। আমাদের মধ্যে খুব বেশি কথা হল না। দীপু আর শৈশবের মত উচ্ছ্বসিত নেই। ঝরনা যখন স্রোতস্বিনী হয় তখন সে আর ঝির ঝির শব্দ করে না। সে শুধু ধীরে ধীরে বহে চলে।

আমি বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে এতদিন পরে এভাবে দেখা হবে ভাবিনি দীপু।

দীপু নির্বাক।

আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে আমরা ছোটবেলায় এক সঙ্গে কত খেলেছি?

দীপু স্মৃতির ঝুলি হাতড়াতে শুরু করে। কিন্তু কিছুই যেন খুঁজে পায় না সে।

না, তার স্মৃতিতে আমার কোন ছবিই নেই। এমনকী অস্পষ্ট নেগেটিভ, যা একটু সূত্র ধরে দিলেই ফোটোর মতো প্রিন্ট হয়ে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সেটিও মনের মণিকোঠা থেকে কবে ফেলে দিয়েছে দীপু। অথবা টুপ করে খসে পড়েছে কোনদিন।

অথচ আমার সর্বগ্রাসী হৃদয় কেন যাকে সামনে পায় গভীর ভাবে তাকেই আত্মসাৎ করে নিতে চায়। এ এক বিচিত্র ক্ষুধার দহন। মানুষকে একবার কাছে টানলে সে যতক্ষণ না দূরে ঠেলে ফেলে দেয় ততক্ষণ সে চিতার মত স্মৃতি হয়ে জ্বলে।

দীপুর সঙ্গে আমার সেই সাক্ষাৎকার নিয়ে ছোট্ট একটি গল্প লিখেছিলাম আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে ঃ 'শকুন্তলার আংটি।'

দীপুর সঙ্গে আমার তৃতীয় ও শেষ সাক্ষাৎকার কলকাতায় তার বেলগাছিয়া ভিলার ফ্ল্যাটে। সে তখন বিবাহিতা। পুত্রবতী। তার ছেলে সেন্ট অ্যান্টনিতে পড়ে। স্বামী এতদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে কলকাতায় বদলি হয়েছে।

ঠিকানা পেয়ে আমি একদিন তার ফ্ল্যাটে বেল টিপলাম।

দীপু বেরিয়ে এল। বেশ মোটা হয়ে গেছে। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে।

আমায় চিনতে পারছ? আমি কালী কাকা।

আসুন কাকা। কেমন আছেন? কোথায় আছেন এখন?

আমি এখন খ্রীস্টোফার রোড সি আই টি বিল্ডিংসে থাকি। আমাদের জামাই কোথায়?

ওতো অফিসের ট্যুরে গিয়েছে।

দীপুর বাড়িতে সেদিন ঘণ্টাখানেক ছিলাম। বাড়িতে অভ্যাগত এলে যেমন যত্ন করে লোক তেমনই যত্ন করে চা খাইয়েছিল দীপু। কে কেথায় আছে কে কি করছে সে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিল। যাবার সময় বলেছিল, আবার আসবেন কালী কাকা।

একথা সেকথার পর আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর আর দীপুর খবর রাখতাম না। একবার শুনলাম সে আবার দিল্লী চলে গিয়েছে। ১৯৯৮ সালে মাসটা মনে নেই, দীপুর ভাই সমরকে ফোন করতে সে বলল ঃ কাকা, একটা খারাপ খবর আছে, দিদি গত কাল মারা গেছে।

দিদি? দীপু?

হ্যাঁ

কোথায় মারা গেল?

কলকাতায় তাদের বেলগাছিয়ার ফ্ল্যাটে। ইদানীং এখানেই থাকত। বেশিদিন ভোগেওনি, হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে—।

টেলিফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। মৃত্যু গোপনে গোপনে এগিয়ে আসে। বয়সের প্রাচীর সে মানে না। গুপ্ত ঘাতকের মত সে ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু আমার আফসোস ঃ শকুন্তলার আংটিটি চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

নববর্ষের পুণ্যাহ সেবার তেমন জমল না। কারণ দুর্ভিক্ষের জের তখনও চলছে। যদিও পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক। লঙ্গরখানাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চাষীরা নগদ পয়সা কেউ ঠেকাচ্ছে না।

দু'চারজন প্রজা যাও এল তাও বড় তরফের রেকাবিতে টাকা ফেলে চুপি চুপি সরে পড়েছিল।

বাবা বললেন,এই যে শম্ভু, এদিকে কিছু অন্তত দিয়ে যাও। পুণ্যের দিন শুধু হাতে চলে যাবে?

লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে আট আনা পয়সা বার করে রেকাবিতে দিল। তারপর বলল, গতবছর কিছুই ফসল তুলতে পারিনি বাবু। এবারে সব ধার শুধতেই চলে গেল। ভগবান মুখ তুলে চাইলে আগামী বার আপনাকে পুষিয়ে দেব।

বাবা বললেন, আগামীবার আমি কোথায় থাকি ঠিক নেই।

কেন কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

কুমুদ জেঠামশাই বললেন— তোমাদের ছোটবাবু কাশীবাসী হচ্ছেন হে—

সত্যি নাকি ছোটবাবু। তা কবে যাচ্ছেন? বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণ দর্শন করতে?

বাবা বললেন, আমি তো এই মাসেই যাবার কথা ভাবছি। বড় পয়সার দরকার ছিল হে। ভেবেছিলাম অন্তত ট্রেন ভাড়ার টাকাটা উঠবে।

বেশ অপ্রসন্ন হয়ে বাবা দুটো বাতাসা শম্ভুর হাতে তুলে দিলেন।

শম্ভু বেশ অশ্রদ্ধা ভরেই বাতাসা দুটো হাতে নিল। কুমুদ জেঠামশাইরা একটা করে

ছানার গজা দিচ্ছেন। তার সঙ্গে বাতাসা পারবে কেন?

॥ সাত ॥
কাশীর পথে

অবশেষে সত্যি সত্যি একদিন আমরা কাশীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বাড়িতে চাবি দিয়ে প্রতিবেশীদের বলা হল, তোমরা একটু দেখো। আমরা পুজোর আগেই ফিরে আসব।

স্টেশন পর্যন্ত গরুর গাড়ি বলাই ছিল। সঙ্গে বাক্স পেটরা কম হল না। প্রায় দুদিনের পথ। মা সঙ্গে পথের জন্য খাবার-দাবার নিলেন। লুচি আর বেগুনি ভাজা গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে সকালের ট্রেন ধরলাম।

দেখতে দেখতে ট্রেন ছেড়েদিল। পেরিয়ে গেল লেভেল ক্রসিং, ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পাশে ধু ধু বিল। যেখানে আমি ঘুড়ি ওড়াতাম। সরকারপাড়া পেরিয়ে গুমগুম করতে করতে ট্রেন যমুনার পুলে উঠল। তাকালাম কালাকুণ্ডর ঘাটের দিকে। তারপর ঘোষপুর — নিমতলাকে ডাইনে রেখে ট্রেন সামান্যক্ষণ মসলন্দপুর স্টেশনে থেমে হাবড়ার দিকে ছুটল। দুধারে শুধু বৈশাখের রিক্ত ক্ষেত। প্রচণ্ড রোদে চৌচির হয়ে ফাটা মাটি। এই সকালেই গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বড় বড় কয়লার গুঁড়ো গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে আসছে। বাবা বললেন— জানালা বন্ধ করে দাও বাবা। চোখে কয়লা পড়বে। কিন্তু আমার কান্না আসছিল। সেকী চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়ার জন্য?

আমি বন্ধু-বান্ধব, এই খেলার মাঠ, আমের গুটির ভারে আনত আম্র কানন, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে উথাল-পাতাল করা হৃদয় নিয়ে আম কুড়নো, শ্রাবণের অশান্ত বারি ধারার মাঝে ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া, আমার শৈশবের মধুর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা এই পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি কিনা বলতে পারি না। আমি এক অজানা দ্বীপের যাত্রী।

জীবনের অনন্ত সুদূরপ্রসারী যাত্রাপথ ধরে সেই আমার প্রথম যাত্রা। সেই প্রথম ঘর ছাড়া ছন্নছাড়া জীবন পথে প্রথম প্রদক্ষিণ।

শিয়ালদা থেকে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে উঠলাম। অথবা ট্রেনটির সে সময় অন্য কোন নাম ছিল কিনা বলতে পারব না। শুধু ট্রেনের গায়ে বাংলায় বড় বড় করে লেখা ছিল দিল্লী।

কলকাতা এর আগেও এসেছি। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরপাল্লার ট্রেনে আগে কখনও চড়িনি। অসংরক্ষিত থার্ড ক্লাশ কামরায় গাদাগাদি যাত্রীর মধ্যে কোনরকমে বসার জায়গা পেয়েছিলাম। সব স্টেশনে থামতে থামতে ট্রেন যাচ্ছে। স্টেশনে স্টেশনে হেঁকে যাচ্ছে হিন্দু চা-হিন্দু চা। যে চা দিচ্ছে তার বুকে বড় বড় করে লেখা—হিন্দু। বেগুনি রঙের পোশাক পরা পানিপাড়ে হেঁকে যাচ্ছে — পানি পাঁড়ে। শুনলাম, জল নাকি বিনা পয়সাতেই পাওয়া যায়।

ট্রেনে দু-তিনবার চেকার উঠল। আমার ভয় করছিল। একবার এক মেম সাহেব চেকার শিয়ালদা স্টেশনে আমায় দেখে বলেছিল — এই লেড়কির টিকিট চাই।

বাবা হিন্দিতে বলছিলেন, এ লেড়কি নয়, মেমসাহেব লেড়কা। কালীঘাটে ওর চুল মানত আছে বলে বড় বড় করে চুল রেখেছে। তাছাড়া ওর মাত্র চারবছর বয়স। ছ'বছর না হলে টিকিট লাগে না।

কিন্তু চেকারের ধারণা আমার বয়স ছ'বছরের বেশি। প্রায় আধঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর বাবা ছাড়া পেয়েছিলেন।

এবার বাবা আমার টিকিট কেটেছিলেন। সুতরাং কোন গোলমাল হল না। ২৪ ঘণ্টা পরে আমরা বেনারস স্টেশনে নামলাম।

মায়ের রানীদি চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন— তোমরা প্রথমে আসিয়া আমাদের বাড়িতে উঠিতে পারো। পরে বাড়ি দেখিয়া লইবা। এখানে বাড়ি ভাড়া খুব বেশি। একটি এক কামরার ঘরের ভাড়া অন্তত দশটাকা। তাও সব সময় মেলে না। কাশী আর সে কাশী নাই। যুদ্ধের ফলে এখানেও সব জিনিষের খুশী মত দাম হাঁকিতেছে।

বাড়ির ঠিকানা ছিল। সেইমত টাঙাওয়ালাই হরিশ্চন্দ্রঘাট রোডের আউদর্বিতে বি ৫/৩১০ বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। বড় রাস্তা থেকে গলি ধরে কয়েকটি বাড়ি পরেই দোতলা বাড়ি। সামনে নাম লেখা — সি সি চ্যাটার্জি। অর্থাৎ চারু চন্দ্র চ্যাটার্জি। আমার মেশোমশাহ।

দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন মার রানীদি। লম্বায় প্রায় পাঁচফুট পাঁচ ইঞ্চি। ধবধবে ফর্সা চেহারা। মুখের গঠন একটু পুরুষালি। সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু হলে কী হবে, কথা বলেন আস্তে আস্তে। হয়তো সতীনের সঙ্গে ঘর করতে করতে কণ্ঠস্বর এমন ধীর হয়ে গেছে।

প্রণাম করতে গিয়ে মা কেঁদে ফেললেন।

রানীমাসী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, থাক থাক ফুটি। এই বুঝি তোর ছেলে—আর এই মেয়ে?

বাবা বললেন — প্রণাম করো, তোমাদের মাসীমা।

থাক থাক। ভেতরে এসো। কখন বেরিয়েছ?

বাবা বললেন, কাল সকালে। মোগলসরাইতে একটু খালি হল। সারা রাস্তা ভিড়ের চোটে সিট ছেড়ে উঠতে পারিনি।

খাওয়া-দাওয়া?

মা বললেন বাড়ি থেকে লুচি তরকারি করে এনেছিলাম। দুদিনের খাওয়া তাতেই হয়ে গেল। ট্রেনে খাবার পাওয়া যায় শুনেছি। কিন্তু আমার খেতে ঘেন্না করে।

রানীমাসী বললেন— তোমরা হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো। আমি তোমাদের চা জলখাবার করে আনছি। এই যে দিদি এসে গেছেন। দিদি আমার বোন আর ভগ্নিপতি।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, শ্যামলা রঙের এক জন বয়স্কা ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসেছেন। একটু গম্ভীর মুখ। রানী মাসীর পাশে তাকে নিষ্প্রভ দেখায়।

মা বললেন— উনি বড়দি তো? তারপর প্রণাম করলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, থাক থাক জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা। তোমরা সারাটা পথ এয়েছ। ধকল গেছে। বসে বিশ্রাম করো।

এই বলে তিনি আবার ভেতরে চলে গেলেন।

বাইরের ঘরে খাটের ওপর আমরা বসলাম। এই ঘরটার এক কোণে একটি জিনিস দেখে আমার খুব লোভ হল ঃ একটি গ্রামোফোন। তার ওপর অনেকগুলো বাক্স— বোধহয় রেকর্ডের। কলের গান আমি আগে দু-একটা জায়গায় শুনেছি। আমার কাছে অগাধ বিস্ময়। এই সেদিন পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম ওর ভেতরে কেউ একজন বসে গান গাইছে..... এখন জেনেছি না, ওটি মেশিনেই চলে।

একটু পরে লুচি আর পটল ভাজা নিয়ে রানী মাসীমা ঢুকলেন।

নাও তোমরা হাত মুখ ধুয়ে একটু খেয়ে নাও।

আমরা যখন খেতে শুরু করেছি এমন সময় চটি ফটফট করতে করতে এক দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকলেন। কুচকুচে কালো রঙ। মাথায় সামান্য চুল। পরনে শাদা ধুতি। গায়ে শাদা ফতুয়া।

আন্দাজে বুঝলাম। ইনিই সি সি চ্যাটার্জি ; মেসোমশাই। সারাজীবন রেলে স্টেশন মাস্টারের চাকরি করে রিটায়ার করেছেন। দুবার দুবার দার পরিগ্রহ করেও ছেলেমেয়ে হয়নি।

প্রথমা স্ত্রী সন্তান দিতে পারেননি। তাই তাঁর সম্মতি নিয়েই তিনি রানী মাসীমাকে বিবাহ করেন। জানাশোনা একজনের মাধ্যমে সম্বন্ধ এসেছিল। দাদামশাইরা গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার হলেও অজপাড়াগাঁয়ের কুলীন ব্রাহ্মণ মেয়ের পাত্র জোটা খুব মুশকিল ছিল। তাছাড়া বহুবিবাহ তখনও আইনসিদ্ধ। আমার আর এক মাসীমারও সতীন ছিল। তিনি মায়ের পিসতুতো বোন।

মা মেসোমশাইকে প্রণাম করলেন। ইঙ্গিত পেয়ে আমি ও আমার বোনও প্রণাম করলাম। মেসোমশাই বললেন, পথে কোন কষ্ট হয়নি তো। তোমরা বিশ্রাম করো। পরে কথা হবে। এই বলে তিনি যেমন এসেছিলেন তেমন চলে গেলেন।

আউদগর্বির মাসীমার বাড়িতে দুদিন কাটবার পর মাসীমা বললেন ঃ

তোরা কোথায় থাকবি কিছু ভেবেছিস?

মা বললেন, তুমি যা বলবে তাই করব দিদি। ওই তো অসুস্থ মানুষ। এই বিদেশ বিভূঁয়ে একা ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে ভয় করে।

মাসীমা বললেন, আমাদের একটি ঘর সবে খালি হয়েছে। সাত টাকা ভাড়া। তোমরা চাইলে কাল থেকে থাকতে পারো। আর রেশন কার্ড করিয়ে নাও। কনট্রোলে কম দামে গম চিনি সব্জ পাবে।

মা বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি রাজি। মাসীমাদের বাড়ির লাগোয়া আর একটি বাড়ি। দুই বাড়ির ভেতর দিয়ে উঠোনে যাওয়া যায়। ভাড়া বাড়িতে আরও তিন ঘর ভাড়াটে রয়েছে। একতলায় দুঘর। দোতলায় এক ঘর। ঘরটিতে আলো হাওয়া

ছিল। পায়খানা কমন।

আমরা নতুন ঘরে চলে এলাম। বাবার অত তাড়াতাড়ি আলাদা বাসা করে আসার উদ্দেশ্য ছিল না। ভেবেছিলেন আরও কিছুদিন ভায়রা ভাই-এর অতিথি হয়ে থাকবেন। কিন্তু ওরা সেটা বুঝতে পেরেই দুদিনের মধ্যে আমাদের ভাড়া বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। যদিও লাগোয়া বাড়ি বলে একমাত্র রাতে শোবার ও খাবার সময় ছাড়া আমি মাসীমাদের বাড়িতেই থাকতাম। মাসীমার বাড়িতে আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল গ্রামোফোন। কিন্তু ওই যন্ত্রটা বাজাবার কারও সময় নেই। কারও আগ্রহ নেই। অথচ যা পেলে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি সেই যন্ত্রটা কত অবহেলায় পড়ে পড়ে ধুলো জমছে।

মাসীমাদের পরিবারে তাঁর সতীনের মা ও আর এক বাল বিধবা বোন ওই বাড়িতে থাকতেন। বাল বিধবা মাস্তুদি শাদা থান পরে থাকতেন। তিনি ইস্কুলে যেতেন। তাঁকে সুর করে হিন্দি সাহিত্য পড়তে দেখতাম।

আমরা আসার কিছুদিন পরেই মার আর এক বোন কুন্দমাসীমা এলেন বেড়াতে। কত বছর পরে কুন্দ মাসীমার সঙ্গে দেখা মায়ের। বিয়ের পর আর দেখাই হয়নি। এখন কুন্দ মাসীমার বড় ছেলে শিবু বয়সে আমার চেয়ে দু বছরের ছোট। শিবুর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। সে বাংলার সঙ্গে হিন্দি মিশিয়ে কথা বলত।

আমি বললাম, তুমি কোথায় থাকো? সে বলল, সোনার পুরা মে— এখান থেকে থোড়িদূর ...

তোমাদের এখানে বুঝি বাংলা পড়তে হয় না?

শিবু বলল ঃ বাংলা ইস্কুল ভি হ্যায়। লেকিন আমি হিন্দি ইস্কুলে পড়ি।

কুন্দমাসীমা আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞসা করলেন — দিদি এই বুঝি তোমার বড় ছেলে?

মা বললেন, হ্যাঁ। এই ছেলে। আর ওই মেয়ে।

আমার বোনের তখন বছর ছয়েক বয়স। কুন্দমাসীমা আমাকে দেখে বললেন, শিবুর সঙ্গে দেখছি খুব মিল, দুজনেই রোগা।

মা বললেন, জন্মে পর্যন্ত ভোগে ছেলেটা। কতবার যে ম্যালেরিয়া থেকে উঠল। একে তো তোমার জামাইবাবু অসুস্থ লোক। তার ওপর এই ছেলে। তাই তোমার জামাইবাবু যখন বলল, কাশীতে চলো। আহার ওষুধ দুই হবে। চেঞ্জও হবে তীর্থ দর্শনও হবে। তখন আর আপত্তি করলাম না। তারপর মা একটু ভাবপ্রবণ হয়ে কুন্দ মাসীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোদের ভরসাতেই আসা কুন্দ। নয়তো আমার আর কে আছে বল।

কুন্দমাসীমা মায়ের কথায় তেমন উৎসাহ দেখালেন না। শুধু বললেন, আজ চলি দিদি। একদিন সময় করে যেও। শিবুকে পাঠিয়ে দেব, ও এসে নিয়ে যাবে।

কুন্দমাসীমাদের বাড়ি এরপর অনেকবার গিয়েছি। আউদগার্বি থেকে হাঁটাপথ। সোনারপুর কালীবাড়ির ঠিক পিছনে গলির মধ্যে পুরনো বাড়ি। মেসোমশাইদের একান্নবর্তী পরিবার। মেসোমশাই শুনতাম একজন রাজনৈতিক নেতা। খদ্দর পরেন।

মাইকে বক্তৃতা করেন। বাড়ি ভাড়ার আয় আছে। বেশ কিছু রিকশ আছে। সেই আয় থেকে সংসার চলে।

আমাদের বাড়ির অন্য ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের ঠিক দোতলার ওপর এক ভাড়াটিয়া পরিবার থাকত। ভদ্রমহিলার অনেকগুলো বাচ্চা। তারা আমার খেলার সাথী। ভদ্রলোক থাকতেন বাইরে। সপ্তাহে অন্তত দু-তিনটে চিঠি পাঠাতেন বউকে।

পিওন এসে চিঠি দিত, সরস্বতী বালা সরকার, চিঠি আছে।

ওই পিওনের ঘন ঘন ঘোষণাতেই তাঁর নামটা মনে গেঁথে গিয়েছিল। আজও ভুলিনি নামটা।

বাবা পিওনকে বলতেন, হামারা কই চিঠি হ্যায় বাবা। সঞ্জীব বিহারী চট্টোপাধ্যায়। পিওন বলত, নাহি বাবুজি।

বাবা নিরাশ হয়ে মাকে বলতেন। আজ মাসের পনের তারিখ হয়ে গেল বিমল তো এখনও টাকা পাঠাল না।

বিমলদার টাকার ওপর ভরসা করে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় বাবা কাশী এসেছিলেন। বিমলদার টাকা আসত, কিন্তু দেরী হত। বাবা বসে বসে চিঠি লিখতেন। 'বাবা বিমল, এ মাসে এখনও তোমার টাকা না পাইয়া বড় চিন্তায় আছি। তুমি আমার সন্তানতুল্য। বাবা বিশ্বনাথের কাছে তোমার জন্য রোজই প্রার্থনা করি। এই অসহায় মাতুলকে তুমি না দেখিলে আর কেই বা আমার আছে....।

কাশীতে এসে একা একা বার হবার আমার হুকুম ছিল না। তাও আমি কাছাকাছি হরিশ্চন্দ্র ঘাটে গিয়ে বসতাম। হরিশ্চন্দ্র ঘাটে সব সময়ই মড়া আসত। ডোমেরা কাঠ এনে চিতা সাজাতো। একদিন মৃত্যু সম্পর্কে যে রহস্য ছিল আজ তা কেটে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল মৃত্যু কত সহজ ঘটনা। মানুষের মৃত্যু হলে মৃতদেহটি কোনরকমে শ্মশানে এনে ফেলতে পারলেই বাহকদের দায়িত্ব শেষ। এবার ডোমেরাই তার চিতার আগুন জ্বালাবে। গনগনে আগুনে সমস্ত মৃতদেহই ভস্ম হয়ে যাবে। তারপর থাকবে শুধু ছাই—যার কোন নাম নেই পরিচয় নেই। সমস্ত মানুষটা মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় চলে আসে। তারপর হাতটা উপুড় করে ওই বেগবতী খরস্রোতা গঙ্গার জলে ফেলে দাও—নিমেষের মধ্যে শেষ চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে সব মানুষই এমন কালস্রোতে বিলীন হয়ে যায়।

মায়ের সঙ্গে রোজ গঙ্গাস্নানে যেতাম। শিবময় কাশী। যত্র তত্র অসংখ্য শিব-লিঙ্গ। আর এমনই নাকি দৈবাদেশ যে কাশীতে কোন শিবলিঙ্গ অপূজিত থাকবে না। কেউ না কেউ এসে তাকে ফুল বেলপাতা ও বাতাসা দিয়ে যাবেই। মায়ের সঙ্গে ফিরতাম প্রতিটি পথের শিবের মাথায় জল দিতে দিতে। দেখতাম, প্রতিটি শিবলিঙ্গেই কেউ না কেউ ফুল দিয়ে গেছে।

কেদার ঘাটে গিয়ে বিকেলে বসতাম। পাঠ হত। কীর্তন হত। সন্ধ্যায় ডম্বরু বাজিয়ে আরতি হত।

সেবার বর্ষাকলে বানের জল আউদগার্বি পর্যন্ত ঢুকে গেল। জলে পা দিয়ে তবে কেদারের গলিতে পড়তে হয়। কেদারের ঘাটের অর্ধেকের বেশি সিঁড়ি ডুবে গেছে। প্রচণ্ড স্রোত গঙ্গায়। আর কি তার গর্জন মনে হচ্ছে কিছু একটা পেলে আজগরের মত তাকে শত পাকে জড়িয়ে ধরবে।

এর মাঝে শুনলাম কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লেগে গেছে। কাশীতে সেই দাঙ্গার ঢেউ যে কোনদিন এসে পৌঁছতে পারে। এদিকে বাবার মানি অর্ডার আসাও বন্ধ হয়ে গেল। মাকে বাবা প্রায়ই বলতেন ঃ কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে, দিদিরা কেমন আছে কে জানে। ভাবছি এবার ফিরে যাবো।

ঃ এর মধ্যেই ফিরে যাবে? তোমার শরীর তো সারল না।

ঃ না সারুক। বিশ্বনাথের ইচ্ছা নয় আমি এখানে থাকি। নয়তো থেকে যেতাম। কেদারের গলিতে একটা দোকানঘর খালি ছিল। একটা ফলের দোকান দিলে ভাল চলত। তা একটা দোকান দিতে গেলে ভাড়া পুঁজি মিলিয়ে অন্তত পাঁচশ টাকা চাই। ইয়ে তোমার গহনা কিছু আছে নাকি? যদি একটা কিছু দিতে তাহলে তা দিয়ে কিছুদিন চালিয়ে দিতাম।

মা বললেন, গহনা? আমার কোন গহনা কি তুমি রেখেছ? যে কটা ছিল মেয়ের টাইফয়েডের সময় সেটাও গিয়েছে।

ঃ কী করবো বলো। একটা পয়সা ছিল না হাতে। আমার অসুখেব পরেই মেয়ে টাইফয়েডে পড়ল। ফনী ডাক্তার একটা পয়সাও ভিজিট নেয়নি। কিন্তু নগদ টাকা ছাড়া ওষুধ তো কেউ দেবে না। মেয়েকে তো বাঁচাতে হবে।

একটু একটু করে খাবারের মেনু কমতে লাগল। কাশীতে বাড়ি বসে বাজার পাওয়া যায়। ভোরবেলা ফিরি করতে আসত রসগোল্লার মত গোলা পাকানো মাখন। এক একটা গোলার দাম দু পয়সা, আমার খুব লোভ হতে খেতে। কিন্তু বাবা বলতেন, ও সব খেলে অসুখ করে।

বর্ষাকালে প্রচুর ইলিশ মাছ আসত। মাছ তখনও ওজনে বিক্রি হত না। এক কেজির একটা ইলিশের দাম আট আনা। বেগুনের সের দু পয়সা। ঁ্যাটো সামান্য বেশি। কেদারের গলিতে বড় বড় চমচম বিক্রি হত এক একটা চার আনা। চার আনা দিলে ভাঁড়ে করে একশ গ্রামের মত রাবড়ি পাওয়া যেত।

কিন্তু আমাদের কাছে তখন জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে। গোবরডাঙ্গা থেকে কাশীতে এসেও অভাব আমাদের পিছু ছাড়ল না।

এর মাঝে মন্দিরে মন্দিরে ঘোরা আর বিভিন্ন শিবের মাথায় জল আর বিল্বপত্র দেওয়া মা ও আমার নিত্যকর্মের অঙ্গ গিয়েছিল।

একদিন অন্নপূর্ণার মন্দিরে ঢুকে দেখলাম খালি গায়ে এক দীর্ঘদেহী লোক যাত্রীদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে। তাঁর কাঁধে একটি শিশু।

আমি দূর থেকে চিনতে পারলাম। মা, দেবু মেসোমশাই না?

দেবু মেসোমশাই মানে বুড়িদির স্বামী। মায়ের আর এক কাজিন বোন। যাঁরা

আমাদেরই মত কপর্দকশূন্য অবস্থায় কাশীতে এসেছে। এসেছে আমাদেরও আগে। আমরা এসেছি শুনে বুড়ি মাসী আর দেবু মেসো দেখা করতে এসেছিলেন। ওদের একটি ফুটফুটে ছেলে ছিল বছর পাঁচেক বয়স।

বুড়ি মাসীমার অবস্থা যে ভাল নয় তা তার ছিন্ন পোশাক দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাঁদের জীবিকা কী তাঁরা বলেননি। সেদিনই বুঝতে পারলাম। কীভাবে তাদের সংসার চলে.....।

আমি চেঁচিয়ে ডাকতে গেলাম, মেসোমশাই। মা আমাকে বাধা দিলেন। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে সেখান থেকে বেরিয়ে বিশ্বনাথের গলি দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। মেসো হয়তো আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। দ্রুতগতিতে তিনিও মিলিয়ে গেলেন মন্দিরের পিছনে।

সারা রাস্তা কোন কথা বললেন না মা। বাড়ি ফিরে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?

মা বললেন, চল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা গোবরডাঙ্গা ফিরে যাই।

ঃ এই তো তোমারই ফেরার আপত্তি ছিল। মাত্র চারমাস আমরা এসেছি।

মা বললেন, তখন বলেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই ভাবে চলতে পারে না। এই চার মাসে দিদিদের আমরা এক পয়সা বাড়ি ভাড়া দিতে পারিনি। সে কথা দিদি কথায় কথায় শুনিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েদের একফোঁটা দুধ খাওয়াতে পারিনি। দেশে থাকলে প্রজাদের খাজনা থেকে কিছু না কিছু আয় হত।

বাবা বললেন ঃ এই দাঙ্গার মধ্যে কোথায় যাবো বল? কাগজে দেখলাম বিহারেও দাঙ্গা হচ্ছে। তবে গান্ধীজি অনশন করেছেন, মনে হয় দাঙ্গা এবার থামবে। আর একটু ধৈর্য ধরো। কাশীতে কেউ অন্নাভাবে থাকে না। খাওয়ার যদি তেমন কষ্ট হয়, যে কোন একটা ছত্তরে চলে যাবো দুপুর বেলা—ওখানে বিনা পয়সায় খেতে দেয়। বিদেশে কে দেখছে!

মা বললেন, না হ্যা না — সে হয় না।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় না। অ-ঘটন ঘটন পটীয়সী সব কিছু ওলোট পালোট করে দেন। সমস্ত হিসাব গোলমাল হয়ে যায়।

দুদিন পরেই এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এসে হাজির হলেন আমাদের বাসায়।

ধবধবে ফর্সা রঙ। উচ্চতায় পাঁচফুটের মত। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে শাদা থান।

এখানে কী সঞ্জীব বলে কেউ থাকে?

বাবা বেরিয়ে এলেন। আপনি?

তুমিই সঞ্জীব? আমি তোমার বউদি লীলা। তোমার বড়দার বউ।

বাবা চিনতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন ঃ আপনি বড় বউদি। আপনার কথা কত শুনেছি সেজদির মুখে। কিন্তু কখনও তো দেখাশোনা হয়নি।

ঃ তোমার দাদার সঙ্গে বিয়ের পর মাত্র কয়েকমাস কলকাতায় থেকেছি। তারপরেই তিনি আমায় ত্যাগ করেন। আমি সেই থেকে কাশীতে আমার ভাইয়ের বাড়িতে আছি। এখানে থেকেই একদিন তোমার দাদার মৃত্যুর খবর এল। আমি এই কাশীর ঘাটেই হাতের শাঁখা ভেঙে বিধবার পোশাক পরলাম। স্বামীর ঘর করা বাবা বিশ্বনাথ আমার কপালে লেখননি। কিন্তু তাঁর চরণে ঠাঁই দিয়েছেন। এটাই আমার ভাগ্য। তোমাদের কত কথা শুনেছি। মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল যদি তোমাদের একবার দেখতে পাবি। এই বুঝি তোমার ছেলে-মেয়ে? কাছে এস বাবা।

ঃ কী নাম তোমার?

আমি প্রণাম করে বললাম ঃ পার্থ।

বাঃ বেশ সুন্দর নাম। তোমাকে ছুঁয়ে আমাব দেহটা পবিত্র হয়ে উঠল বাবা। আমার শ্বশুরের রক্ত তোমার দেহে। তোমায় কোনদিন দেখব বলে ভাবিনি।

বাবা বললেন ঃ আমবা যে এখানে তা কী ভাবে জানলেন বৌদি।

জেঠিমা বললেন ঃ তোমার সেজদি আভা মাঝে মাঝে কাশী আসেন। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, সঞ্জীব এখন কাশীতে। বেচারার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তার ওপর নানা অসুখ বিসুখ। তার ছেলেটি যদি ওখানে পূজা আর্চা শিখে নেয়। তাহলে যজমানি করে তাদের ভাল আয় হতে পারে।

বাবা বললেন — আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল বউদি। আর কিছুদিন পরে হলে আমাদের পেতেন না। আমবা তো ফিরে যাচ্ছি .....

জেঠিমা বললেন — তোমাদের ফেরা হবে না। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

ঃ কোথায়?

হাউস কোজিতে। গোধূলিয়ার কাছেই দাদার বাড়ি। দাদা গত হয়েছেন। আমি আর দাদার এক বিধবা শালী ও তার এক ছেলে নীলু এই তিনজন আমবা থাকি। একতলাটা খালি পড়েই থাকে। তোমরা সেখানে থাকবে। তোমার ছেলের ক'বছর বয়স?

মা বললেন— আট বছর চলছে ....

ওর পৈতে হয়েছে?

ওর কি পৈতের বয়স হয়েছে দিদি।

তোমার ছেলে পৈতে দেবো আমি। এই তো পৈতের উপযুক্ত বয়স। আট গিয়ে নয়ে পড়লেই পৈতে দেবে।

পৈতে? আমি মনে মনে ভাবলাম তবে কি আমায় সত্যি সত্যি পুরোহিত বানাতে চান এই মহিলা? যদিও কাশীর ধর্মীয় পরিবেশে ঠাকুর দেবতার প্রতি আমি আসক্ত হয়ে পড়েছি। শিবের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে, মায়ের সঙ্গে স্তোত্র মুখস্ত করতে করতে আমিও অনুরক্ত হয়ে পড়েছি ঈশ্বরের ওপর। বিশ্বাস করেছি পুরাণের গল্পে, ধর্মীয় উপকথায়। দেবতাদের গ্রহণ করেছি রক্তমাংসের মানুষ বলে, যদিও তাঁরা অন্য গ্রহের অধিবাসী। কিন্তু এই বারাণসীতে তাঁরা প্রায়ই নেমে আসেন মানুষের রূপ ধরে।

রাতে গভীর ঘুমের মধ্যে আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি দেবাদিদেব মহাদেব জটাজুট ধারী, বাঘের ছাল পরনে, গলায় জীবন্ত সাপ ঝুলিয়ে ডম্বরু বাজাতে বাজাতে কেদারের মন্দির থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছেন। কিন্তু কখনও ভাবিনি, আমি পড়াশোনা ছেড়ে পুরোহিতের বৃত্তিকেই গ্রহণ করবো।

বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে হাউসকোজিতে জেঠিমার বাড়িতে যাবো।

তারপর যদি জেঠাইমা আমার উপনয়ন দেন তাঁদের আপত্তি নেই।

হাউজ কোজির ওই বাড়িটা ছিল দোতলা। কাশীর টিপিক্যাল বাড়ি যেমন হয়। নিচের ঘরগুলি ঘোর অন্ধকার। বর্গাকারে ঘোরানো বাড়ির মাঝখানটা ফাঁকা। সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়। চুঁয়ে চুঁয়ে আলো এসে পড়ে। বানরের উৎপাতে ওপরটা জালে ঢাকা।

নিচের অন্ধকার ঘরে আমাদের নতুন সংসার পাতা হল। বাবা নিশ্চিন্ত হলেন সাময়িকভাবে। এখানে এসে আপাতত দৈনন্দিন খাওয়ার চিন্তা মিটল। জেঠাইমা বললেন, যতদিন না বাবার কিছু একটা সংস্থান হয় ততদিন আমরা জেঠাইমার সঙ্গে খাবো।

এখানে এসে রুটি খেতে হত বলে আমি খুব আমি খুব অসুবিধা বোধ করতাম। আমরা ছোটবেলায় কদাচিৎ রুটি খেতাম। দুর্ভিক্ষের সময়ও দুবেলা ভাত খেয়েছি। মন্বন্তরের সময় চালের মণ চড়েছিল চল্লিশ টাকা। অর্থাৎ এক সের এক টাকা এক সের মানে এক কিলোগ্রামের সামান্য কিছু কম। মাংসের দাম হয়েছিল আড়াই টাকা কেজি। এক পয়সায় যে মাছ পাওয়া যেত তা চার পয়সা হয়ে গিয়েছিল।

হাউস কোজিতে চলে এলেও মাসীমার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায়নি। আমি মাঝে মাঝে দুপুরে মেসোর কাছে অঙ্ক কষতে যেতাম। তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে গড়গড়া টানতেন। দু কউ তাঁর খিদমৎ খাটত। কেউ টিকে ধরিয়ে দিত। কেউ পানের বাটা ভরে আনত। আবার কেউ চা করে আনত।

আমি মেঝেয় বসে বসে অঙ্ক কষতাম। কোন অঙ্কই আমি মেলাতে পারতাম না। মেসোমশাই রাগ করতেন না। বলতেন — তোকে দিয়ে অঙ্ক হবে না। তোর মাথায় কিস্যু নেই। বড় চাকরিবাকরি পেতে গেলে ভাল অঙ্ক কষতে জানতে হয়।

মনে মনে ভাবলাম, বয়ে গেছে আমার চাকরি করতে। আমার ভবিষ্যৎ তো ঠিকই হয়ে গেছে। আমি পুজো আর্চা শিখব। জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষপশুদ্ধির সব মন্ত্র শিখে গেছি। পঞ্চদেবতার পুজোও করতে পারি। শুধু উপনয়নটাই যা বাকী।

হাউজ কোজিতে এসে আমার স্বাধীনতা আরও বেড়ে গেল। দাঙ্গাও থেমে গেছে বলে শুনেছি। এখান থেকে গোধূলিয়া ও চকবাজার কাছে।

ওদিকে দশাশ্বমেধ ঘাটও কাছে। খুব ইচ্ছা ছিল নৌকায় করে রামনগরের রাজার বাড়ি দেখে আসব। মাসীমার বাড়ি থাকার সময় সে আশও মিটেছে। মাসীমার সতীনের

আত্মীয় চার বন্ধু এসেছিল কাশী বেড়াতে, তারা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে এনেছেন ব্যাসকাশী, বেনীমাধবের ধ্বজা। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয় নিয়োগী। চন্দননগরে বাড়ি। তাঁকে আমি কয়েকবার চিঠিও দিয়েছিলাম।

আমি হেঁটে হেঁটেই ঘুরতাম সারা রাস্তা। তখন কাশী এক্কা আর টাঙ্গায় ভর্তি ছিল। বাঙালিটোলা তখন জমজমাট। পুজোর সময় দারুণ পুজো হত বাঙালিটোলা ইস্কুলের মাঠে। বিজয়াদশমীর দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত। বিরাট বিরাট মিছিল করে প্রতিমা আনত। সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মিছিলের। গৈরিক পরা বাংলা বলা সন্ন্যাসীরা লাঠি ও তলোয়ার হাতে আগে আগে যেতেন। প্রতিমার সঙ্গে মিছিলের আগে থাকত এক সন্ন্যাসীর বিরাট কাট আউট। শুনেছিলাম, ওই ছবি স্বামী প্রণবানন্দজীর।

কাশীতে বারোমাসে তেরো পার্বণ আমার লেগেই থাকত। দুর্গাপুজার পর দেওয়ালি। সে এক দেখার মত উৎসব। সমস্ত বাড়ি আলোয় আলো হয়ে যেত। সেই সঙ্গে ফুটত নানা ধরনের বাজি।

দেওয়ালির পরে অন্নকূট। অন্নপূর্ণার মন্দিরে সেদিন তিল ধারণের জায়গা নেই। বিশ্বনাথের গলিতে লোক উপচে পড়ছে। অন্নপূর্ণার মন্দিরে ভাতের পাহাড় তৈরি করা হয়েছে। অন্নপূর্ণার কাশী অন্নেপূর্ণ। কেউ এখানে অভুক্ত থাকে না। স্বয়ং শিবও অন্নপূর্ণার কাছে অন্নপ্রার্থী। তাঁর ভিক্ষাপাত্রও পূর্ণ করে দিয়েছেন অন্নপূর্ণা।

বারো মাসে তেরো পার্বণ আর অসংখ্য পুণ্য তিথি লেগেই আছে কাশীতে। গঙ্গার ঘাট তখন লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার ভিখারি বসে গেছে রাস্তার দুপাশে।

বেনারসের একটি সিনেমা হল ছিল বিশ্বনাথ টকিজ। সেখানে শুধু বাংলা ছবি আসত। বেনারসে থাকাকালে আমি শুধু একবারই সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আউদগর্বি ে থাকি। মাসীমার সতীনের আত্মীয়রা এসেছিলেন। তাঁরা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই হলে তখন দেখান হচ্ছিল মাটির ঘর। ছবিটি বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা ওই নাটকটিও খুব নাম করেছিল। আমি এই দ্বিতীয়বার সিনেমা দেখলাম।

হাউজ কোজিতে এসে আমি আরও বেশি করে ঘুরে বেড়া'ত লাগলাম। আউদগর্বি ছিল শহরের একপ্রান্তে। কিন্তু হাউজকোজি শহরের মাঝখানে। আমি সময় ও সুযোগ পেলেই একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কয়েক মাস পরেই আমার উপনয়নের সমস্ত তোড়জোড় হতে লাগল। বাবা আমাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে অগ্রিম নিমন্ত্রণপত্র লিখে পাঠাতে শুরু করলেন, যদি কেউ উপনয়নের ব্রত ভিক্ষা হিসাবে কিছু অর্থসাহায্য করে।

দু-এক জায়গা থেকে কিছু মানি অর্ডার এল। অনেকেই চিঠির জবাব দিলেন না। তারপর রীতিমত সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে আমার উপনয়ন হল। আচার্য হবার জন্য মনোনীত করা হল দেবু মেসোকে। শুনেছিলাম কর্ণভেদের সময় প্রচণ্ড লাগে। এই একটি ব্যাপারে আমার খুব আশং ; ছিল। দুটি কানের লতি ভেদ করে রুপোর

দুটি কাঁটা আমার কানে বিঁধিয়ে দিতেই যন্ত্রণায় আমার চোখে জল এসে গেল। নিয়ম অনুসারে আমারও নাপিতকে কলা ছুঁড়ে মারার অধিকার আছে। যদিও মেয়েরা মজা দেখার জন্য আমাকে উত্তেজিত করতে লাগল। মার মার, কিন্তু আমি জোরে কলাটা ছুঁড়তে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছাদের দেওয়ালে গিয়ে লাগল।

শাস্ত্র অনুসারে আমাকে গৈরিক বেশ পরে মাথা ঢেকে তিনদিন অন্তরালে বাস করার কথা। কিন্তু নববিধান অনুসারে সেদিনই গোধূলি লগ্নে দণ্ডী ভাসানোর জন্য রিকশয় করে আমাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে যাওয়া হল।

তখন গঙ্গার জল সূর্যাস্তের আলোয় রক্তরাঙা। ঘাটের সব আলো জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে। পাখিদের ডানার ঝটপটানি থেমে গেছে। শুধু বিভিন্ন মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি এসে কানে বাজছে।

হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে নিঃস্ব বিত্ত মেসোমশাই। আচার্যের সগৌরব আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত। আমায় বললেন ঃ বল ওঁ ভূ ভূর্বস্ব তৎসবিতু বরেণ্যং....

গায়ত্রী মন্ত্রে সেই সবে দীক্ষা। তার অর্থ আমার কাছে তখনও অজ্ঞাত। কিন্তু সেই অজ্ঞেয় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আমার মনে হল, এই নিখিল বিশ্ব চরাচরে নিস্তব্ধ গোধূলির বিষাদ রাগিণীর মাঝে কে যেন আমাকে বলছে, তুমি একা নও, নিঃসঙ্গ নও। তুমি এই প্রকৃতিরই অতি আপনজন। সন্ধ্যারাগে ঝিলমিল গঙ্গার স্রোতের মধ্যে আমি চিরন্তন জীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব করলাম। মনে হল, এ পৃথিবীতে কেউ একা নয়। যদি সে কোনদিন প্রবহমান স্রোতস্বিনীর খরস্রোতের ভাষা বুঝতে পারে তা হলে সে বুঝতে পারবে সে স্রোত সতত মানুষকে বলছে ঃ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। দেখো, আমি কোথাও থেমে নেই।

সেই খরস্রোতের ধারায় আমার গলার দণ্ডী খুলে ভাসিয়ে দিলাম। অভ্যাসমত প্রণাম করলাম দেবতাকে। আমার জীবন দেবতাকেও।

আমার উপনয়নের কিছুদিন পরেই বাবা অসুস্থ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালে ভর্তি হলেন। দিন পনের কাটবার পর বাড়ি ফিরে প্রায় এক সপ্তাহ থাকার আবার অসুখটা দেখা দিল। এঁটা তার পুরনো রোগ ব্যাচেলর ডিসেনট্রি।

আমি রোজ বিকেলে তাঁর জন্য হালকা পথ্য নিয়ে যেতাম। হাসপাতালের চিকিৎসা ফ্রি ছিল। হাসপাতালটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভেতরে ঢুকলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। দুপাশে কত ফুলের গাছ। সুন্দর লন।

শেষের দিকে ডাক্তার বললেন, এখানকার জলহাওয়া আপনাকে সুট করছে না মশায়। আপনি দেশে ফিরে যান।

জেঠাইমা শুনে বললেন, আমি জানতাম সঞ্জীব, আমার ভাগ্যে যেমন স্বামীর ঘর করাও ছিল না তেমনি শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে নিয়ে ঘর করাও ভাগ্যে নেই। ডাক্তার যখন বলেছে, তখন তোমায় ফিরে যেতেই হবে। তবে এই হতভাগিনী বউদিকে মনে রেখো।

বাবা বললেন, একী বলছেন বউদি। আপনি আমার মাতৃসমা। বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স পাঁচ। আমার ভাল করে সব মনে নেই। আমার বড়মার দুই ছেলে ছিল। তাঁর বড় ছেলে মানে আমার বড়দাকে আমি কখনও দেখিনি। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার আগেই তিনি কলকাতায় ওকালতি পড়তে চলে যান। তারপর সেখানেই থেকে যান। প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন।

জেঠিমা বললেন সে স্ত্রীকেও তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তারপর তৃতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের হয়নি। ওকালতিতে বহু টাকা উপার্জন করেও তিনি শান্তি পাননি। নেশা করে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুর আগে একবার কাশীতে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। আমায় তিনি বলেছিলেন, লীলা পার তো আমায় ক্ষমা কোর। সারা জীবন আমি সুখের সন্ধান করে ফিরেছি। কিন্তু সুখ আমার সন্ধান করেনি। আমার জীবনের কথা এই ছোট্ট বইতে লিখে রেখেছি লীলা। এই বই-এর একটা কপি তোমায় দিয়ে গেলাম।

জেঠিমা বাবাকে মিনি সাইজের ছোট্ট বই দেখিয়েছিলেন। বই-এর শিরোনাম 'আমার জীবন।' লেখক ঃ বিজয় চট্টোপাধ্যায়।

ওই বইটি আমার পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা আমাকে পড়তে দেননি। কপিটি জেঠিমাকে ফেরত দিতে হয়েছিল।

আমার জানার খুব আগ্রহ হত, কী দুঃখ ছিল জেঠামশাইয়ের? বাবার দুঃখ আমি বুঝতাম। ছোটবেলায় বাবা মা মারা যাওয়ায় অনাদরে অবহেলায় মানুষ হয়েছেন। তাঁর যখন জন্ম তখন ঠাকুর্দার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। এর আগে তিনি বারোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন দুই স্ত্রীর গর্ভে। শেষ জীবনের ফসল সুস্থ স্বাভাবিক হতে নাও পারে। গাছ যখন প্রাচীন হয়ে যায় তখন তার ফসলও ছোট হতে থাকে।

বাবার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। মস্তিষ্কও পরিণত ছিল না। যার জন্য অপরিণামদর্শিতা তাঁকে পদে পদে তার অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, দারিদ্র্যমোচন কিন্তু তা কোন পথে সম্ভব তা তার জানা ছিল না।

কিন্তু বড় জেঠামশাই তো উচ্চশিক্ষিত। আজ থেকে এক শ বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। সম্ভবত ১৯২৫ সালের মধ্যে তিনি ওকালতি পাশ করে পসার জমিয়েছিলেন। টাকার তাঁর অভাব ছিল না। তবে তাঁর কীসের অভাব?

মায়ের কাছে জেঠিমা বলতেন, বিয়ে করার পর বউ পছন্দ হয়নি স্বামীর। বউ নাকি পুরুষালি গড়নের। চেহারার মধ্যে বাঙালিসুলভ কমনীয়তা নেই। হিন্দুস্থানি দেশে মানুষ হয়েছে বলে কথার মধ্যেও হিন্দির টান। না, এ বউ তাঁর মনের মত নয়। তাই পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছিলেন তাঁকে।

এক একটা সময় মনে হয় আমাদের বংশের লিখনই বুঝি এই। সব কিছু বা অনেক কিছু পেয়েও অনেক কিছু অতৃপ্ত থেকে যাবে জীবনে। অথবা কোন ফুল বিকশিত হতে না হতেই ঝরে যাবে। বাবার আর দুই দাদা মারা গিয়েছিলেন অকালে। একজন দেশলাই জ্বালতে গিয়ে আগুনে পুড়ে। আর একজন বাবার সহোদর দাদা মাত্র কুড়ি

একুশ বছর বয়সে টিবি হয়ে।

তাঁর নাম ছিল জীবন। আমার ছোট পিসীমা আমাকে দেখে বলতেন, জীবনের গুণ তুমি পেয়েছ বাবা। জীবন ওই বয়সে গান লিখত। আর তোমার চেহারার সঙ্গে জীবনের মিল।

জীবন জেঠামশাইয়ের একটি নোট বই আমি দেখেছিলাম। কিছু গান তাঁর স্বরচিত। আর বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত নোট বুকে টোকা। তাঁর হাতে লেখাও ছিল সুন্দর। সে হাতের লেখা আমি পাইনি। তবে আমার লেখার নেশা, আমার সাহিত্যপ্রীতি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে জীবনের ধ্রুবতারা করার প্রেরণা আমার সহজাত। আমার জেঠামশাইদের মধ্যে যা ছিল সুপ্ত আমার মধ্যে তা প্রকাশিত। ওই উত্তরাধিকারই আমার শক্তি। তা না হলে আমার কোন প্রেরণা নেই। গুরু নেই, প্রকাশকের তাগিদ নেই। বন্ধু ও হিতৈষীর পৃষ্ঠপোষকতা নেই। বৃন্তহীন পুষ্পের মত আমি আপনাকে আপনি বিকশিত।

আমার লেখা নিয়ে সহপাঠীরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। আমাকে ঠাট্টা করে তারা ডাকত কবি বলে। সম্পাদক-প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরেছি সারা জীবন। অনেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকে ঠকিয়েছে। আবার কেউ কেউ প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে কড়ায় গণ্ডায়।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমি কলম থামাইনি। কারণ কলমই যে আমার একমাত্র অস্ত্র। আর লেখাই আমার উত্তরাধিকার।

আমার স্ত্রী কতবার বলেছে, কেন লিখছ? সরা জীবন ধরে লিখে না পেলে খ্যাতি, না পেলে অর্থ। তোমার যদি প্রতিভা থাকত তাহলে কী এতদিনে সমাদর পেতে না? তুমি যে অতি সাধারণ তা তুমি বুঝতে চাও না।

আমি কোন জবাব দিইনি। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত অতি সাধারণ ভাবে ছাপা পকেট সাইজের একটি ছোট্ট বই ; 'আমার জীবন'।

কী ছিল সেই জীবনে? বইটি আমার পড়া হয়নি। কিন্তু আমি তো লিখতে পারি আর একটি বই আমার জীবন। জীবন কী? স্বপ্ন কী? কেন মানুষ সুখের পিছনে দৌড়য়? যেখানে সুখ মানুষের পিছনে দৌড়ায় না।

॥ আট ॥

স্বাধীনতার সূর্যোদয়

কাশী থেকে আমরা ফিরলাম ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে। ইস্কুলে নতুন সেসন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবু কী ভাগ্যি ক্লাশ ফোরেই ভর্তি হতে পারলাম। আর সেই বছরই ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতার পুরো অর্থ তখনও বুঝতাম না। শুধু মনে হয়েছিল, একটা বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আনন্দের আতিশয্যে এমনই আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম মনে হত যেন পনেরই আগস্ট দিনটিতে যে সূর্য উঠবে তা অন্যদিনের মত হবে না। তা হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের একটা কিছু। সেদিন সারা আকাশ জুড়ে যেন

দিনের আলোর গভীর থেকে বেরিয়ে আসবে রাতের তারারা।

১৪ আগস্ট রাতে উত্তেজনায় আমার ঘুম হল না। খুব ভোরে প্রভাত ফেরী। মাথায় পরার জন্য একটি ক্যাপ কিনেছি। প্রভাত ফেরির গানও মুখস্ত করেছি ঃ প্রাচীন ভারতে জাগে নবীন—পনেরই আগস্ট পুণ্য দিন.....

শুনেছিলাম ১৪ আগস্ট রাত বারোটার সময়ই নাকি ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যাবে। দিল্লীর লাল কেল্লার বুকে পতাকা তুলে বক্তৃতা দেবেন জওহরলাল নেহরু। তিনিই হবেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আমাদের গ্রামে তখন কারও বাড়ি রেডিও ছিল না। কাজেই তাঁর বক্তৃতা শোনা সম্ভব হয়নি। এমনকী তারও অনেক পরে ১৯৫৩ সালে মাত্র দু-একটি বাড়িতে রেডিও এসেছে। আমার জীবনে প্রথম মহালয়ার অনুষ্ঠান শুনতে শেষ রাতে গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

স্বাধীনতা দিবসে প্রভাত ফেরির পর আমরা ইস্কুলে জমায়েত হলাম। সেখানে হেডমস্টার মশাই পতাকা তুললেন। তাঁর বরিশালের উচারণে বললেন — অনেক শহীদের রক্তে এই স্বাধীনতা আইছে। এখন এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদিগের। তোমাদের মধ্য থিকাই ভবিষ্যতের দ্যাশ ন্যাতারা আইব। তার জন্য এখন থিকা প্রস্তুতি চাই।

এরপর মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হল প্রত্যেককে। জিলাপি আর ছানার গজা। স্বাধীনতার ওই নগদ প্রাপ্তিতে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দিক থেকেও কিছু করার ছিল। সেটি করা হল। বুদ্ধিটা দিল আমাদের নেতা দুর্গাশঙ্কর। সে বলল—তোরা সবাই চার আনা করে চাঁদা দে। আমরা বোমা ফাটাবো।

আমাদের গ্রামের পোটো পাড়ায় পোটোরা বোমা তৈরি করত। সেই প্রথম বোমা কাকে বলে দেখলাম। একটি টেনিস বলের মত বস্তু। পাটের সুতো জড়ানো। ভেতরে মশলা পোরা। এমন বোমা নাকি বিপ্লবীরা বানাতেন। তবে তা আরও বিধ্বংসী। আমাদের বোমা ছিল শুধু শব্দ উৎপাদন করার জন্য।

শোভাযাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর সে বোমা ফাটানো হল। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। মনে হল স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের এবার ষোলকলা পূর্ণ হল।

স্বাধীনতা আর আমার ভাই তারাপ্রসন্নর জন্ম একই বছরে। এতদিন ছিলাম এক ভাই এক বোন। এবার হলাম দুভাই এক বোন।

আমার ভাই-এর জন্ম হয় ইছাপুর গ্রামে। আমার সেজপিসীমার বাড়িতে। আমার এই সেজপিসীমার শ্বশুর বাড়ি ছিল গোবরডাঙ্গা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইছাপুর গ্রামে। গোবরডাঙ্গা তখন জঙ্গলে ভর্তি। জঙ্গল মানে দুপাশে বড় বড় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বাগান। আর নিচে ঝোপঝাড়। আশ, শেওড়া, কালুকাসুন্দি, বোঁচ, বাবলা, বাসক গাছ।

মিউনিসিপ্যালিটির সীমারেখা শেষ হয়েছে খালের ধারে এসে। যমুনা নদীর সঙ্গে এই খালের যোগ। খালের সেতু পেরুলেই ইছাপুরে যাবার সরু মাটির রাস্তা দুপাশে

কালকাসুন্দি আর ভাঁটু ফুলের ঝোপ। যমুনা নদীর পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওই রাস্তা চলে গেছে ইছাপুর, মাটি-কুমড়া হয়ে গাইঘাটার দিকে। গাইঘাটায় যশোর রোডের সঙ্গে মিশেছে। গোবরডাঙ্গা পুরসভার সীমানা শেষ হলেই যশোর জেলা। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় আমাদের আশঙ্কা ছিল ইছাপুর হয়ত পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু কানের পাশ দিয়ে তীর চলে গেল। বনগাঁ মহকুমা যশোর জেলা থেকে কেটে ২৪ পরগণার মধ্যে পড়ল।

গোটা ইছাপুর গ্রামটি ছিল আমবাগান আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি। পিসীমার বাড়ি অনেকখানি জায়গা নিয়ে। বাড়ির সংলগ্ন বিরাট আমবাগান। জ্যৈষ্ঠমাস ছিল ওদের সবচেয়ে আনন্দের মাস। দিনরাত ধরে বাড়ির সকলে আম কুড়োতে যেত। গাছ নামলে (আম পাকলে) আম পেড়ে স্তূপাকার করে জাগ দেওয়া হত। আর পিসীমা ও বউদিরা সারাদিন ধরে ব্যস্ত থাকতেন আমসত্ত করতে।

কত রকমের যে আমসত্ত করা হত তার ইয়ত্তা নেই। কাচের রেকাবিতে, নানা সাইজের থালায় সেইসব আমসত্ত শুকতো। পিসেমশাইদের কলকাতায় বউবাজারে জুয়েলারির দোকান ছিল—এস. এন. গাঙ্গুলি জুয়েলার্স। পিসেমশাই মারা যাবার পর তার বড় ছেলে লালাদা দোকান দেখতেন। কিন্তু দোকান তখন টিম টিম করে চলত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বউবাজারের জুয়েলারির দোকানগুলির আধুনিকীকরণ শুরু হয়। সেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মত ওঁদের পুঁজি ছিল না। এর ওপর পরবর্তীকালের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইনে চরম আঘাত ওরা সামলাতে পারেনি। এস. এন. গাঙ্গুলি জুয়েলার্স বন্ধ হয়ে যায়।

ইছাপুরে পিসীমার বাড়ি আমার খুব শিশুকাল থেকে যাতায়াত ছিল। খুব ছোটবেলায় গিয়েছি বাবার সঙ্গে। বাবা বলতেন— হাঁটতে পারবে তো? আমি কিন্তু কোলে নিতে পারব না।

আমি বলতাম পারব।

কিন্তু কিছুদূর গিয়ে হাঁটতে পারতাম না। তখন বাবার কোলে উঠতেই হত।

পিসীমার চার ছেলে দুই মেয়ে। ছোট ছেলে কেষ্টদার বিয়েতে আমরা সবাই বাড়ি শুদ্ধ গিয়েছিলাম গরুর গাড়ি করে। ওই গরুর গাড়ি করে গোবরডাঙ্গা স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে করে বারাসত বরযাত্রী গিয়েছিলাম। ওই বিয়েতে বরযাত্রী যাবার কথা বিশেষ করে মনে আছে এই কারণে যে বিয়েতে যাবার মত আমার কোন পোশাক ছিল না। আমি, আমার বড় পিসতুতো দাদা লালাদার ছেলে খাগু, মেজ পিসতুতো দাদার ছেলে গোপাল প্রায় একবয়সী ছিলাম। আমাদের সাজিয়ে দিচ্ছিলেন পিসীমার ছোট মেয়ে পার্বতীদি। পার্বতীদি আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়। সাজানোর পর তিনি কাকে যেন বললেন—সবচেয়ে ভাল পোশাক হয়েছে খাগুর, তারপর গোপালের আর সবচেয়ে খারাপ পোশাক কালীর (আমার)।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পোশাক নিয়ে কোন হীনমন্যতা দেখা দেয়নি আমার মধ্যে। আমার সমস্ত স্কুল ও কলেজ জীবনে আমি ছোট পিসিমার ছেলেদের

পুরনো জামা প্যান্ট পরে কাটিয়েছি। এজন্য কখনও কোন পোশাক আমাকে ফিট করত না। হয় বড় না হয় ছোট হত। পরবর্তীকালে যখন উপার্জনক্ষম হলাম তখনও পোশাকের জন্য বেশি ব্যয় করাটা আমার কাছে অপব্যয় বলে মনে হত। তাই আমার ছোটবেলার পোশাক পরিচ্ছদের অতৃপ্তি আমার ছেলেমেয়েদের দামী পোশাক কিনে দিয়ে মিটিয়েছি, কিন্তু নিজের জন্য কদাচ শৌখীন পোশাক কিনেছি।

গ্রামের শিক্ষিত বর্ধিষ্ণু পরিবার বলতে যা বোঝাত সেজপিসীমাদের পরিবার ছিল তাই। একমাত্র বড় ছেলে ছোটবেলায় বাবার ব্যবসায়ে ঢুকে পড়ায় তিনি কলেজে পড়তে পারেননি। মেজ ছেলে শিবুদা তখনকার দিনের এল এম এফ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর বন্দুক ছিল এবং নিয়মিত শিকারে যেতেন। গোবরডাঙ্গা থেকে গাইঘাটা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এত ঘন জঙ্গল ছিল যে প্রায়ই বাঘ বেরুতো। বুনো শুয়োর তো প্রচুর ছিল। শিবুদা একটি বাঘ মেরেছিলেন। বাঘটি ছাল ছাড়িয়ে তাঁদের বাহিরের ঘরে রাখা ছিল।

আমার ভাই তারা প্রসন্নর জন্ম হয় দুপুরবেলা। মায়ের প্রসব ব্যথা ওঠার পর পিসিমাদের অন্দরমহলে আঁতুড় ঘর পাতা হল। বাবা গোবরডাঙ্গা চলে গেলেন ধাইকে ডাকতে। দুপুরবেলা হন্তদন্ত হয়ে ধাই মা এলেন অতখানি রাস্তা হেঁটে। তার নাম ছিল যমুনা। তিনি আমার ও আমার বোনের নাড়ি কেটেছিলেন। তাঁকে আমরা ধাইমা বলে ডাকতাম। আশেপাশে চার পাঁচখানা গ্রামে তিনিই একমাত্র ধাত্রী। সে সময় গ্রামে হাসপাতাল ছিল না বললে ভুল হবে। যুদ্ধের জন্য একটি অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল টাউন হলে। কিন্তু ভদ্রলোকেরা কেউ সেখানে যেত না। সকলেরই জন্ম হত বাড়িতে আঁতুড় ঘরে। সম্পন্ন লোকদের বাড়িতে ঠাকুর ঘরের মত আলাদা আঁতুড় ঘর করে রাখা হত।

আমার ভাই তরুণের বয়স যখন একমাস তখন ভাইকে নিয়ে ইছাপুর থেকে আমরা আবার দেশের বাড়িতে ফিরলাম।

তখনই দেখলাম বড় তরফের মাঠে বিশাল মণ্ডপ হচ্ছে। কালীবাড়ির পাশে নহবতখানা চুনকাম করা হচ্ছে। শুনলাম বুদ্ধবাবুর (জয়তীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—ইনি একবার বিধায়ক হয়েছিলেন) প্রথম ছেলে হয়েছে। আর কদিন পরে তার অন্নপ্রাশন। বিরাট ঘটা হবে। তারই প্রস্তুতি।

আমার ঠাকুর্দা রাসবিহারী শেষের দিকে বড় তরফের জমিদারদেরই দেওয়ান ছিলেন। সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে বড়তরফের একটা সম্পর্ক থেকেই গিয়েছিল। দুর্গা পুজোয় বাবা প্রতিবছর দুর্গানাম জপ করতেন বড় তরফের পুজোয়। সেই উপলক্ষে আমি ছোটবেলা থেকে পুজোর কদিন বড় তরফেই থাকতাম। সেখানে রোজ খাওয়া-দাওয়া হত। আমিও পাত পেতে বসে যেতাম।

বুদ্ধবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনেও নেমতন্ন হয়েছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। তিন চার রকমের বাজনা এসেছিল কলকাতা থেকে। একদিকে দিশী নহবৎ, একদিকে পোশাক পরা ব্যান্ড পার্টি। ক'দিন ধরে রাতের বেলায় চলল থিয়েটার ও যাত্রা। গ্রাম শুদ্ধ সকলের খাওয়ার নেমন্তন্ন হয়েছিল আর প্রজাদের স্ট্যাটাস অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার

ব্যবস্থা হয়েছিল। কলকাতা থেকে কত যে লোক এসেছিল যমুনার ওপারে গাড়ি রেখে। কারণ যমুনার ওপর তখন ব্রিজ বা কাঠের সেতু কিছুই ছিল না। কলকাতা থেকে গাড়িতে [illegible] পর্যন্ত এসে নৌকোয় নদী পেরিয়ে গোবরডাঙ্গা আসতে হত, নয়তো গাইঘাটা—ইছাপুর ঘুরে আসতে হত। কিন্তু সে রাস্তা ছিল সরু, ধুলোয় ধূসরিত। সে পথে মোটর গাড়ি কদাচিৎ চলত।

জমিদারি উচ্ছেদের আগে পর্যন্ত আমি বড় তরফের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেখেছি। বিশেষ করে অভিজাত্য ও প্রতাপে বড় তরফের জুড়ি কেউ ছিল না। সাহেব সুবোদের সঙ্গে ও ঁাদের খাতির ছিল। তাদের খেলার জন্য ছিল বিলিয়ার্ড টেবল। মাছ ধরার জন্য সুন্দর ঝিল। বাড়ির চারপাশে কেয়ারি করা বাগান। বাবুদের কাছে নালিশ করলে বাবুরা অভিযুক্তকে তলব করতেন। কেউ না এলে পাইকেরা তাকে চড় চাপড় দিয়ে নিয়ে আসত। গ্রামের বাজার ছিল জমিদারদের। সেখান থেকে পাইক বরকন্দাজরা তোলা তুলত।

অমিত বিত্তশালী না হলেও জমিদারির ঠাটবাট বজায় রাখতে অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করত না বড় তরফ। যেমন দুর্গাপুজোর সময় নবমীতে নটা পাঁঠা ও একটা ভেড়া বলি হত। ও কালীমন্দিরেও সমপরিমাণ বলি হত। নবমীর দিন দু-তিনশো লোকতো খেতই। বিজয়া দশমীর দিন যমুনায় নৌকায় করে বেড়ানো ছিল গ্রামের রেওয়াজ। অনেক সাধারণ মানুষও নৌকো ভাড়া করত। বড়তবফের ঠাকুর যেত ডাবের নৌকোয়। অর্থাৎ বড় বড় দুটো নৌকো এক সঙ্গে বেঁধে। বাবুদের বাড়ির পরিবাররাও অমন দুটো নৌকো জুড়ে তাঁর ওপর শতরঞ্জি ও গালিচা পেতে, পাইক বরকন্দাজ নিয়ে উঠতেন। সবার আগে তাঁদের প্রতিমা আগে বিসর্জন হত।

বিজয়া দশমীর দিন নৌকো চড়ার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। কিন্তু বাবার নৌকো ভাড়া করার মত সামর্থ্য ছিল না। তিনি আমাকে বড় তরফের নৌকোয় তুলে দিতেন। রাজেন্দ্র সঙ্গমে আমার মত আরও দীন বালকও তীর্থ দরশনের সুযোগ পেত।

॥ নয় ॥

ছেড়ে আসা গ্রাম

দেশ বিভাগের পর থেকেই গোবরডাঙ্গায় উদ্বাস্তু আসা শুরু হল। প্রথমে এল একটু সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারেরা। তারা কেউ জমি জায়গা কিনে বা বিনিময়ে করে এপারে চলে এল। যশোর-খুলনা-বরিশাল আর ফরিদপুরের লোক এল বেশি। কারণ বেনাপোল বর্ডার দিয়ে তাদেরই আসার সুবিধে।

আমাদের ইস্কুল নতুন নতুন ছেলেতে ভর্তি হয়ে উঠল। ইতিহাসের মাস্টারমশাই শিববাবু থিয়েটার করতেন। রাজসিংহতে মুবারক, কারাগারে বাসুদেব সাজতেন। ক্লাসে এসেও তিনি নাটকের সংলাপের ঢঙে কথা বলতেন। উদ্বাস্তু ছাত্রদের দেখলেই তিনি পূর্ববঙ্গের ভাষা নকল করে বলতেন — বাড়ি কই? (কোথায় ছিল?) কবে আইছ? দেখতে দেখতে বিশাল বিশাল আমবাগানগুলি কাটা পড়ল। সে সব জমি সরকার

রিকুইজিসন করতে চলেছে খবর পেয়ে জমির মালিকেরা গাছ কেটে নিচ্ছিল। স্টেশনে যাবার পথে আমবাগানে রাতারাতি তাঁবু পড়ে গেল। রিফিউজিদের ট্রানজিট ক্যাম্পে পরিণত হল জায়গাগুলি। এরমধ্যে দাদামশাই একদিন এলেন। শোনা যাচ্ছে শিগ্রি পাশপোর্ট ভিসা চালু হবে। আর খুশিমত দেশে যাওয়া যাবে না। উনি তো বছরের বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে। এবার সেটুকু সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান। ছেলে রেলে চাকরি পেয়েছে, কোয়ার্টার্স পেয়েছে। ছেলের ওখানেই এখন পাকাপাকি থাকবেন ঠিক করেছেন।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, জেঠামশাই-এর ছেলে-মেয়েরা সব কোথায়? আকু ভকু ননী ঝনী বাগানী ও তার ছেলেমেয়েরা? বাপের বাড়ির বিস্তর আত্মীয়-স্বজন পাকিস্তানে। বাবা বললেন, শুনেছি তো একমাত্র আকু ছাড়া সবাই চলে এসেছে। কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে? মুসলমানেরা যারা এতদিন মুখ তুলে কথা বলত না এখন তারা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনায়। বলে পাকিস্তানে থাকতে গেলে আমাদের কথা শুনতে হবে। আমাদের পাড়া ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ঘটকরা সাতু দারা সবাই বাড়ি ঘর বিক্রি করে চলে এসেছে।

মনে পড়ল কী সুন্দর ফুল ফুটে থাকত ঘটকদের বাগানে। ঘটক মশাই ফুল তুলতে দিতেন না। বলতেন—ফুল তুলবা না। ফুল হল গিয়ে গাছের শোভা। মনে মনে কল্পনা করলাম, এক গাদা ছেলেমেয়ে কোথা থেকে এসে পট পট করে ঘটকদের বাগানের ফুল ছিঁড়ে নিচ্ছে।

বাবা বললেন, দেশ যখন ছাড়তেই হল তখন এদেশে কিছু একটা মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করুন।

দাদামশাই বললেন, জমি জায়গা কেনা বললেই কি কেনা যায়। দেশের কিছুই তো বিক্রি করতে পারিনি।

বাবা বললেন, আপনি যদি চান খুব কম দামে কেষ্টর জন্য দুবিঘা জমি নিতে পারেন। আমার নিজের জমি বলতে এই দু-বিঘাই আছে।

তোমার আবার কোন জমি?

সমাদ্দার পাড়ায়। বলেন তো দেখিয়ে আনতে পারি।

সমাদ্দার পাড়ায় তখন ঘনবসতি ছিল না। ওই দুবিঘে জমির একটা বাগান ছিল আমাদের। তাতে কিছু কলা গাছ, সজনে গাছ আর একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। গোটা জমি অনাবাদী। ঝোপে ঝাড়ে ভর্তি। আমি মাঝে মাঝে যেতাম কোদাল নিয়ে কোপাতে। ইচ্ছে ছিল বাগান করার। কিন্তু আমার সে সামর্থ্য কোথায়?

বাবার তখন সদ্য জমিদারি চলে গিয়েছে। জমিদারি বলতে ওই সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদারি। কিন্তু সেটা গিয়ে বাবার আর কিছু করার থাকল না। সামান্য আয়টুকুও চলে গেল।

বাবার স্বপ্ন ছিল সমাদ্দার পাড়ার বাড়ি ছেড়ে কোন ভদ্রপাড়ায় বাড়ি কিনে চলে যাবেন। অনেক বাড়ির সন্ধান পেয়ে সে সব বাড়ি দেখেও এসেছেন তিনি। কিন্তু যাঁর

দশটা টাকা বার করারও মুরোদ নেই, তিনি কিনবেন বাড়ি।

সমাদ্দার পাড়ার ওই একমাত্র জমিটাও বাবা বিক্রি করে দিচ্ছেন দেখে মনে দুঃখ হল। এর আগে বাবা যে সব সম্পত্তি বিক্রি করেছেন তা শরিকি ভাগের অংশ। বাগান পুকুরের অংশ। নিজস্ব বলতে ছিল ওই জমিটুকু।

কিন্তু মা চাইলেন ওই জমি বিক্রি হোক। অন্তত পরের হাতে তো যাচ্ছে না। নিজের ভাই এসে থাকবে।

দাদামশাই ও মামা এসে করকরে টাকা গুনে দিয়ে বললেন, কেনা থাকল। আমরা কবে আসব জানি না। কেষ্ট রিটায়ার করার আগে তো নয়ই—জমি থাকল। তোমরাই দেখাশুনো করবে।

॥ দশ ॥

কলকাতার হাতছানি

বড়দিনের সময় প্রতিবারই বাবা কলকাতায় পিসীমার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যেতেন। বছরে ওই কটা দিনের জন্য সারা বছর বসে থাকতাম। বড় দিনের কলকাতা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল বিমলদার ছেলে (আমারই বয়সী) বাবলুর গল্পের বই। কী করে যে এই গল্পের বই পড়ার নেশা ধরেছিল তা এখন বলতে পারব না। তবে যখন পাঠশালায় পড়ি তখন আমার পিসতুতো দিদি আমাকে বাবার হাত দিয়ে দুটো বই পাঠিয়েছিল ; জয়ডঙ্কা আর মজাদার গল্প।

ওই বই দুটি পড়তে খুব ভাল লাগত। পাঠশালায় আমার বন্ধু অসিত খুব বই পড়ত। সে নানা অ্যাডভেঞ্চারের বই-এর নাম করত। দু-একটা বই আমাকেও পড়তে দিয়েছিল।

এরপর কাশীতে পৈতের ব্রতভিক্ষার পয়সা দিয়ে বেনারসের গোধূলিয়ায় একটি বই-এর দোকান থেকে কিনেছিলাম 'ছেলেধরা সার্কাস'। লেখক শ্রী শামুক। শ্রী শামুক ছদ্মনামের আড়ালে যিনিই লেখক থাকুন তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, বই-এর নেশা তিনিই আমায় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাস দেখতে গিয়ে দুই ভাই আর দুই বোনকে সার্কাসওয়ালার ধরে বন্দী করে রাখে। তারপর তাদের ট্রেনিং দিয়ে সার্কাসের খেলা শেখাতে থাকে। খেলা শিখে ওরাও সার্কাসের শিল্পী হয়ে যায়। তারপর কীভাবে তারা উদ্ধার পায় তার রোমহর্ষক কাহিনীই ছিল বই-এর বিষয়।

সে সময় বেনারসে একটি সার্কাস দল এসেছিল ঃ গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস। ওই সার্কাস দেখার সময় আমি ছেলেধরা সার্কাসের নায়ক-নায়িকাদের মেলাতাম। কত রাত স্বপ্নে দেখেছি টেনি বুলা লব ও কুশ চার ভাইবোনকে।

পিসীমার বাড়িতে বাবলুদের ঘর ছিল তেতলায়। সেখানে আলমারিতে বাবলুর আলমারিতে দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী থাকত সারি সারি। সেই সব বই আমি গোগ্রাসে গিলতাম।

পিসীমার বাড়িতে আমি আর বাবা ঘুমোতাম নীচের ঘরে তক্তপোষে। ওই ঘরে বড়দা সুধীরদার ছেলে ঝড়ু প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ত। তার পড়া হয়ে গেলে

সারি সারি পিড়ি পাতা হত খাওয়ার ঘরে। ঠাকুর খেতে দিত। সকালের ব্রেক ফাস্ট ছিল পাউরুটি আর দুধ। সেটি পিসীমা নিজে হাতেসবাইকে দিতেন। পিসেমশাই তখন অবসর নিয়েছেন। তাঁর সামনে আমি যেতে ভয় পেতাম। আমি কেন বাবাও তার সামনাসামনি হতেন না।

আমার যাওয়াটা পিসীমা পছন্দ করতেন না। বলতেন, ওকে আবার নিয়ে এসেছ কেন পয়সা খরচ করে। একে তো তোমার অভাবের সংসার। কলকাতায় আসার কম খরচ?

বাবা বলতেন, ছেলে মানুষ, বড়দিনের সময়টা কলকাতায় আসার জন্য বায়না ধরে।

ঃ বায়না ধরলেই পুরণ করতে হবে।? বোঁচ আর তোমাদের টাকা দিতে পারবে না বলে দিয়েছে। তারও তো খরচ আছে। সব সময় তাকে ছিঁড়ে খেলে হবে কী করে।

বাবা বলতেন, জমিদারির ক্ষতিপূরণটা পেলে একটা কিছু ব্যবসা করব ভাবছি।

ঃ তুমি আর ব্যবসা করেছ। তোমাকে লাইসেন্স করিয়ে দিলাম। লোকের গাড়ি চালালেও আজকাল পঞ্চাশ ষাট টাকা মাইনে তা জানো।

ঃ না দিদি, এবার সত্যিই একটা দোকান দেব। আর তোমার কাছে হাত পাতব না।

পিসীমাদের বাড়ি নিচের পড়ার ঘরে তক্তাপোষে আমাদের রাতের বিছানা হত। ঘরে একটি ফ্যান ছিল।

আমার খুব ইচ্ছে করত ফ্যান চালিয়ে শুই। গোবরডাঙ্গায় তখনও ইলেকট্রিক লাইন আসেনি। আমাদের শোবার ঘরে হাওয়া ঢুকত না। দারুণ গরম।

বাবা বলতেন, শীতকালে ফ্যান চালিয়ে শোবে কী! তাছাড়া ফ্যান চালালে ছোটদি রাগ করে। দেখলে না সেবার গরমের ছুটিতেও ফ্যান চালাইনি।

আমি অবাক হয়ে ভাবতাম ফ্যান চালালে রাগ করার কি আছে। বাবাকে বলতেই তিনি বললেন ঃ ছোটদি রাগ করবে ফ্যান চালালে মিটার ওঠে। তার ওপর বাত হয়। আমাদের তো অভ্যেস নেই। তা তুমি যেন ওপরে বিমলের ঘরে গিয়ে বেসিনে টেসিনে হাত ধুয়ো না। ওরা পছন্দ করে না। লোকের বাড়ি যখন থাকবে তখন তাদের পছন্দ অপছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

গোবরডাঙ্গায় থাকতে ভোরবেলা ডেকে দিতেন বাবা। সেই ছোটবেলা থেকে ভোরে ওঠা অভ্যাস আমার। এখনও গরমের দিনে ভোর পাঁচটায়, শীতে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ি। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে বাবা বলতেন, জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করছ বাবা.....

পিসীমার বাড়িতে বাবাকে ডাকতে হত না। ঘুম ভাঙত রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দে। জনক রোডে পিসীমার বাড়ি। কটা লোক বিরাট লম্বা পাইপ নিয়ে এসে হাইড্রেন্ট খুলে কানেকশান লাগিয়ে সারা রাস্তা জলে ধুয়ে দিত আর সেই জল ভেজা রাস্তায় ভোর না হতেই সাইকেলওয়ালারা এসে খবরের কাগজ গলিয়ে ফেলে দিয়ে যেত প্রতি বাড়ি।

বাবা আমায় নিয়ে ঢাকুরিয়া লেকের দিকে নিয়ে যেতেন। দু পাশে বিরাট বিরাট বাড়ি। তার মধ্যে একটা বাড়ি ঠিক জাহাজের মত। গোলপার্ক তখনও হয়নি। লেক

হাসপাতাল পেরুলেই গ্রাম পড়ে যেত।

বাবা সারা রাস্তা উপদেশ দিতে দিতে যেতেন। যখন কলকাতার রাস্তায় চলবে, চারটে চোখ রাখবে। কোনদিক থেকে গাড়ি এসে যে মেরে দেবে— আর গায়ত্রী জপটা যে কতবার রোজ করতে বলেছি—

আমার এক নাগাড়ে রুটিন ধরে কোন কিছু করতে ভাল লাগে না। যখন ইচ্ছা হয় জপ করতে বসি। হয়তো চলতে ফিরতে গায়ত্রী মন্ত্র মনে পড়ে। আকাশে সূর্যোদয় দেখলে সূর্যাস্তর কথা মনে পড়ে। কিন্তু আসন পেতে আহ্নিক করতে বসা আমার ধাতে সয় না। একই পথ ধরে চলতে আমার কখনও ভাল লাগে না। আমি অনেক সময় ছোটবেলায় নানা রাস্তা ধরে বাজারে যেতাম। গতানুগতিক পথ ধরে চলতে ভাল লাগত না।

কেন যে নৈমিত্তকতা আমার ভাল লাগনো আমি জানি না। আমি চাই বৈচিত্র্য। চাই নমনীয়তা। চাই কিছু করা বা না করার স্বাধীনতা।

বাবলুর কাছ থেকে বড় পড়ার যে নেশা পেয়ে বসেছিল তাতে অচিরেই তারাই আমার বন্ধু হয়ে উঠল যারা খেলাধুলো বা ক্লাসের পড়ার চেয়ে গল্পের বই পড়তে বেশি ভালবাসে। অসিত বলল—আমি শিশুরঞ্জন পাঠাগারের মেম্বার হয়েছি তুই হবি? অনেক ভাল ভাল বই আছে।

কোথায় সেটা?

মেজ তরফে। আট আনা ডিপোজিট আর চার আনা চাঁদা।

কিন্তু বারো আনা পয়সা যোগাড় করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। অনেক ভেবে চিন্তে কুল কিনারা করতে পারলাম না। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল মায়ের একটা বাক্স। পয়সা জামানের বাক্স। ওপরে ছেঁদা তার মধ্য দিয়ে পয়সা ফেলা হয়। তালাচাবি দেওয়া। ভেতরে ঝন ঝন করছে খুচরো পয়সা।

অনেক বুদ্ধি করে পয়সাগুলিকে ফুটোর দিকে নিয়ে এলাম। তারপর চুলের কাঁটা দিয়ে সন্তর্পণে একটা একটা করে টানতে টানতে বারো আনা হয়ে গেল।

মেজ তরফের তিন চারজন ছেলে আমাদের ইস্কুলে পড়ত। ওপরের দিকে পড়ত কিরণদা, আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে অসিতদের সঙ্গে পড়ত ঊষাপ্রসন্ন। অসিত ছিল ফার্স্ট বয়। অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধি ঝকমকে। আমার প্রিয় বন্ধু। ঊষাপ্রসন্নর ভাই দুদু ও আর তার এক কাকা ভবানী পড়ত তখন আমার থেকে এক ক্লাস নিচে।

ওরা সবাই গরুর গাড়ি করে আসত। আমাদের টিফিন নিয়ে আসার রেওয়াজ ছিল না। যাদের পয়সা আছে তারা টিফিনে ঘুগনি বা ঝাল মুড়ি কিনে খেত। আমাদের ক্লাশে গরিব ছাত্রও অনেকে ছিল যাদের টিফিনে কিছু কিনে খাবার মত সামর্থ্য ছিল না আবার অনেকের সামর্থ্য ছিল অথচ ইচ্ছে ছিল না। আমি ছিলাম প্রথম দলের। স্কুল কলেজে আমি কখনও বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাইনি। টিফিন কিনে খাওয়ার মতও পয়সা ছিল না।

শিশুরঞ্জন পাঠাগারের সূত্র ধরে মেজ তরফের ছেলেদের সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর ওই বিশাল বাড়ির পরিবারের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলাম। আবার একদিন যেমন আপনা আপনি সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তেমনি আপনা আপনি সম্পর্ক ভেঙেও গেল। মানুষের জীবন হল ছোট্ট নদীর মত। নদীর মত সে বার বার বাঁক নেয়। নদীর মত সে কত জনপদের মধ্য দিয়ে বহে চলে। কত লোক তার স্রোতে গা ভাসায়। কত মানুষ স্নান করে। কত নোংরা জল নদীতে এসে পড়ে আবার বর্ষার জলও তাকে পুষ্ট করে, কখনও খরা তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে যায়। কত শাখা নদী সে নদীতে এসে মেশে। কিন্তু সে কোথাও আটকে পড়ে না। কোথাও থেমে থামে না, কোন কিছুর মায়ায় আবদ্ধ থাকে না। তার লক্ষ্য কিন্তু মোহনায় গিয়ে মেশা।

শিশুরঞ্জন পাঠাগারটি মেজতরফের ছেলেরাই তৈরি করেছিল তাদের সংগ্রহ থেকে। অধিকাংশ বই-ই ছোটদের। এক একটি করে বই নিতাম, গোগ্রাসে পড়তাম। নীহার রঞ্জন গুপ্তের কালো ভ্রমর। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের পাতালের পাকচক্রে, হেমেন্দ্র কুমার রায়ের যখের ধন। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী। সংক্ষেপিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী থেকে শুরু করে বিশ্ব সাহিত্যের যাবতীয় অনুবাদ পড়ে ফেললাম।

এই বই পড়ার সূত্র ধরেই ঊষাপ্রসন্নর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ঊষা আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ত। খুবই শীর্ণ। টকটকে ফর্সা রঙ। মেজ তরফের ছেলেমেয়েদের বাবার গায়ের রঙই ফর্সা।

ঊষার ঠাকুর্দা সতুবাবু তখন বেঁচে। তাঁর দু ভাই ক্ষিতিপ্রসন্ন ও ছোট দুর্গাপ্রসন্ন। দুর্গাপ্রসন্ন বিশেষ লেখাপড়া শেখেননি। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি শিশুরঞ্জন পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে মান্তুদা বলতাম।

ওঁদের মধ্যে ক্ষিতিপ্রসন্নর চেহারা ছিল টিপিক্যাল জমিদারদের মত। ভীষণ মেজাজি। কথায় বার্তায় চাল-চলনে আভিজাত্য ঝরে পড়ত।

একমাত্র ঊষার বাবা উমাপ্রসন্ন ছাড়া আমি আর কাউকে কাজ করতে দেখিনি। তাঁরা সারাদিন ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়া টানতেন। খবরের কাগজ ও বইপত্তর পড়তেন জমিদারির হিসাবপত্র দেখতেন।

বিশাল বাড়ি দু তরফে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে সেজ তরফ। সেটি সেজ বাবুর জামাইয়ের ভাগে পড়েছিল। তিনি কলকাতা থাকতেন। কালে ভদ্রে দেশে আসতেন। শ্বেতপাথরের বিশাল ইউসেপের বারান্দার এক প্রান্ত পার্টিশন করা ছিল।

মেজ তরফের প্রাসাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল নাচঘর। মেপে দেখিনি, তবে এই ঘরে যে কোন অনুষ্ঠানে হেসে খেলে তিন চারশ লোককে বসানো যেত। নাচ ঘরে ঝুলত বেলজিয়াম কাচের ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে ইতালিয়ান শিল্পীর আঁকা বিরাট বিরাট অয়েল পেন্টিং। কৃষ্ণনগরের অসাধারণ মাটির কাজ। বিরাট পিংপং টেবল। আর একটি মূল্যবান লাইব্রেরী। ওই নাচঘরে পরবর্তী কালে দিনের পর দিন রাতের পর রাত আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। নাচঘরের বারান্দা থেকে দেখা যেত ক্ষীণস্রোতা যমুনা নদী। সামনের মাঠ আর সিংহতোরণ পেরিয়ে রাস্তা।

ঊষা ও ভবানী ছিল প্রায় সমবয়সী। কিরণপ্রসন্ন বয়সে বড়। তিনি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলকাতায় আর জি করে ডাক্তারি পড়তে চলে যান।

ঊষা আমায় একদিন ডাকল।

বলল ঃ তুমি তো অনেক বই পড়। চল আমি তোমায় আমার কিছু বই দেখাই।

ঊষা আমায় নিয়ে গেল তিনতলায় তাদের ঘরে। সেই প্রথম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় মার্বেল পাথরের বারান্দায় পড়লাম। বারান্দা দিয়ে অন্দরমহলের ভেতর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার ছাদে যেতে হয়। বিশাল ছাদ। তার পাশেই দু তিনটে বড় বড় ঘর নিয়ে ঊষারা থাকে।

ঊষা তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। এত অপূর্ব সুন্দরী মহিলা আমি কখনও দেখিনি। এক দেখেছিলাম আমার ছোট পিসীমাকে। কিন্তু তিনি বয়স্কা।

আমি প্রণাম করলাম।

বোস বাবা। তুমি ঊষার সঙ্গে পড়?

না আমি এক ক্লাশ নীচে পড়ি।

ঊষা আলমারি থেকে তার বই-এর সংগ্রহ বার করল। দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী, শারদীয় শিশুসাথী।

আমি যখন অবাক হয়ে বইগুলোর পাতা উলটাচ্ছি, তখন ঊষাপ্রসন্ন আমায় এক আশ্চর্য বস্তু দেখালো। একটি ছোট্ট ক্যামেরার মত বস্তু। চোখ দিয়ে দেখলে ভেতরে সিনেমার মত থ্রি ডাইমেনসন ছবি দেখা যায়।

ঊষা বলল ঃ এর নাম ভিউ ফাইন্ডার।

॥ এগার ॥

বিপজ্জনক ভাবে বাঁচা

কোথায় মেজ তরফের বিশাল জমিদার বাড়ি আর কোথায় সমাদ্দার পাড়ায় ছোট্ট দুই ঘরের বাড়ি। রান্নাঘরের চালে খড় নেই। বর্ষায় রান্না করতে করতে মা ভিজে যায়। আমাদের ঘরে কোন ঘড়ি নেই। ট্রেনের শব্দ শুনে শুনে আমরা সময় ঠিক করি। থার্ড ট্রেন মানে আটটা। এর আধঘণ্টা পরে ফোর্থ ট্রেন। তার মানে এবার ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হতে হবে। স্নান করতে যেতে হবে পুকুরে।

আমাদের বাড়ি পায়খানা ছিল না। সে সময় আশেপাশের সব বাড়ির লোকের মত আমরাও মাঠে জঙ্গলে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য করতাম। তারপর দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু আসা শুরু হতেই জঙ্গল-বাগান কেটে বসত শুরু হতে শুরু করল। আমাদের পাড়ার লোকজনের হল এতে সবচাইতে বিপদ।

কিন্তু আমাদের সমাদ্দার পাড়ার বাড়িতে সবচেয়ে অশান্তি ছিল পাশের বাড়ির এক অশিক্ষিত নিঃসন্তান দম্পতির অত্যাচার। অত্যাচারের কারণ ছিল সম্পূর্ণ মানসিক। ওই লোকটির অকৃতদার দাদার কাছ থেকে বাবা খুব নামমাত্র দামে তার ভাগের অংশটি কিনেছিলেন। তাতে দুটো ঘর আর এক ফালি উঠোন পড়ে। সেই অংশটুকু বাবা প্রাচীর

দিয়ে ঘিরে নিয়েছিলেন।

এতে ওই লোকটির ভাই অত্যন্ত চটে যায়। তার আশা ছিল, অকৃতদার দাদা মারা গেলে তার অংশ সেই-সব ভোগ দখল করবে। কিন্তু বাবা যখন উড়ে এসে জুড়ে বসলেন তখন আর তারা মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারল না। তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

অত্যাচারটি ছিল অদ্ভুত রকমের। তারা স্বাভাবিক আচরণ করছে হঠাৎ দেখা গেল একদিন সকালে তার বউ চিৎকার করে অশ্লীল ভাষায় আমাদের উদ্দেশে গালমন্দ শুরু করেছে। সে গালাগাল যখন শুরু হত এক নাগাড়ে সাত দশদিন ধরে চলত। লাগোয়া বাড়ি। তাই পাশের বাড়ি থেকে চিৎকার চেঁচামেচি হলে আমাদেরও শান্তি নষ্ট হত। বড় তরফের যখন প্রবল প্রতাপে ছিল, বাবা জমিদারের কাছে নালিশ করেছিলেন। পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে দু এক ঘা চড় চাপড়ও দিয়েছিল। কিন্তু জমিদারি চলে যাবার পর জমিদারদের ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। আমরা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনেও বাস করতাম না। কাজেই কোন মোড়ল আর রইল না ছোটখাটো ঝগড়ার নিষ্পত্তির জন্য। শেষপর্যন্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়াল। তার ফলে আমরা আরও সর্বস্বান্ত হলাম। সে কথায় পরে আসছি।

১৯৪৯-৫০ থেকে পূর্বপাকিস্তান থেকে অনর্গল উদ্বাস্তু স্রোত আসা শুরু হয়ে গেল। পাসপোর্ট ভিসা চালু হয়ে গেলে হিন্দুরা আর পাকিস্তান থেকে সহজে চলে আসতে পারবে না এমন আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় লোকে পাগলের মত চলে আসতে লাগল। এর ওপর শুরু হয়ে গেল সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দু বিতাড়নের জন্য দাঙ্গা। সে সময় একটি মাত্র ট্রেন শিয়ালদা থেকে খুলনা যেত। এর নাম ছিল বরিশাল এক্সপ্রেস। এই ট্রেনে দেশ ভাগের আগে একবার খুলনায় গিয়েছিলাম। বেনিয়াখামারে আমার বড় পিসিমার মেয়ে জামাই থাকতেন। ললিত চাটুজ্যে তাঁর নাম। ললিত ও কিশোরী এই দুভাই খুলনার বেনিয়াখানারে বর্ধিষ্ণু পরিবার। এক ডাকে তাদের সবাই চিনত। বেনিয়াখামারে তাদের বাড়িতে সুভাষ বোসও এসেছিলেন। সে সময়কার খুলনা শহরের কথা মনে আছে। ঝকঝক করছে রাস্তা ঘাট। ছিমছাম স্টেশন। স্টেশনের কাছেই নদী। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দুবার খুলনায় গিয়েছি। কিন্তু সে খুলনাকে আর পাইনি।

পাকিস্তান হবার পর বরিশাল এক্সপ্রেস হয়ে গেল পাকিস্তানের ট্রেন। তাতে সবুজ রঙ করা হল। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ভাষায় ট্রেনের গায়ে লেখা হল জেনানা। ফার্স্ট ক্লাশ, ইন্টার ক্লাশ।

এক্সোডাস কাকে বলে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বরিশাল এক্সপ্রেসের ছাদে বোঝাই হয়ে মানুষ আসছে। যে যতটুকু পেরেছে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অর্ধেকই দিয়ে দিতে হয়েছে বেনাপোলে চেকপোস্টে। নগদ টাকা দিয়েও রেহাই ছিল না। ঘটিবাটি এমনকী ভাল জামা কাপড় দেখলেও তা তারা রেখে দিত।

সে সময় পাকিস্তানে সরকার হোমগার্ডের মত একটি বাহিনী তৈরি করে। তাদের

নাম ছিল আনসার। মৌলবাদী মুসলিমদের নিয়ে এই বাহিনী তৈরি হয়েছিল। এদের কাজ ছিল দেশত্যাগী হিন্দু শরণার্থীদের ওপর জোরজুলুম চালানো।

গোবরডাঙ্গায় শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য ছাত্রদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি হল। এটি করলেন হরিপদ দে নামে এক রাজনৈতিক কর্মী। খুলনা থেকে দে পরিবারের বহু লোক এসে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি ঘরদোর তৈরি করে বাস করছিলেন। জাতিতে তাঁরা ছিলেন বারুজীবী। হরিপদ দে ও তাঁর ভাইরা তৈরি করেছিলেন বাণীবিতান বলে একটি বই-এর দোকান। হাতে লাল ব্যাচ এঁটে আমাদের কাজ ছিল বরিশাল এক্সপ্রেস গোবরডাঙ্গা স্টেশনে এসে থামলে উদ্বাস্তুদের খাবার জল দেওয়া। কখনও কখনও পাউরুটিও দেওয়া হত। কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানুষগুলো সে সময় একটু পানীয় জল পেলেই যেন বর্তে যেত।

উদ্বাস্তুরা তাদের ওপর আনসার বাহিনীর অত্যাচারের কথা বলত। শুনতে শুনতে ক্লাশ নাইন টেনের ছেলেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠত। তারা ট্রেনে আনসার বাহিনীর লোকজন খুঁজত। দুর্ভাগ্যক্রমে দু-একজন আনসার মাঝে মাঝে ওই ট্রেনে কলকাতায় আসত। উদ্বাস্তুরা তাদের দেখিয়ে দিলে ট্রেন থেকে তাদের নামিয়ে নির্মম ভাবে মারধর করা হত। এটিও ছিল স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে এক ধরনের আকর্ষণ।

দেখতে দেখতে গোবরডাঙ্গার স্টেশন সংলগ্ন সমস্ত বাগানে উদ্বাস্তুদের ট্রাঞ্জিট ক্যাম্প বসে গেল। প্রথমে তারা টেন্ট করে থাকত। তারপর প্রত্যেককে জমির মালিকানা দেওয়া হল। গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হল। সেই ঋণের টাকায় তারা বাড়ি তুলল। ছাত্ররা পড়াশোনা চালাবার জন্য উদ্বাস্তু গ্র্যান্ট পেত। চাকরি বাকরিতেও তাদেব জন্য সংরক্ষণ শুরু হয়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের কোন মাস্টাব প্ল্যান ছিল না। একমাত্র দণ্ডকারণ্য ও আন্দামানে উদ্বাস্তুদের সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এ দু-জায়গাতেই উদ্বাস্তুদের যাবার ব্যাপারে বামপন্থীরা নানা বাগড়া দিত। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে খবরের কাগজগুলো ও খুব মুখর ছিল। আর আন্দামানে যাতে উদ্বাস্তুরা না যায় তার জন্য এমন প্রচার করা হয়েছিল যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছিল তাদের মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

শিয়ালদা স্টেশনে মাসের পর মাস, এমনকী এক বছর ধরেও বহু পরিবারকে পড়ে থাকতে দেখেছি। আমি পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়াতেও হাঙ্গেরি উদ্বাস্তু শিবির দেখেছি, সাইপ্রাসে গ্রীক সাইপ্রইটদের পুনর্বাসন দেখেছি কিন্তু বাঙালি উদ্বাস্তুদের শিয়ালদা স্টেশনে ও ট্রাঞ্জিট ক্যাম্পে পচে মরার মত অবর্ণনীয় অবস্থা আর কোথাও দেখিনি। না, দেখেছিলাম ঢাকায় বিহারী উদ্বাস্তুদের। এর চেয়েও করুণ অবস্থার মধ্যে থাকতে। আবার পূর্বপাকিস্তান থেকে অনেকে এদেশে এসে রাতারাতি অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন এমন লোকও বহু দেখেছি। অন্তত একটু সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের শিবিরে কাটাতে হয়নি। তাঁরা বাড়ি ভাড়া করে থেকেছেন জমি জায়গা কিনেছেন। দ্রুত ব্যবসায়ে লগ্নী

করেছেন। চাকরি বাকরিও অনেকে পেয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থা হয়ে পড়ল আরও দুঃসহ। জমিদারি চলে যাবার পর বাবা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেন। একদিন দেখলাম বাজারে সকলের সামনে মুদিখানার দোকানদার বাবাকে প্রকাশ্যে অপমান করছে।

ঃ দেবো দেবো করে আর কতদিন ঘোরাবেন? জোচ্চুরি করে আর কতদিন চালাবেন ছোটবাবু —

বাবা বললেন — তুমি আমায় জোচ্চর বলছ? যতবড় মুখ নয়, তত বড় কথা—

মুদি বলল— যান, যান, আপনার মুরোদ দেখা আছে মশায়। ত্রিশ টাকার ওপর বাকি পড়ে আছে ছ মাস ধরে। আজ না কাল করে ঘোরাচ্ছেন। রাস্তায় লোক জমে গেছে। সবাই মজা দেখছে। কেউ কোন কথা বলছেনা। শেষ পর্যন্ত মাথা নীচু করে বাবা চলে গেলেন।

উদ্বাস্তুদের মধ্যেও তখন জীবিকার জন্য অনেকে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ঋণের টাকা খরচ করে ফেলেছে অনেকে। অনেকে কাজকর্ম যোগাড় করতে না পেরে বাড়ির করোগেটেড টিন বেচে দিয়েছে। এক বিরাট দল নাম লিখিয়েছে সুপারি স্মাগলিং করার কাজে। দশ কেজি সুপারি কলকাতায় আড়ৎদারের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই নগদ দশ টাকা। যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা পরিবারের একদিন চলে যায়।

বাবাকে একদিন দেখলাম একটি স্যুটকেশ গোছাচ্ছেন।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম— বাবা কোথায় যাচ্ছে?

মা বলল— জানি না। সকাল থেকে দেখি স্যুটকেশ ঝাড়পোঁচ করছেন। আমি আর জানি না বাপু। একটা পয়সা নেই। এমনভাবে আর চলে না।

দেখলাম বাবা রোজ সকালে স্যুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

ফিরছে। রাতের ট্রেনে।

যে সংসারে হাঁড়ি চড়ত না, স্যুটকেশের কল্যাণে আবার পেট ভরে খাওয়া জুটল। কিন্তু ক'দিন পরে তাও সহ্য হল না। একদিন গভীর রাতে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাবা বাড়ি ফিরলেন।

শিয়ালদা থেকে বউবাজার যাবার পথে একদল মস্তান বাবার হাত স্যুটকেস ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। চোরের মায়ের মত কান্নারও উপায় নেই। পুলিশে খবর করারও উপায় নেই।

বাবা কেঁদে ফেললেন—মহাজন তো সমস্ত দাম ধরে নেবে। এখন আমার কী হবে। আবার যে কাল যাবো তাও সম্ভব নয়। আগের টাকা না মেটালে মাল পাবো না।

কিছুদিনের মধ্যেই বাবা নতুন জীবিকা ধরলেন, উদ্বাস্তু ঋণ পাবার দালালি। সমস্ত সরকারি অফিসে এ ব্যাপারে একটি দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। উদ্বাস্তুদের জন্য বহু ব্যাপারে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই ঋণের টাকা নিতে গেলে কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হত। বাবার মত আরও অনেক লোক গজিয়ে উঠেছিল যারা উদ্বাস্তুদের

ঋণের তদ্বির করত। অর্থাৎ ঠিক লোকের হাতে দরখাস্ত পৌঁছে ঋণটা বার করে দেওয়া। তারপর সামান্য কিছু টাকা তাদের বখরা থেকে কর্মচারীরাই দিতেন।

উদ্বাস্তু নই বলে আমরা কোন ঋণ পাবার অধিকারী নই। অথচ বাবার কোনও আয়ের সংস্থান নেই। মনে মনে ভাবতাম, আমরা কেন উদ্বাস্তু হলাম না।

দাদামশাই একদিন কাঁচরাপাড়া থেকে এসে বললেন— কেষ্টর ছেলেমেয়েরা সবাই লোন পাচ্ছে। আমি রিফিউজি কার্ড করিয়েছি। পাবলিশারের কাছ থেকে নাতিদের জন্য বই ভিক্ষে করে আনছি। তোর ছেলের বইপত্তরও এভাবে এনে দিতে পারি। হেডমাস্টারকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আর তোর মেয়ের গার্জেন যদি আমি হই তাহলে সেও উদ্বাস্তু ঋণ পাবে।

মা বললেন, তাহলে তুমি তাই হও বাবা।

দাদু বললেন, আমি চাইলে তো হবে না। হেড মিসট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি গার্জেনের নাম বদলাতে রাজি আছেন কিনা।

দাদু হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, আমার আপত্তি নেই। ফর্মে অভিভাবক হিসাবে আপনার নাম দিচ্ছি। রিফিউজি গ্র্যান্ট পেয়ে যাবে আপনার নাতনি। গ্রান্ট এলে আমরা মাইনের টাকা কেটে নেব।

বোনের ইস্কুলের মাইনেটা হয়ে গেল। কিন্তু আমার বেলা কী হবে? অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিতে গেলাম। সেভেন থেকে এইট। কিন্তু সাত আটমাসের ইস্কুলের মাইনে বাকি পড়ায় অ্যাডমিট কার্ড পেলাম না।

প্রথম দিন অঙ্ক।

কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড না দেখতে পারায় স্কুল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। পরীক্ষা দেওয়া হল না।

ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লাম। পরীক্ষা দিতে পারলাম না বলে প্রমোশানও হল না।

ক্লাশ এইটেই রয়ে গেলাম। কিন্তু পুরনো ক্লাশে বেতন তো দিতে হবেই।

বাবার সঙ্গে হেডম স্টার মশাই বঙ্কিমবাবুর দেখা।

ঃ কী, আপনার ছাওয়াল ইস্কুলে আয়না ক্যান?

ঃ আজ্ঞে বেতনের টাকা এখনও যোগাড় করতে পারিনি। কি মনে ভেবে বাবা বললেন, একটা কথা বলবো মাষ্টারমশাই। আমার একটা নতুন খাট আছে। কিছুদিন আগে গুরুদেব এক বাড়িতে শ্রাদ্ধ করে পেয়েছিলেন। আমায় যাবার আগে দান করে গেছেন। তা আমি বলি কি—ওই খাটটা আপনি রাখবেন?

ঃ খাট? তা আমার একটা লাগব। কত দাম নেবেন?

বাবা বললেন, ত্রিশ টাকা বাকি পড়েছিল ছেলের বেতন। আপনি ওই ত্রিশ টাকাই ধরে নিন। ছেলেটা ইস্কুলে যাক।

আমি অত জানতাম না। বাবা বাড়ি এসে কিছু বলেননি। ওই নতুন খাটটায় বিছানা করে আমি কয়েক দিন হল শুচ্ছি। খুব যে একটা ভাল খাট তা নয়। শ্রাদ্ধের খাট যেমন হয়, তেমন আর কী। পাশ ফিরতে গেলেই মচমচ শব্দ হয়।

পরদিন সকালে গায়ত্রী ছাত্রাবাস থেকে একদল ছেলে হাজির। বঙ্কিমবাবু পাঠিয়েছেন, খাট নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা আমাকে ডেকে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন— খাটটা সুবিধের নয় বাবা। দুদিন পরে একেবারে ভেঙে যাবে। ত্রিশ টাকা পেয়ে গেলাম খাটটা বিক্রি করে। তোমার ইস্কুলের বেতনটা হয়ে যাবে।

আমি খাট থেকে বিছানা নামিয়ে নিলাম। ওরা খাটটা নিয়ে হই হই করতে করতে চলে গেল।

অনেক সঙ্কোচ ও দ্বিধা নিয়ে ফেল করা ছাত্রের মত আবার পুরনো ক্লাসেই গিয়ে বসলাম। জীবনে এমন সঙ্কোচ ও দীনতার মুখে পড়েছিলাম আর মাত্র একবার। ১৯৮৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলাম।

নতুন ক্লাশে এসে মেজতরফের ভবানীর সঙ্গে ভাল করে বন্ধুত্ব হল। সে ওই ক্লাসে পড়ত। ক্লাশ এইটে দুবার থেকে আর একটি লাভ হল। সেবার অ্যানুয়ালে সেকেন্ড হলাম। কিন্তু তার আগে কতগুলি ঘটনা ঘটল। ক'দিন ধরে নিতাই নাথের বউ গালাগালের মাত্রাটা বাড়িয়ে তুলেছিল। বাবা যখন বাড়ি থেকে একদিন সকালে সকালে বেরুচ্ছিলেন এমন সময় নিতাই-এর বউ তাঁর কাছে এগিয়ে কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গী করে গালাগাল দিতে শুরু করল।

আমি চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এলাম। দেখি ওই স্ত্রী লোকটি বাবার খুব কাছে এসে তাকে উদ্দেশ করে গালাগাল দিচ্ছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। একটি ছোট কাঁঠাল গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে তার পেটে বন্দুকের নলের মত ঠেকিয়ে বললাম—এই খবরদার আর এগুবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই-এর বউ চিৎকার করে উঠল ঃ মেরে ফেলল, মেরে ফেলল।

তাড়াতাড়ি তার আর এক ভাই-এর ভাড়াটে বেরিয়ে এল। এই লোকটি উদ্বাস্তু। কিছুদিন হল সপরিবারে একটা ঘর ভাড়া করে আছে। জাতিতে কর্মকার। কিন্তু তাকে কোন কাজ কর্ম করতে দেখতাম না। কাঠখোট্টা চেহারা। বছর ত্রিশেক বয়স। লোকটি এগিয়ে এসে নিতাই-এর বউকে বলল— তোমায় মারছে। এত বড় আস্পর্ধা। তুমিও মারো। মারো, মারো আমি বলছি— নিতাই-এর বউ সম্ভবত ধি. টরিয়া গ্রস্ত। তার চোখের দৃষ্টি পালটে ক্রূরতা ফুটে উঠল। মনে হল সে আমাকে খুন করে ফেলবে। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলাম।

কিন্তু ঘটনাটা ওখানে থামল না। পরদিন ওই কর্মকার যুবকটি নিতাই আর তার বউকে নিয়ে বারাসতে গিয়ে আমার ও বাবার নামে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে এল। আমরা দু'জন এক অসহায় দুর্বল নারীকে নির্মমভাবে পিটিয়েছি। কর্মকার তার প্রত্যক্ষদর্শী।

যথাসময়ে সমন এল। বাবা ও আমি বারাসত কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম। আদালত কাকে বলে সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। একটার পর একটা তারিখ পড়তে লাগল। আমরা উকিলের সেরেস্তায় গিয়ে দশটা থেকে বসে থাকতাম। বেলা দুটো তিনটের সময় ডাক পড়ত। তারপর দুই উকিলে কী কথাবার্তা হত। আবার তারিখ পড়ত।

বাবা এই ঘটনাটা মিটমাটের সালিশীর জন্য স্কুলের উঁচু ক্লাশের কিছু ছাত্রের দ্বারস্থ হলেন। তারা একদিন কর্মকারকে রাস্তায় খুব হুমকি দিল। এর ফল হল আরও ভয়ানক। এবার কর্মকার আমাদের নামে আর একটা মামলা দায়ের করল, আমরা দুজন কিছু অজ্ঞাত পরিচয় গুণ্ডা ভাড়া করে তার বাড়ি চড়াও হয়ে তাকে মারধর করেছি ও তার সম্পত্তি লুঠপাট করেছি। ডাকাতির মামলা।

ভারতে যে কোন লোক কাউকে হয়রানির জন্য যে কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে পারে। আর মামলা হলেই একটা সমন যাবে। সমন নয়তো সাক্ষাৎ শমন। তারপর থেকে লোকটি যেন একটি মৃতদেহ। উকিল মুহুরিরা তাকে শকুনের মত ছিঁড়ে খাবে। আদালতে বসে বসে দেখলাম কত লোক এমন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে।

দুপক্ষের উকিলই তাদের মক্কেলকে বলছে— কোন ভয় নেই।

ডাকাতির মামলায় পুলিশের ওপর তদন্তের আদেশ দেওয়া হল। হাবড়ার সার্কেল অফিসার একদিন এলেন তদন্ত করতে। তাঁকে যথাযথ দক্ষিণা দিতে হল। কিন্তু মামলা ঝুলেই থাকল। এর মধ্যে হিতৈষীরা বাবাকে উপদেশ দিলেন, তুমিও কাউন্টার কেস করো। বিষেই একমাত্র বিষক্ষয় হতে পারে।

বাবা একটা পালটা মামলা রুজু করলেন।

এই তিনটে মামলা চালাতে বাবার জেরবার হবার অবস্থা। আমাদের দুটো ঘর। একটি শোবার ঘর আর একটি দালান। দুই ঘরের ভেতর একটি দরজা। এই দরজাটি কখনও বন্ধ করার দরকার পড়ত না। তাছাড়া আমাদের ঘরে কোন দামী আসবাব পত্র ছিল না। সম্পদ বলতে জমিদারির খাতাপত্র। জমিদারি চলে যাবার পর সেগুলো বাজে কাগজ। আর ছিল কয়েকটি ভাঙা স্যুটকেশে মায়ের কিছু শাড়ি। তার মধ্যে একটি পুরনো গরদের শাড়ি ছাড়া কোন দামী শাড়ি ছিল না। বাড়িতে কেউ না থাকলে আঁতিপাতি করা অ মার স্বভাব ছিল। এছাড়া কোথাও খুচরো পয়সা লুকনো আছে কিনা আমি দেখতাম। ক্লাশ সিক্সে উঠেই আমি টিউশ্যনি শুরু করি। তিনটাকা বেতন। কিন্তু সে পয়সাও নিয়মিত পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে আমারও পয়সার দরকার পড়ত।

বাবা ওই দরজাটা ভাঙব'র জন্য মিস্ত্রী নিয়ে এলেন। সেগুন কাঠের মজবুত দরজা। অন্তত একশ টাকা দাম পাওয়া যাবে। তা দিয়ে মামলার খরচ মেটানো যাবে।

মিস্ত্রী যখন দরজা ভাঙছে তখন গালাগাল শুরু হয়ে গেল।

পরদিন কর্মকার আর একটি মামলা ঠুকে দিল—আমরা জোর করে তাদের দরজা ভেঙে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছি। মামলার সংখ্যা ছিল এক হয়ে গেল চার।

শেষ পর্যন্ত কীভাবে মামলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম তা মনে নেই। সম্ভবত বছর খানেক ধরে দু'পক্ষই যুঝেছিল, বর্বরের ধন ক্ষয়ে খুব বেশি আনন্দ নেই। কারণ ক্ষয় করার মত ধন ফুরিয়ে গেলেই খেলাটা আর জমে না।

কিন্তু আমি ঠিক করলাম, এভাবে আর চলে না। লেখাপড়া আমার ভাগ্যে নেই। লেখাপড়া বড়লোকদের জন্য। গরিবের এ বিলাসিতা সাজে না। এর মধ্যে আমার বোনের পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে গেল।

পুরনো হেডমিস্ট্রেস বিতাড়িত। স্কুলের সেক্রেটারি হয়েছেন সন্তোষ কুমার ঘোষ। আমরা তাকে নানুদা বলে ডাকতাম।

পাঠশালায় পড়ার সময় দেখতাম স্বদেশী মিছিলের পুরোভাগে তিনি। বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি। গ্রামীণ সংবাদপত্র প্রকাশ করছেন। উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ। স্বাধীনতার পর তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গার্লস স্কুলের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। তাঁর আমলে আমার বোনের ফ্রি শিপটা কাটা গেল। নতুন কমিটির যুক্তি, স্কুলের আয় বাড়াতে হবে। ফ্রি স্টুডেন্ট রাখা যাবে না। বাবা বললেন, আর আমি পড়াতে পারব না। বোন পড়া ছেড়ে বাড়িতে বসে রইল। আমার ভাই পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে। কিন্তু তার পড়াশোনায় মন নেই। সে শুধু ইস্কুল বদলাচ্ছে।

একজন বলল, মার্চেন্ট নেভিতে রিক্রুট হবে আগামী কাল সকালে। হাবড়া থানার মাঠে। যাবি?

ঃ মার্চেন্ট নেভি? মানে জাহাজে যাওয়া যাবে?

হ্যাঁ কী মজা বলতো। কত দেশবিদেশ ঘুরবি।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়ে শঙ্করের অভিজ্ঞতা। আফ্রিকার গহন অরণ্যের রহস্য রোমাঞ্চ। রামনাথ বিশ্বাসের ভূপর্যটন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে প্রবাসে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবিতে ভিনদেশ বার্মার বর্ণনা। গোবরডাঙ্গা ছাড়িয়ে এবার কাশী পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমার তো যেতে ইচ্ছা করে আরও দূরে, আরও দূরে। কোথায় ভূমধ্য সাগরের তীরে পিসা শহরে আছে হেলানো মিনার, মস্কোর ক্রেমলিনে নাকি আছে পৃথিবীর বৃহত্তম ঘণ্টা। আর সেই আশ্চর্য ঘড়িটা কোথায় যার নাম বিগবেন। আচ্ছা টেমস ও ডানিয়ুব কী গঙ্গার চেয়ে বড়? মিশরকে নীলনদের দান কেন বলা হয়?

পরদিন সকালে হাবড়া থানার মাঠে নেভি রিক্রুটমেন্টের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় হাজারখানেক অল্পবয়সী ছেলে জড় হয়েছে নানা প্রান্ত থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাইকে ঘোষণা হল— সবাই লাইন করে দাঁড়াও।

আমরা সবাই লাইন করে দাঁড়ালাম। দুজন করে অফিসার লাইনের সামনে দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যেকের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। আর পছন্দমত এক একজনের পেটে খোঁচা দিয়ে বলছিলেন সামনে আলাদা করে লাইন করে দাঁড়াও।

আমি মনে মনে ভাবছি আমাকে নিশ্চয়ই ওদের পছন্দ হবে না। কারণ আমি রোগা। তার ওপর আমার চোখে চশমা আছে। অবশ্য পাওয়ার খুব বেশি নয়। কিন্তু চশমা ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলে না। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়। ক্লাশ সেভেনে উঠেই আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজে দেখিয়ে প্রথম চশমা নিয়েছি। কিন্তু আমার সামনে

এসে আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অফিসার আমার পেটে খোঁচা মারলেন। নিজের অজান্তে আমি আবিষ্কার করলাম, আমি প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিতদের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে কালো চেহারার একটি সুঠাম চেহারার ছেলে। আমার চেয়ে বয়সে বড় বলে মনে হয়।

আমাকে বলল — দাদার কি ফুটবল টল খেলা হয়? অতবড় ছেলে আমাকে দাদা বলছে দেখে আমার একটু আত্মবিশ্বাস ফিরে এল।

বললাম — না, আমি ফুটবল খেলি না। কোন খেলাধুলাই আমার আসে না। ছেলেটি বলল ঃ ওরা খেলোয়াড় ছেলে চায়। আমি তাই খেলার সব সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি। আমার নাম অমল। আমি ফুটবলে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি দুবার। যদি চাকরিটা হয়ে যায় মাকালীকে মানত করে এসেছি।

কিন্তু আমার তো কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বুঝলাম আমার রিক্রুটমেন্ট হবার সম্ভাবনা একদম নেই।

একটু পরে আবার ঘোষণা হল—যারা স্ক্রিনিং-এ সিলেক্ট হওনি, তারা বাড়ি চলে যাও। আর যারা সিলেক্টেড হয়েছ তাদের মাপ ও ওজন নেওয়া হবে এক এক করে।

কিন্তু আমার যে মাত্র ৫৮ কেজি ওজন। পাঁচফুট সাত-ইঞ্চি হাইট। আমার কী হবে? আমি এন সি সি তে নাম লিখিয়েছি। কিন্তু খাকির পোশাক পরলে আমাকে নাকি তালপাতার সেপাই দেখায়। তবু আমার ডাক এল। ওজন ও মাপে আমি উতরে গেলাম। অফিসার আমাকে বললেন—বয়সের সার্টিফিকেট দেখাও।

বয়সের সার্টিফিকেট? আমি গাছ থেকে পড়লাম। আমি তো জানতাম না যে সার্টিফিকেট আনতে হবে।

সার্টিফিকেট এনেছ না আনোনি?

আমি জানতাম না স্যার। আপনারা যদি আমায় সিলেক্ট করেন, আমি কালকেই ইস্কুল থেকে এনে দেব স্যার .....

সরি। আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের সার্কুলারে বলা ছিল প্রত্যেককে বয়সের সার্টিফিকেট আনতে হবে। ষোল বছরের কম বয়স যাদের তাদেরই শুরু নেওয়া হবে।

আমার বয়স ১৫ বছর স্যার।

মুখে বললে হবে না, সার্টিফিকেট চাই।

আমার চাকরিটা বড় দরকার স্যর। আমি খুব আশা করে এসেছিলাম.....

অফিসার এবার ধমক দিলেন, যাও ভাগো। নেক্সট।

পনের বছর বয়সে সেই প্রথম জীবনে মনে হয়েছিল জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বয়সটাতে যে কোন সামান্য আঘাত বুকে বেশি করে বাজে। আর কে যে কোথায় আঘাত পাবে তা সে নিজেও জানে না।

আমার মনে হল এখন আর আমার কিছুই করার নেই। একমাত্র আমার বন্ধু বিমানের মত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া। আমার পাঠশালার সহপাঠী

বিমান যার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা তার বাড়িতে একটি লাইব্রেরি করেছিলাম। গোবরডাঙ্গা পোস্ট অফিসের পাশে তাদের বিরাট দোতলা বাড়ি। ছোট পরিবার। বিমানরা দুই ভাই। বিমানই বড়। যে বিমান পাঠশালায় টিফিন পিরিয়ডে একদিন আমাকে বলেছিল, তুই কী ফর্সারে! তোর সঙ্গে এক সুন্দর দেখতে মেয়ের বিয়ে হবে।

সেই বিমান একদিন গলায় দড়ি দিল। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। তাদের দোতলার বারান্দায় কড়ির কাঠে তার মৃতদেহটা ঝুলছিল।

কী দুঃখ ছিল, বিমানের তা আজও পর্যন্ত কেউ জানতে পারিনি। তবে সেদিন অনুভব করেছিলাম অনেক দুঃখ আছে যা কাউকে বলা যায় না। লোকে হয়তো ভাববে এটা কিছু নয়। খুবই সামান্য। কিন্তু দুঃখ যাকে বাজে সেই শুধু অনুভব করতে পারে। আর পনের বছর দুঃখ বাজবার বয়স।

এরপর সারাজীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শুধু শিখেছি কোন অপ্রাপ্তিই জীবনে ব্যর্থতা নয়। জীবন অনেক বড়। কোন জীবনকেই কখনও দুঃখ অভিমান ভরে শেষ করে দিতে নেই। কারণ তুমি জানো না তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। ধৈর্যই জীবন। জীবন যেন রহস্য রোমাঞ্চ ভরা গোয়েন্দা উপন্যাসের মত। দু পরিচ্ছেদ পড়েই কোন সিদ্ধান্ত করতে নেই। শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়। হয়তো আমি যেমন ভাবছি ঘটনাটা ঠিক তেমন নয়।

আমার ধারণা প্রত্যেকেরই জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি আছে। সেই স্বাভাবিক পরিণতির দিকেই সে এগিয়ে চলে। এজন্য ভাবতে হয় যা হচ্ছে তা নির্ধারিত বলেই হচ্ছে। যা হল না, তা প্রাপ্য নয় বলে হল না। হয়তো আরও কোন বড় প্রাপ্তির জন্য ছোটখাটো প্রাপ্তিতে বাধা পড়ল।

হতাশ হয়ে কোন লাভ হয় না। বরং ধৈর্য ধরে জীবনের দুনির্বার অপ্রতিরোধ্য অশুভ শক্তিগুলির সঙ্গে লড়াই করে যাওয়াটাই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা।

এসব উপলব্ধি আমার হয়েছিল অনেক পরে। তবে সেই মুহূর্তে আমি ভেঙে পড়লেও চরম একটা কিছু করে বসিনি, তা বোধ হয় আমার মায়ের কথা মনে করে। আমি না থাকলে, আমার মাকে কে দেখবে?

।। বারো ।।

দোকানদারি

বাবা প্রায়ই বলতেন, এবার একটা ব্যবসা করবো ভাবছি।

মা বলতেন ঃ ব্যবসা করার কথাতো সেই কাশীতে থাকার সময় থেকেই বলে আসছ।

সে সময় বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা হল না, দু-দুবার অসুখে পড়ে গেলাম। এবার ভাবছি একটা মুদিখানার দোকান দেব।

তুমি পুঁজি পাবে কোথায়?

বিমলকে আবার একটা চিঠি লিখেছি। যদি কিছু টাকা দেয়। ইস্টিশনের কাছে খাঁটুরার বিজয় রায়ের দোকান আছে। তা বিজয় বলছিল, তার পুঁজি ফুরিয়ে গেছে। যদি কিছু টাকা দাওতো শেয়ারে দোকানটা চালাতে পারি। বিমল যদি শ দুয়েক টাকা দেয় দেখি। তার আগে ভাবছি কলকাতা থেকে ডিম এনে গোবরডাঙ্গা বাজারে বিক্রি করবো—

তুমি বিক্রি করবে? বাজারে ডিম নিয়ে বসবে?

তা ক্ষতি কী?

না-না সে হয় না।

আমি শুনতে পেয়ে বললাম, আমি যদি বিক্রি করি?

তুমি ছেলেমানুষ তোমায় লোক ঠকিয়ে দেবে।

আমি বললাম—বাঃ, আমাদের গাছে কলা হয়েছিল। আমি বাজারে বসে কলা বিক্রি করিনি? এই তো রথের মেলায় পাঁপর ভাজার দোকান দিলাম।

একটা কিছু করে পয়সা উপার্জন করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন কিছুই যুৎসই দাঁড়াচ্ছিল না। রথের মেলা ও গোষ্ঠ বিহারের মেলায় বেগুনি আলুর চপ ও পাঁপর ভাজার দোকান দিয়েছিলাম। মায়ের কাছে বেসন ফেটিয়ে তার মধ্যে খাবার সোডা দিয়ে মচমচে বেগুনি ভাজার প্রণালী শিখে ফেলেছিলাম। কালীপুজোর সময় তুবড়ি তৈরি করে বিক্রি করেছি। সোরা গন্ধক ও কাঠকয়লার কিসের কতটা ভাগ তা জেনেছিলাম বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হাজার জিনিস বলে একটি বই থেকে। শতচ্ছিন্ন বইটি বাবার দেরাজ থেকে আমিই আবিষ্কার করেছিলাম।

ডিম নিয়ে বাজারে বসলাম সপ্তাহে দু-তিন দিন। অধিকাংশ খদ্দেরই ডিমের দিকে ঘেঁসল না। তবে কিছু ডিম বিক্রি হল। কিন্তু কলকাতা থেকে ট্রেনে করে আনা, বাড়িতে রাখা ও বাজারে নিয়ে যাওয়া ও অবিক্রীত ডিম ফেরৎ আনার ফলে বেশ কয়েকটি ডিম ফেটে গেল। কিছু ডিম পচে গেল।

এক সপ্তাহের মধ্যে এ ব্যবসা লাটে উঠল। শুধু উপকারের মধ্যে প্রতিদিনই ডিমের ওমলেট খাওয়া হয়ে গেল।

কিন্তু বাবার মাথায় আবার ব্যবসা করার ভূত চেপেছে। এবার আর এটা ওটা নয়, একেবারে রীতিমত চালু দোকানের শেয়ার কিনে ব্যবসা। আমি বাবাকে উৎসাহ দিলাম।

ঊষাপ্রসন্নর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবার একটা বড় কারণ ছিল ঊষাও আমার মত গল্প কবিতা লিখত। কবে থেকে আমি যে লিখতে শিখলাম তা মনে করতে পারি না। কেউ আমায় হাতে ধরে শেখায়নি। কেউ আমায় মাথার দিব্যি দেয়নি। আমার লেখার কোন তথাকথিত অনুপ্রেরণাও ছিল না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও লেখক হিসাবে কখনও মর্যাদা পাইনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখে চলেছি কোন অন্তরতমের নির্দেশে তা কে জানে!

যখন ক্লাশ থ্রিতে পাঁড় তখন নাটক দিয়ে লেখার হাতে খাঁড়ি। আমাদের ক্লাশে র‍্যাপিড রিডার ছিল— প্রাচীন কাহিনী। তাতে হরিশ্চন্দ্রের গল্প ছিল। সেই গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে যাত্রার দল তৈরি করেছিলাম। বলাবাহুল্য পাড়ার কচি কাঁচার দলই ছিল তার শ্রোতা।

ক্লাশ ফোরে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখতে শুরু করি— 'খুনে ডাকাত' বলে এক রোমহর্ষক উপন্যাস। ছেলেদের কাছে স্বরচিত বলে প্রমাণ করার জন্য আমি তাদের সামনেই খশ খশ করে লিখে যেতাম।

দুর্গাশঙ্করের নেতৃত্বে বিদ্যাসাগর ক্লাব লাইব্রেরী তৈরি হলে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একটা হাতে লেখা ম্যাগাজিন বার করতে। হাতে লেখা ম্যাগাজিনের একটা ট্র্যাডিশন ছিল। বরদাকান্ত পাঠাগারের উদ্যোগে বড়রা বার করেছিল আলো বলে একটি হাতে লেখা ম্যাগাজিন। উচ্চমানের পত্রিকা ছিল ওটি।

আমরা বার করলাম লিপিকা। একটি মাত্র সংখ্যাই বেরিয়েছিল। তাতে একটি বারোয়ারি উপন্যাসের প্রথম পর্বটি আমারই লেখা। পরের কিস্তি লেখার কথা ছিল অসিতের। অসিতের লেখার হাতও ভাল ছিল। অসিতের দাদা অনিল ভট্টাচার্য তখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত লেখক।

একদিন দুর্গা বলল — রাণুদির বিয়েতে একটা ছড়া লিখে দে তো।

রাণুদি দুর্গাদের পাড়ারই একটি মেয়ে। দুর্গার চেয়ে বয়সে পাঁচ ছ বছরের বড়। কিন্তু দুর্গার সঙ্গে খুব ভাব ওদের পরিবারের। দুর্গা তখন আমাদের হিরো। হিরো হবার জন্যই যেন সে জন্মেছে। ক্লাশে ফার্স্ট হয়। এন সি সিব সেকশন কম্যান্ডার। মুক্তোর মত হাতের লেখা। সুশ্রী চেহারা। ইস্কুলের ফুটবল টিমে অপরিহার্য গোলকিপার। আবার এন সি সি ক্যাম্পে গিয়ে সে একক নাচও কম্পোজ করে ক্যাম্প ফায়ার জমিয়ে দেয়। অনেক মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। আমাদের তখন কারও দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি। দুর্গা সে সময় এক একটি মেয়ের সঙ্গে তার যৌন অভিজ্ঞতার কথা বলত।

রাণুদির সঙ্গে অবশ্য তার ভাইবোনের সম্পর্ক। দুর্গা বলত— রাণুদিকে আমি দিদির মত দেখি। বিয়ে হয়ে রাণুদি শ্বশুর বাড়ি চলে যাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে রে।

আমি বলতাম, দুর্গা তোর এরকম কতদিদি আছে বলতো? নিরুপা রায় তোর দিদি—তুই এতদিন ধরে বলে আসছিলি না—

বোম্বের চিত্র তারকা নিরুপা রায় তখন প্রতিষ্ঠিতনায়িকা। দুর্গা কোথা থেকে তার একটা ফোটো যোগাড় করে আমাদের দেখিয়ে বলতো— নিরুপা রায় আমার দিদি। ছোটবেলায় বম্বে চলে গিয়েছিল। এখন বিরাট আর্টিস্ট। আমাকে নিয়মিত চিঠি লেখে। এই দ্যাখ ফোটো পাঠিয়েছে।

আমি বললাম ঃ এতদিন গুল মারছিলি। আমি ধরে ফেলেছি। আমি সিনে অ্যাডভান্সে পড়েছি নিরুপা রায় মারাঠি।

দুর্গা ভাঙে তবু মচকায় না। বলে— মারাঠিকে বিয়ে করেছে বলে লোকে ভুল করে ওকে মারাঠি বলে।

আমাদের এই লিপিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে ঊষার কোন যোগাযোগ ছিল না। আমাদের

গ্রামের মূলজীবন প্রবাহ থেকে জমিদাররা আলাদা। ওদের বাড়ির বউরা অন্দর মহলে থাকে। ছেলেমেয়েরা কেউ বাড়ির বাইরে যায় না। বাড়ির সংলগ্ন মাঠেই খেলাধুলো করে। ওদের বাড়ির ভেতরেও বাইরের ছেলেমেয়েরা ঢোকে না।

আমিই কীভাবে জানি না অন্দরমহলে ঢুকে পড়লাম। প্রতিদিন একবার করে মেজতরফে না গেলে মনে হয় জীবনটা বৃথা গেল। এ নিয়ে অসিতের মনে ক্ষোভ হত। বলত—তুমি জমিদারদের পা চাটা হয়ে গেছ।

আমি বললাম— ও কথা কেন বলছ ভাই। আমি তো সবার সঙ্গেই মিশি। আমি যে একজন লেখক হবো। লেখকদের সবার সঙ্গে মিশতে হয়।

বন্ধুদের মধ্যে সমর বলল—আহা কত বড় লেখক রে—

কিবণদার বাবা ক্ষিতীবাবু একদিন ধমক দিয়েছিলেন। বিকেলবেলা নাচঘরে বসে শিব্রাম রচনাবলী পড়ছিলাম। তিনি দেখে ধমক দিলেন—বিকেলে বসে বসে বই পড়া হচ্ছে। রবিবাবু হবে। যা — পালা। খেলতে যা।

মনের দুঃখে তিনমাস আর গেলাম না মেজতরফে।

ঊষা বলল—তুমি আর আসো না আমাদের বাড়ি।

আমি বললাম, এমনি আর আসা হয় না।

ঊষা বলল—আমার কবিতা বেরিয়েছে সাতসমুদ্দুরে। তোমায় পড়াবো। তুমি কী কিছু লিখলে?

আমি বললাম—ইস্কুল ম্যাগাজিনে আমায় ছাত্র সম্পাদক করেছেন হেডমাস্টার মশাই। আমি একটা গল্প লিখেছি—'সাপুড়ে।' ম্যাগাজিন বেরুলে পড়ে বোল কেমন হয়েছে।

ঊষা বলল—এসো না, আমরা নিজেরাই একটা পত্রিকা বার করি। আমি বড় বড় লেখকদের লেখা এনে দেব। অনিল ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দেবী, অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

ইন্দিরা দেবী ছাড়া সকলেই গোবরডাঙ্গার লোক। কিন্তু থাকেন কলকাতায়। হাসিরাসি দেবী ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও গোবরডাঙ্গার মানুষ। ইন্দিরা দেবী গোবরডাঙ্গা কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রভাবতী দেবী খাঁটুরার বাড়িতে এসেছেন শুনলেই আমি দেখা করতে যাই। তাঁর ভাইপো দীপঙ্কর আমার সমবয়সী। তাঁর সঙ্গে ভাব জমিয়েছি শুধু প্রভাবতী দেবীর সান্নিধ্য পাবো বলেই।

অনেকদিন ইচ্ছা করেছে একটা লেখা তাঁকে দেখাই। কিন্তু সঙ্কোচ হয়েছে।

একদিন দীপঙ্কর বলল—পিসীমা পার্থ আবার লেখেটেখে।

প্রভাবতী উৎসাহে জল ঢেলে দিলেন।

বললেন—আজকাল তো সবাই লিখছে। সবাই লেখক।

সমর বলেছিল, আমি চ্যালেঞ্জ করছি। লেখক হওয়া অত সহজ নয়। তুই লেখক হতে পারবি না।

আমি বললাম—আমিও চ্যালেঞ্জ করছি। আমি বড় লেখক হবই।

সমর ও অন্যান্য বন্ধুরা বলল—তাহলে বাজি ধর। একটা কাগজে লেখ যদি বড় লেখক না হতে পারিস তাহলে?

আমি বললাম—তাহলে তোদের দশ টাকা দেব। এই আমি লিখে দিলাম।

ওই দশটাকার বাজি হেরেছি। সত্যি আমি বড় লেখক হতে পারিনি।

অনেকে বলে—আমার উদ্যম আছে, কিন্তু প্রতিভা নেই।

ওই উদ্যমশক্তির জোরেই বিদ্যার্থী পত্রিকা বেরিয়েছিল, তখন আমি ক্লাশ নাইনে পড়ি। ঊষা ও আমি যুগ্ম সম্পাদক। লেখক সূচিতে ছিলেন প্রভাতকিরণ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, অনিল ভট্টাচার্য, অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

বিদ্যার্থীর ফান্ড যোগাড় করা হল রথের মেলায় ম্যাজিক শো করে। শুনেছিলাম মেদিয়া কলোনীতে একজন ভাল ম্যাজিসিয়ান থাকে। খুঁজে খুঁজে তার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

গোবরডাঙ্গার আশেপাশে বিরাট উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠেছিল। মেদিয়া তার মধ্যে একটি। আসলে মেদিয়া বামোড়ের উপর একটি দ্বীপ—নদী বাঁ দিকে মোড় নিয়ে কঙ্কনের মত এক বিরাট চরকে ঘিরে দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। কঙ্কনের মত দেখতে বলে দ্বীপের নাম ছিল কঙ্কনা। সেই ধূ ধূ চরায় এতদিন শুধু তরমুজ চাষ হত। সেই চরার উপর করগেটের ছাদ আর চাঁচের বেড়া দেওয়া সারি সারি বাড়ি। বেশ কিছুকাল তারা শুধু তাঁবু করে ছিল। তারপর সরকার থেকে টিন আর দরমার বেড়া পেয়ে বাড়ি করেছে ছিন্নমূল শরণার্থীরা।

ম্যাজিসিয়ানকে খুঁজে বার করলাম এই রকম একটি বাড়ি থেকে। বছর পঞ্চাশেক বয়স। মাথার চুল পাকা। রোগা পোড় খাওয়া চেহারা। বিভিন্ন ইস্কুলে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ান। তাঁর নর রাক্ষসের খেলা খুব নাম করেছিল। স্টেজে তিনি একটি জ্যান্ত পায়রা কামড়ে খেয়ে থাকেন।

ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে কথা হল।

ম্যাজিশিয়ান শো করতে রাজি। তবে তাঁর শর্ত : যা টিকিট বিক্রি হবে তার অর্ধেক তাঁর। অর্ধেক আমাদের।

আমরা রাজি হলাম।

ম্যাজিশিয়ান বলেলেন, তোমরা শুধু স্টেজটা করবা। আর কয়েকটা পায়রা ধরিয়া রাখবা। খাইতে লাগবো।

ম্যাজিক শো-এর আগের দিন আমি ঊষা ও তাদের কয়েকজন কর্মচারী মিলে পুজোর দালান থেকে গোটা কয়েক পায়রা ধরলাম। যত সহজে লিখছি কাজটা তত সহজে হয়নি। পায়রারা যখন উড়ে এসে খুব কাছে ঘোরাঘুরি করে তখন তাদের যত সহজে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় তত সহজে পাওয়া যায় না। হাত বাড়ালেই তারা মুহূর্তের মধ্যে দূরে সরে যায়। বহু চেষ্টা করে গোটা চারেক পায়রা ধরা হল।

পুজোর দালানে স্টেজ হল। সতরঞ্জি বিছিয়ে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হল।

চারটে শো-এর মত পায়রা মজুতই ছিল। আমি ম্যাজিসিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—চার চারটে পায়রা খেতে পারবেন?

ম্যাজিসিয়ান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন—আমি তো মেডিসিন দিয়া খাই। প্রথমে মেডিসিন মুখে দিয়া নিতে লাগে। তারপর চার পাঁচটা কেন, আমার সর্বোচ্চ রেকর্ড এক ডজন পর্যন্ত এক দিনে খাইছি।

সত্যি সত্যি তিনি একই দিনে এক ঘণ্টা অন্তর চারটি শো-এ নররাক্ষস সেজে চারটি পায়রা ভক্ষণ করলেন। নররাক্ষসকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত। চারজন লোক তাকে ধরে থাকত। পাছে তিনি পায়রা খেতে খেতে নরখাদক হয়ে ওঠেন। নররাক্ষস দেখবার জন্য প্রতিটি শোয়ে উৎসাহী দর্শকের অভাব হল না।

ম্যাজিক শো থেকে প্রায় দুশো টাকার মত উঠল।

লেখাও এসে গেছে। ঊষার চিঠিতে সব লেখকই লেখা দিয়েছেন। অপূর্বকৃষ্ণ দিয়েছেন একটি কবিতা। অনিল ভট্টাচার্য পাঠিয়েছেন কোণার বাঁধের উপর একটি ভ্রমণ কাহিনী কিরণদা একটা লেটারিং করে দিলেন। এইবার ছাপার পর্ব।

গোবরডাঙ্গায় কোন ভাল ছাপাখানা নেই। হাবড়া ও দক্ষিণ চাতরায় ট্রেডল মেশিন আছে কিন্তু তা দিয়ে বড়জোর লিফলেট ছাপা যায়। সেখান থেকে লিফলেট ও বিজ্ঞাপনের রেট কার্ড ছাপা হল। বিজ্ঞাপনের জন্য দোকানে দোকানে ঘুরলাম। কিন্তু ছোট ছোট দোকানের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ নেই। তবুও গোটা দশেক টাকার বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল।

গৈপুরের রবীন বসু বলে এক ভদ্রলোক কলকাতায় বাগমারিতে একটি প্রেসে কাজ করতেন। তাঁর কাছে যেতেই তিনি প্রেসের ঠিকানা দিলেন। বললেন—ম্যাটার নিয়ে চলে এসো। তোমাকে প্রেসের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

সেভেনে উঠেই একা একা কলকাতা যেতে শিখেছি। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবেই হ্যারিসন রোড ধরে বেড়াতাম। ম্যাটিনি শো এ সিনেমা দেখতাম। কলকাতা আমার কাছে অবাক বিস্ময়। কলকাতার রাস্তা দোকান লোকজন, বাস ট্রাম সব কিছুর মধ্যে যেন মায়া লাগানো।

মানিকতলা ব্রিজের ওপারে বাগমারি। উল্টোডাঙ্গার দিকে তখন শুধু জলা জমি। পুকুরের পর পুকুর। ধোপারা কাপড় কাচছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বস্তির পর বস্তি। শুয়োর চরছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়।

বাগমারিতে এসেই পথ শেষ হয়ে গেছে। ডান দিকে বেলেঘাটা আবার জমজমাট পাড়া।

জিজ্ঞাসা করে করে আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে সাতকড়ি মিত্র লেনে এক বিশাল কমপাউন্ড দেওয়া বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম। লেখা অ্যাবকোজ ল্যাবরেটরি। দারোয়ানকে বলতে সে আমায় একটি ঘরে বসালো। কিছুক্ষণ পরে রবীনদা এলেন।

ঃ এসে গেছ? কোন ট্রেনে এলে?

ঃ ফোর্থ ট্রেনে।

ঃ আমি সেকেন্ড ট্রেনে চলে আসি। চলো, তোমায় প্রেসটা দেখাই।

আমি বললাম— ল্যাবরেটরিটা কী ব্যাপার?

ঃ ল্যাবরেটরিটা হল কর্তার মেন বিজনেস। এখানে নানা ধরনের ওষুধ তৈরি হয়। কিন্তু প্রেসও কম বড় নয়। চলো দেখবে চলো।

রবীনদা আমায় নিয়ে গেলেন। একটা বিরাট শেডের নিচে কম্পোজিং রুম। সারি সারি বাক্সের সামনে লোক কম্পোজ করছে।

রবীনদা বললেন—এক একজন কম্পোজিটরের সামনে চারটে করে বাক্স থাকে। দুপাশে দুটো। আর সামনে দুটো। প্রত্যেক বাক্সে ছোট ছোট খাপ করা। প্রত্যেকটা টাইপের জন্য এক একটা খোপে।

আমি বললাম—এই যে ওঁরা পটাপট অক্ষর তুলে সাজাচ্ছেন, কী করে বুঝছেন কোন খোপে কোন অক্ষর?

রবিনদা বললেন—এটা ওদের প্রথমে মুখস্ত করে নিতে হয়। টাইপ রাইটারে যেমন কোন আঙুলে কোন অক্ষর পড়বে তা মুখস্ত করতে হয়। তারপর সেটা অভ্যাস হয়ে যায়, এও তাই।

অক্ষর সাজানো হয়ে গেলে সেগুলোকে এক একটা মেটালের প্লেটে বেঁধে রাখা হয়। যেমন যেমন পাতার সাইজ হবে, অক্ষরগুলো তেমন তেমন সাইজ অনুসারে রাখা হবে। গ্যালির ওপর বুরুশ দিয়ে কালি বুলিয়ে তার ওপর ভিজে কাগজ দিয়ে চাপ দিলেই প্রুফ বেরিয়ে আসে। এইবার প্রুফ কারেকশান করে কপি প্রেসে দিলে, সেই অনুসারে টাইপ কারেকশান হয়। এরপর হয় মেক-আপ। অর্থাৎ পাতার মাপ অনুসারে ম্যাটার সাজিয়ে, ভেতরে ছবি থাকলে ছবির ব্লক বসিয়ে কমপ্লিট মেক আপ করা ম্যাটারের নাম স্টোন। স্টোন থেকে ছাপা হয় ফ্ল্যাট বেড মেশিনে।

গোটা দিন ধরে ছাপাখানার জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তখন কে জানত এই ছাপাখানার সঙ্গে পরোক্ষভাবে আমাকে সারাজীবন যুক্ত থাকতে হবে। সাতকড়ি মিত্তির লেনের প্রেসে একদিন সারা রাত কাটিয়েছি। সেদিন ম্যাটার ছাপা হবে। প্রুফ কারেকশান হয়ে ম্যাটার প্রেসে দিতে দিতে রাত হয়ে গেল। মালিকের সঙ্গে আলাপ হল তাঁকে সবাই ডাক্তারবাবু বলে ডাকে।

ডাক্তারবাবু বললেন—আজ রাত্তিরটা থেকে যাও। দ্যাখো, রাতের বেলায় কেমন করে প্রেসের কাজ হয়।

রাত নটা পর্যন্ত কম্পোজ করা দেখলাম। প্রুফ কারেকশান শিখলাম। সেই কপি দেখে কম্পোজিটররা সেগুলো কারেক্ট করল। তারপর রাতের খাবার ডাক পড়ল। জনত্রিশেক কর্মচারী মাটিতে খেতে বসল সারি সারি। ঠিক যেন কোন কাজের বাড়ি। ভাত মাছ তরকারি। সবাই পেট পুরে খেল।

রাত এগারটা নাগাদ আমাকে একজন বলল—তুমি টেবলে ঘুমিয়ে পড়তে পারো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—রাতে আমাদের ম্যাটার ছাপা হবে না?

ঃ সে হতে হতে রাত দুটো তো বাজাবে।

ঃ বাজুক। আমি ছাপা না দেখে ঘুমোচ্ছি না।

সন্ধ্যা থেকেই পর্যায়ক্রমে দু-তিনটি ছাপা মেশিন ক্রমাগত ছেপে চলেছে। রাত আড়াইটে নাগাদ বিদ্যার্থীর ম্যাটার প্রেসে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ছাপা হয়ে যেতে লাগল আমাদের কৈশরক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন। আমাদের এতদিনকার শ্রম বা কঠোর পরিশ্রমে যা অর্জিত।

একটা অস্ফুট গোঙানির মত আওয়াজ তুলে মেশিনটা পাতার পর পাতা ফর্মাগুলি ছেপে যাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি একটি ফর্মা তুলে পড়তে শুরু করে দিলাম ঃ প্রভাতকিরণ বসুর শুভেচ্ছা ঃ

তোমাদের পত্রিকায়
আমি কি লিখিব হায়
মনে কই সবুজের আভা?
অবুঝ ছেলের দল
করো করো কোলাহল
চলে যাও সুমাত্রা জাভা
আফ্রিকা এশিয়া আর ইউরোপ
ঘুরে এসে বার করো
খাঁটি বার সোপ।

প্রেস থেকে ছাপা লুজ ফর্মা কাগজে জড়িয়ে পরদিন দুপুরে বাড়িতে ফিরতেই প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা হল।

বাড়ি ফিরতে কোনদিন দেরী হলেই বাবা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। আমার জন্য তাঁর টেনশন হত। তাঁর আশংকা ছিল শত্রুরা যে কোনও সময় আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য অনেক সময় তিনি নিজে আমাকে খুঁজতে যেতেন। সেদিন আমাকে দেখে ধমক না দিয়ে বললেন— কোথায় ছিলে কাল রাতে? আমি শুধু মা কালীকে ডাকছি। শিগ্রী যাও তোমার মা তো আধমরা হয়ে রয়েছেন।

আমি মিথ্যে কথা বললাম— কাল রাতে ট্রেনে ফেল করেছিলাম বাবা।

বাবা বললেন, ঠাকুর আছেন। আমার মন বলছে খারাপ কিছু হয়নি। এভাবে একা একা কলকাতা যেও না আর। আর শোন একটা ভাল খবর আছে। বিজয় রায়ের মুদি দোকানের শেয়ার কিনেছি। কাল থেকে ওই দোকানে আমি বসব।

সত্যি? আমি খুব খুশি হলাম।

আমি বললাম, বাবা, আমিও রোজ যাবো দোকানে।

ঃ তোমার তো ইস্কুল আছে।

ঃ ইস্কুলের কাছেই তো বিজয়কাকুর দোকান। ইস্কুল থেকে ফেরার সময় আমি দোকানে বসব দু-এক ঘণ্টা।

বাবা বললেন, তা বসতে পারো।

মায়ের সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখে তিনি বাবার মত উচ্ছ্বসিত হলেন না। আপন মনে বসে তরকারি কাটতে লাগলেন।

আমি বললাম, কাল রাতে ট্রেন ফেল করে শিয়ালদা স্টেশনে সারারাত বসেছিলাম মা।

মা নির্বাক।

আমি বিদ্যার্থীর খোলা ফর্মা ভরতি প্যাকেটটা আলমারিতে রেখে বললাম, আমার দরকারি কাগজ রইল কিন্তু। ভাইবোন কেউ হাত দিলে আমি আস্ত রাখব না।

মা তবু নির্বাক।

আমি পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বললাম—ভাল খবর পেলাম। বাবা বিজয় রায়ের দোকানের শেয়ার কিনেছে। এতদিনে আমাদের দুঃখ ঘুচল।

মা এবার কথা বললেন, হ্যাঁ দুঃখ তো ঘুচলই। এতদিন এত নির্যাতন, গালাগাল সত্ত্বেও মাথার ওপর ছাদটুকু তবু ছিল। এবার সেটাও যেতে বসল।

তার মানে?

মা ছল ছল চোখে বললেন— দোকানের পুঁজি যোগাড়ের জন্য তোমার বাবা শেষ পর্যন্ত এই বাড়িটা বাঁধা রেখেছে।

গোবরডাঙ্গা স্টেশনের সামনে মুদির দোকানটি যেমন রমরম করে শুরু হয়েছিল ছ'মাসের মধ্যে তেমনি সমান গতিতে ফেল পড়ার উপক্রম হল। দোকানে কোন কর্মচারী ছিল না। কখনও বাবার বন্ধু বিজয় রায়, কখনও বাবা, কখনও কখনও আমি পালা করে বিক্রীর জন্য বসতাম।

মুদিখানার দোকানদারির সবচেয়ে বড় কলাকৌশল, সার সারি সাজানো সমান মাপের বন্ধ কৌটোর মধ্যে কোন জিনিস আছে তা না দেখে বার করে দেওয়া। কেউ হয়তো দশ পয়সার জিরে চাইছে। কেউ বা চাইছে পাঁচ ফোড়ন। পাশেই ব্যসন আর ছাতুর কৌটো। আমাকে ঠিক ব্যসনের কৌটোটাই টেনে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত কিছু জিনিস আছে ওজন না করে আন্দাজে দিতে হবে। যেমন পাঁচফোড়ন, গরম মশলা। তেলের টিন থেকে বাটি করে তেল ওজন করে বোতলে ঢালতে হবে অথচ শিশির বাইরে একটুও তেল লাগবে না।

এর আগেই আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ কিনে ঠোঙা তৈরির ব্যবসা শুরু করেছিলাম। আমার ভাই এ ব্যবসায় এমন উৎসাহী হয়ে উঠল যে সে পাঠশালার পড়া ছেড়ে ঠোঙা তৈরি করতে লাগল আমিও খুব আক্লেশে আড়াইপো, আধ সের এক সের ঠোঙা তৈরিতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম।

এইবার মুদিখানার দোকানদারিতে রপ্ত হয়ে খুব আত্মবিশ্বাস এসে গেল। তা ছাড়া দু-তিন ঘণ্টা দোকানদারি করতে পারলে অন্তত চার আনা আট আনা সবার অলক্ষ্যে পকেটে চালান করে দেওয়া যায়। এর ফলে যে আমার পকেটে একদা একটা পয়সা

থাকত না, সেই পকেট সব সময় ঘুগনি, ওমলেট খাওয়ার মত সিকি-আধুলিতেঝনঝন করতে লাগল।

কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে পুঁজি ফুরিয়ে গেল। এজন্য বাবা ও বাবার বন্ধু বিজয় রায় পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলেন। তাঁরা নাকি হাত বাক্স থেকে ইচ্ছামত টাকা সরিয়ে কোম্পানিটাকে ডকে তুললেন।

একদিন দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বলে দিলেন, যা গেছে, গেছে ওই লোকের সঙ্গে আর ব্যবসায়ে যাবো না। না খেয়ে থাকতে হয় সেওভি আচ্ছা। বিজয় রায় বললেন ঃ তুমি যে টাকা দিয়ে ছিলে ওতে চলবে না। আরও টাকা দিতে হবে। নয়তো সরে পড়ো।

বাবা চিঠি লিখতে বসলেন বিমলদাকে, বাবা বিমল, অনেক আশা করিয়া বাড়ি বন্ধক দিয়া দোকান দিতে গিয়াছিলাম। সে ব্যবসায়ে প্রতারিত হইয়াছি। এখন দেনার দায়ে বাড়িটিও যায়। এই বিপদে তুমি না দেখিনে আর কে দেখিবে?

কলকাতা কমলালয়

এর ক'দিন পরে বাবা কলকাতা থেকে ফিরে মাকে বললেন—ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। কালীর একটা হিল্লে হয়ে গেল।

মা বললেন ঃ কী হল?

বাবা বললেন ঃ পঙ্কজদার বড় মেয়ে শোভনা আর তার বর শচীনের সঙ্গে দেখা হল পঙ্কজদার বাড়ি। কথায় কথায় কালীর কথা উঠল। জিজ্ঞাসা করল, কী করছে। আমি বলসাম ও ক্লাশ নাইনে উঠবে এবার। পড়াশোনায় মাথাও ভাল। আর ইচ্ছেও আছে। কিন্তু কী করব, জমিদারি চলে যাওয়ায় টাকা পয়সা হাতে নেই। পড়ার খরচ চালানোই মুশকিল হয়ে পড়ছে। তা শচীন শুনে বলল—কাকা; আমার কোন ছেলে নেই। কালীকে আমার কাছে পাঠান। আমরা ওকে বাড়িতে রেখে পড়াবো। তুমি তো জানো, শিবপুরে ওদের বিরাট বাড়ি। বিশাল অবস্থা। শচীন নিজেও উকিল।

বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী যাবে কলকাতায়?

আমি বললাম—হ্যাঁ। আমি তো এক পায়ে খাড়া। মায়েরও আপত্তি হল না। তারিখও ঠিক হয়ে গেল। আর দশ দিন পরেই বাবা আমায় হাওড়া শিবপুরে রেখে আসবেন। নাইন থেকে আমি হাওড়ার স্কুলে ভর্তি হবো।

ঊষাকে বললাম—আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি ভাই।

ঃ তাহলে বিদ্যার্থীর কী হবে?

ঃ বিদ্যার্থীর পরবর্তী সংখ্যা বেরুনো খুব মুশকিল। প্রথম সংখ্যাই বিক্রি হয়নি। চার আনা দাম তাও কেউ কিনতে চাইছে না। কলকাতার কয়েকটি স্টলে দিয়ে এসেছি। কলকাতায় গেলে একদা আমি তদারক করব। কিন্তু পরের সংখ্যার টাকা কোথায় পাবো ভাই?

ঊষা বল, ফান্ডে ত্রিশ টাকার মত পড়ে আছে। ওতে কী হবে?

আমি হতাশ হয়ে বললাম। না, ওতে কিছু হবে না।

উষা বলল ঃ তাহলে বিদ্যার্থী বেরুবে না?

কিন্তু আমাকে আবার ডাক দিয়েছে কলকাতা।

কলকাতায় যাওয়ার স্বপ্নে আমি বুঁদ হয়ে রইলাম। আমার মনে হতে লাগল, কলকাতাতেই আমার মুক্তি। কলকাতা গেলেই আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

ক্লাশেব সবাইকে বলে দিলাম, নতুন ক্লাশে আমি আর আসছি না। আমি কলকাতায় গিয়ে ভর্তি হবো।

সবাই সমীহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আমাকে।

কিন্তু আমার কলকাতায় যাওয়া হল না। যাবার জন্য যখন জামা কাপড় গুছিয়ে অপেক্ষা করছি ঠিক সেই সময় বাবার নামে একটি পোস্টকার্ড এল।

শ্রীচরণেষু কাকাবাবু।

কালীকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর আমাদের এখানে আনিবার জন্য বলিয়াছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু পারিবারিক অসুবিধা দেখা দেওয়ায় প্রস্তাবটি আপাতত স্থগিত রাখিতে হইতেছে। এ সম্পর্কে সাক্ষাতে বিস্তারিত কথা বলিব। আপনি ও কাকীমা প্রণাম নিবেন। কালীকে বলিবেন সে যেন কষ্ট না পায়। ঠিক সময় তাহাকে আনিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি শোভনা।

আমি স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেলেও তা নিয়ে বেশিদিন মন খারাপ করে থাকতে পারিনি।

ক্লাশ নাইনে উঠে আবার যথারীতি ক্লাশ শুরু করে দিলাম।

ছোট পিসীমা বাবাকে বললেন— ছেলেকে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছ তাতে কী হাত পা গজাবে? বোঁজ আর কতদিন তোমাদের সংসার টানবে!

বাবা বলেছিলেন, চাকরি বাকরি আর কোথায় পাবে দিদি—অতটুকু ছেলে। এখন তো সবে ক্লাস নাইনে উঠল।

অতটুকু আবার কী? পিওনের চাকরি পেতে ক্লাশ এইটের বিদ্যেই যথেষ্ট।

টুটুকে বলো, ওদের অফিসে ঢুকিয়ে দেবে।

মা শুনে বলেছিলেন, চাকরি তো সারা জীবন আছেই। আর দুটো বছর অন্তত পড়ুক। ম্যাট্রিকটা পাশ করুক।

বাবার মনঃপুত হল না। পিসীমার কথাকে আমল না দেওয়ার জন্য বাবাকেই কথা শুনতে হবে।

কিন্তু বাবার কথার আমল না দিয়ে মা বললেন, পড়া চালিয়ে যেতে।

ততদিন পর্যন্ত সাহিত্য, থিয়েটার, আড্ডা আর কিছু পয়সা রোজগারের জন্য টিউশ্যনি করেই বেশির ভাগ সময় কেটে যাচ্ছে।

এবার ভাবলাম পড়াশোনায় বেশি করে মন দিতে হবে। কিন্তু ইংরাজী ভাষাটা কিছুতেই সড়োগড়ো হয় না। বানান, টেন্স গুলিয়ে ফেলি। টেস্ট পেপার দেখে

ট্র্যানস্লেশেন গ্রামার মুখস্ত করার চেষ্টা করি, মুখস্ত হয় না।

তবে সবচেয়ে কঠিন লাগে অঙ্ক। কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।

আমার কোন প্রাইভেট টিউটর নেই। বাবার অনুরোধে আমাকে বিনা পয়সায় পড়াতে রাজি হলেন আমাদের ইস্কুলের ক্লার্ক সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

এই একটি ব্যতিক্রমী মানুষের সান্নিধ্যে এলাম। ম্যাট্রিক পাশ করে বহু চাকরি করার পর স্কুলে কেরানীর চাকরিতে ঢুকেছিলেন। কিন্তু থেমে থাকেননি। প্রাইভেটে এম. কম পাশ করে পরবর্তী কালে সুরেন্দ্রনাথ কমার্স কলেজের লেকচারার হয়েছিলেন। যে কোন অঙ্ক মিনিটের মধ্যে করে দিতে পারতেন। অঙ্ক শেখাবার পদ্ধতিও ছিল সহজ-সরল।

তাঁর টিউশ্যনির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের মধ্যে। ফলে ভোর পাঁচটা থেকে তিনি পড়াতে বসতেন। আবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত টিউশ্যনি চলত। টিউশ্যনির টাকায় তাঁর পৈত্রিক দুই কামরা থেকে দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

সত্যরঞ্জনবাবুর আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আমার মনে হল, আমি অঙ্কে পাশ করতে পারব না। আমাদের মাস্টারমশাইরা আমাদের ক্লাশের পাঁচজন ছেলেকে চিহ্নিত করেছিলেন—এরা অঙ্কে অন্তত পঞ্চাশ তুলতে পারলে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবেই।

কিন্তু ত্রিশ পাওয়াই আমার কাছে দুরাশা। অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে আরও বুঝতে পারলাম আমার পাশ করার কোন চান্সই নেই।

তখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নামে খামে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালাম।

মহাত্মন,

আমি এক গরীবের সন্তান। এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছি। কিন্তু অঙ্কে বড় খারাপ করিয়াছি। মনে হয় ফেল করিতে পারি। কিন্তু আমি এবৎসর পাশ করিয়া চাকরি না করিলে আমার পরিবার জলে ভাসিবে। আমার জীবনেও অভিশাপ নামিয়া আসিবে। অতএব মহাত্মন, আপনি আমার মত অভাজনকে কিছু গ্রেস দিয়া যদি পাশ করাইয়া দেন তাহা হইলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ইতি ঃ

.....

॥ তেরো ॥

কল্যাণী কংগ্রেস

ভগবান বুদ্ধ বলতেন, যে কোন ঘটনাই পরবর্তী ঘটনাকে প্রভাবিত করে। বর্তমান যেমন অতীতের কার্যেরই কারণ, তেমনি বর্তমানের মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের বীজ। ক্লাশ টেনে পড়ার সময় যদি কল্যাণীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে না যেতাম তাহলে পরবর্তীকালের আমি হয়তো তৈরিই হতাম না।

কল্যাণী কংগ্রেস হয়েছিল ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে। এক বছর থেকেই সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছিল। শুনলাম ওইবার কল্যাণীকে কংগ্রেসের জন্য কিছু সেবাদল সদস্য রিক্রুট করা হবে। আমি তাদের দলে নাম লেখালাম।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কিছু সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আমি ও বাবা কংগ্রেস প্রার্থী জিয়াউল হকের হয়ে খাটাখাটি করেছি। লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন, অরুণ চন্দ্র গুহ। তিনি পরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। এরপর সম্ভবত ১৯৫৩ সালে বারাসতে ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। আমি সেবাদলের ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছিলাম। ওই অধিবেশনে প্রথম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রফি আহমেদ কিদোয়াইকে দেখি। প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের বক্তৃতাও তখন শুনি। তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়। ছিপছিপে সুপুরষ চেহারা। মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখি সেই প্রথম প্রথম। তখন তিনি তন্বী তরুণী। দাড়িওয়ালা এক রাগী যুবকের বক্তৃতা খুব ভাল লাগে। তাঁর নাম স্মরজিৎ ঘোষাল।

সেই সূত্রে কল্যাণী কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার এক হক হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া শুনেছিলাম এই অধিবেশনে যোগ দিলে খদ্দরের ইউনিফর্ম ও দুবেলা খাওয়া পাওয়া যাবে। বাইরে থেকে একজন ট্রেনার এল। সে রোজ বিকেলে মেজ তরফের মাঠে আমাদের সেবাদলের প্যারেড শেখাত।

দিন সাতেক ট্রেনিং নেওয়ার পর আমাদের বলা হল হালিশহরে জেলা শিবিরে যোগ দিতে। সেখান থেকে আমরা কল্যাণী যাবো।

গোবরডাঙ্গা থেকে আমাদের এক সহপাঠী এই দলে সঙ্গী ছিল। তার নাম নীলরতন ঘোষ —নীলু। তাদের বাড়ি পাশের গ্রাম ঘোষপুরে। জাতিতে গোয়ালা। জাতের কথা তুললাম এ কারণে যে কাঁচরাপাড়ায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ি ভাত খেয়েছিলাম। সেই প্রথম কোন অব্রাহ্মণের বাড়ি ভাত খাওয়া। আমরা ছোট বেলা থেকে এটা শিখেছিলাম যে ব্রাহ্মণদেব ব্রাহ্মণেতর বাড়িতে ভাত খেতে নেই। আমার দাদামশাই অন্য জাতির শিষ্যবাড়ি রাত্রিবাস করতেন কিন্তু স্বপাক আহার ক তন। প্রথম কুলপ্রথা লঙ্ঘন করে অব্রাহ্মণের বাড়ি অন্নগ্রহণ করতে বেশ বাধো বাধো ঠেকছিল।

এখন আমি মনে করি না ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ধর্ম লুকিয়ে থাকে। আমার ছেলেমেয়েরা কেউ জাতিভেদ মানে না। যদি মণ্ডল কমিশন না হত জাত কাকে বলে তাও জানত না।

হালিশহরে গঙ্গার ধারে একটি বাড়িতে আমরা প্রায় শ'খানেক ভলান্টিয়ার ছিলাম। এখানে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলিকে প্রথম দেখি। তিনি পতাকা উত্তোলন করতে এসেছিলেন। তারপর দিনই শুনলাম আচমকা হৃদরোগ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

শিবির জুড়ে শোকের গভীর ছাড়া নেমে এল। বিপিনদার শোকসভার আয়োজন করা হল। কংগ্রেস পতাকা অর্ধনমিত রাখা হল।

হালিশহর থেকে মিছিল করে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কল্যাণী গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

কল্যাণী তখন সবে তৈরি হয়েছে। রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর দোর সব নতুন। সারা শহর আলোয় আলো। আর চারিদিকে প্যান্ডেলের পর প্যান্ডেল। এরকম একটি প্যান্ডেলের নিচে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। মাটিতে বিচালির উপর সতরঞ্জি পেতে তার ওপর বিছানা।

কল্যাণী কংগ্রেস ছিল এ যুগের রাজসূয় যজ্ঞ। ভলান্টিয়ার, ডেলিগেট, অবজারভার কর্মকর্তাদের নিয়ে হাজার হাজার লোকের জন্য রোজ দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ছিল দু'বেলা চা-জল খাবারের ব্যবস্থা।

থালা গেলাস নিয়ে কিউতে দাঁড়ালে ভাত ডাল আর আলু কপির ঘ্যাঁট মিলত। ব্রেকফাস্টে হালুয়া আর চা।

ওই খাওয়ার কিউতে প্রফুল্ল সেনকে দেখতাম। সকলের সঙ্গে বসে খেয়ে আবার থালা বাসন ধুয়ে রাখছেন। এই গান্ধীবাদী আচরণ নিষ্ঠার জন্য প্রফুল্লদা বিখ্যাত ছিলেন। স্বাধীনতার আগে তাঁকে লোক বলত আরামবাগের গান্ধী।

আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল নেহরুকে কাছ থেকে দেখা। একদিন সুযোগ হয়ে গেল। প্রকাশ্য অধিবেশনে নেহেরু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বকসি গোলাম মহম্মদ ভাষণ দিলেন। ওই সভায় আমার ডিউটি পড়েছিল স্টেজের খুব কাছে। একেবারে সামনে থেকে নেহরুকে দেখলাম।

সেই সভায় দাবি উঠল তাঁরা নেহেরুকে কাছ থেকে দেখতে চান। নেহরু বললেন, তোমরা চুপ করে যে যার জায়গায় বসে থাকো, আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। এই বলে নেহরু মঞ্চ থেকে নেমে গোটা জনতার সামনে দিয়ে একবার ঘুরে এলেন। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করে বসে রইল।

শেখ আবদাল্লা তখন অপসারিত ও বন্দী। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মহম্মদ গোলাম বকসি। ছোটখাট চেহারার মানুষটি। মাথায় কাশ্মীরী টুপি। তিনি বক্তৃতায় বললেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

ওই কংগ্রেস অধিবেশনের একটি আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল প্রদর্শনী। ভলান্টিয়ারের সংখ্যা এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের প্রায় দিনই কোন কাজ থাকত না। আমরা খদ্দরের হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরে মাথায় গান্ধীটুপি দিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতাম, আমার পছন্দসই জায়গা ছিল প্রদর্শনী। ওই প্রদর্শনীতে একটি বই-এর স্টল দেখলাম। খুব শস্তায় রাজনৈতিক বই বিক্রি হচ্ছে। একটি মোটা বই-এর নাম পরাভূত দেবতা। লেখক তালিকায় ছিলেন, আদ্রেজিদ, আর্থার কোয়েসলার, ইগনোসিও সিলোন আরও অনেকে। এঁদের নাম আগে শুনিনি। জানলাম এঁরা সব ডাকসাইটে লেখক, বুদ্ধিজীবী। এদের মধ্যে আদ্রেজিদ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁরা সবাই একদা কম্যুনিস্ট ছিলেন। পরে মেহভঙ্গ হয়ে কম্যুনিজম ছেড়ে দিয়েছেন।

আমি ওই স্টল থেকে পরাভূত দেবতা ও আরও কয়েকটি বই কিনলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বড় হয়ে উঠেছি। কিছু রাজনৈতিক চেতনা জন্মেছে। কংগ্রেসের ইলেকশনে কাজ করেছি। নিজেকে কংগ্রেসী ভাবতে শিখেছি। রাজনীতি সম্পর্কে সেই

বয়সে আগ্রহ জন্মেছিল।

কিন্তু গোবরডাঙ্গা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির ঘাঁটি। মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশ পার্টির সক্রিয় কর্মী। আমাদের সাবেক বাড়ি দেওয়ানজি বাড়ির পাশেই গণেশওয়ালা বাড়ি বলে খ্যাত একটি বাড়ি ছিল। বাড়ির সবাই কম্যুনিস্ট। বাড়িটি পার্টির ছেলেদের ঘাঁটি। আমিও ছোটবেলা থেকে ওই বাড়িতে যেতাম। কিন্তু আমি কংগ্রেসের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়ে ছিলাম। কোন মানুষই বুঝেশুনে প্রেমে পড়ে না বা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে না। ওটা অজান্তে হয়ে যায়। দুভাই দটো দলের সক্রিয় সদস্য আকছার দেখেছি। কিন্তু সে সময় কংগ্রেসীরা কম্যুনিস্টদের ঘৃণা করত না। বরং নেহরু প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট ছিলেন। তিনি হিন্দি-চিনি ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। রাশিয়া ভারতের বন্ধু। এ কারণে কম্যুনিস্টরা নেহরুকে পছন্দ করত।

কিন্তু ওই কম্যুনিস্ট বিরোধী বইগুলি পড়ে সেই বয়সেই আমার কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মে গেল।

এই সব বই এর প্রকাশক এশিয়ার স্বধীনতা সংরক্ষক সমিতি।

এশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষক সমিতি কারা? কেন তারা খামাকা এই সব বই বার করতে গেল, অতশত প্রশ্ন আমার কিশোর মনে জাগেনি। ওদের একটি পত্রিকা ছিল, নাম এশিয়া। পত্রিকাটির দাম মাত্র চার আনা। চার আনায় এত ভাল পত্রিকা আমি আগে কখনও দেখিনি।

ম্যাগাজিন পড়ার অভ্যাস আমি স্কুল থেকেই রপ্ত করেছি। শিশুসাথী ও মৌচাকের গ্রাহক। শুকতারা ও বসুমতীর লেখক। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পড়ি। সচিত্র ভারতের নিয়মিত পাঠক। অতএব কল্যাণী গিয়ে আমার বড় লাভ হল এশিয়া পত্রিকার নাম ঠিকানা পেলাম।

১৯৫৪ সালেব মার্চ মাস নাগাদ আমি চৌরঙ্গী স্কোয়ারে এশিয়া পত্রিকার অফিসে গিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম।

সম্পাদকেরা এমন অনেক সাহিত্য যশঃপ্রার্থী মফঃস্বলের তরু লেখকদের দেখতে অভ্যস্ত। এরা সম্পাদককে যথেষ্ট খোশামোদ করে। লেখা ছাপার বিনিময়ে আন্তরিক আনুগত্য উপহার দেয়। তারপর তারা অনেকে সম্পাদকের পারিবারিক বন্ধু হয়ে যায়। সম্পাদকের চেয়ারে এক বয়স্ক মোটাসোটা মানুষ বসেছিলেন। তাঁর গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ঘরে ঢুকতে সাহস হল না। ঘরেব সামনে একটা চেয়ার টেবল নিয়ে বসেছিলেন খুব সুন্দর চেহারার ছিপছিপে এক তরুণ। চোখে চশমা ফর্সা রঙ। মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। জানলাম তাঁর নাম বিকাশ চক্রবর্তী। তিনি সম্পাদকের বড় ছেলে। সম্পাদকেব নাম বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী। আমি বিকাশ চক্রবর্তীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিকাশ বললেন ঃ কী চাই ভাই?

আমি বললাম ঃ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি গ্রামের ছেলে।

লিখিটিখি।

বিকাশ বললেন ঃ বোস। কী পড়ো?

আমি ক্লাশ টেনে উঠেছি। আগামী বার স্কুল ফাইন্যাল দেব।

কিছু লেখা এনেছ?

না, বলেন তো আনতে পারি।

বেশ লেখা নিয়ে এসো। এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে লিখবে।

বিকাশ চক্রবর্তীকে প্রথম নজরে এত ভাল লেগে গেল যে প্রথম দিনই আমি দশ কপি এশিয়ার এজেন্সি নিয়ে নিলাম। তিনি এজন্য কোন টাকা জমা রাখলেন না মুখের কথাতেই দিয়ে দিলেন। শুধু বললেন, প্রতি সপ্তাহে তোমার কাছে ডাকে দশকপি করে কাগজ যাবে। মাস গেলে বিক্রির টাকা পাঠিয়ে দিও। সেই শুরু । তারপর থেকে নিয়মিত এশিয়ায় যাতায়াত করতে শুরু করলাম। দশ কপি থেকে এশিয়ার বিক্রি ৩০ কপিতে পৌঁছল। সঙ্গে কিছু বইও এনে বিক্রি করতে লাগলাম। এই বই বিক্রি করতে গিয়ে এক মজার কাণ্ড ঘটল। গোষ্ঠবিহার মেলায় প্রাচী প্রকাশনের (এশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষক সমিতির প্রকাশনা সংস্থার নাম) বই-এর একটা স্টল দিলাম। ওই সব বই-এর মধ্যে একটি বই ছিল, মাইন্ড মার্ডার ইন মাওস ল্যান্ড আর হিন্দ মজদুর সভার নেতা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিন ভ্রমণের বৃত্তান্ত। চিন বিরোধী বই। এই বই দেখে আমদের মণ্ডল কংগ্রেসের বিমল নামে এক যুব নেতা ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে বইপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার বক্তব্য— চিন বিরোধী বই বিক্রি করে আমি নেহেরু নীতির বিরোধিতা করছি। চীন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। যা দেখে গান্ধীবাদী সুন্দরলালও মুগ্ধ। এই ধরনের বই বিক্রি করা মানে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা।

আমার আর স্টল দেওয়া হল না।

এশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষক সমিতির তখন রমরমা অবস্থা। চৌরঙ্গী স্কোয়ারে দুটো তলা নিয়ে অফিস। নিচে হিন্দি প্রাচী পত্রিকার অফিস। সম্পাদক সীতারাম গোয়েল। আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, সমীর কুমার দাস। এঁরা আমাকে ইস্কুলের ছেলে বলে উপেক্ষা করতেন না। আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন।

ইতিমধ্যে মালদা শহরে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অধিবেশন হবে বলে কাগজে খবর দেখলাম।

আমার তখন সবে স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি ওই অধিবেশনে যাবো বলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে একটি স্যুটকেশ নিয়ে হাজির হলাম। পকেটে পয়সা নেই। শুধু ভাবলাম আমাদের গ্রামের হরেনদা জেলা কংগ্রেসের একজন পাণ্ডা। তাঁকে ধরলে তিনি যদি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

সে সময় হংসধ্বজ ধাড়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। তিনি তখন মিনি অতুল্য ঘোষ। জেলায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। জেলা থেকে কংগ্রেস কর্মীরা রাতে

অনেকে পার্টি অফিসে এসে থাকত। আমিও দুদিন থেকে গেলাম। আমার মুরব্বির দেখা পেলাম রাতে। মালদা যাবার কত বাসনা জানাতে তিনি আমাকে একটি মালদার টিকিট কেটে দিলেন। বললেন, অমুক দিন অমুক ট্রেনে ডেলিগেটরা যাবে তুমি তাদের সঙ্গে চলে যাও।

মালদায় পৌঁছতে পারলে ফ্রি থাকা-খাওয়া। কিন্তু পথের খাওয়া কে যোগাবে? কিন্তু ঈশ্বর যার সহায় তাকে আটকায় কে? এক নেতার সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর নাম নিশাপতি মাঝি। এম. এল. এ। তিনি আমাকে রাজমহলে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট খাওয়ালেন। তারপর স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে মানিকচক পৌঁছলাম। সেখান থেকে আবার ট্রেন। তারপর মালদা। যখন ক্লাশ নাইনে পড়ি সে সময় এন.সি.সি ট্যুরে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে সকরিগলি ঘাট। স্টিমারে নদী পেরিয়ে মণিহারি ঘাট। সেই ভ্রমণের কথা মনে আছে একটা কারণে, স্টিমারে ইলিশ মাছ আর ভাত খেয়েছিলাম। সে ইলিশের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। এবারও রাজমহল থেকে স্টিমার পেরুতে হল। তবে কপালে ইলিশের ঝোল জুটল না।

মালদা কংগ্রেসে নিখিল ভারত কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি ইউ. এন. থেবর এসেছিলেন। ডাক্তার রায় তো ছিলেনই। সেই অধিবেশনে ছাত্র পরিষদের অধিবেশন বসল। সেটাই প্রথম অধিবেশন। তার আগে কলকাতায় ছাত্রপরিষদ গঠিত হয়েছে বলে খবর দেখেছি। মালদায় ছাত্র পরিষদের নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হল। মুন্না বাদালিয়র তখন সেক্রেটারি। আলাপ হল শচীকান্ত হাজারি (পরবর্তীকালে ইনি হাইকোর্টের জজ হন), রমেন মুখার্জি, রমেন ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে। অধিবেশনে একটি প্রস্তাবের ওপর আমাকে বলতে বলা হল। রাজনৈতিক বক্তৃতায় সেই আমার হাতেখড়ি। তবে সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন শ্যামল ভট্টাচার্য। তখন তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন। পরবর্তীকালে শ্যামলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ গভীরতর হয়। কংগ্রেসের ছাত্রনেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ। ইংরাজি বাংলা ও হিন্দিতে অনর্গল বলতে পারতেন। তাঁর প্রখর রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল।

মালদহ কংগ্রেসের এগজিবিশনে দেখা হয়ে গেল বিকাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে। প্রাচী প্রকাশনের স্টল নিয়ে এসেছেন।

বিকাশ চক্রবর্তী ততদিনে বিকাশদা হয়ে গেছেন। তাঁর দমদমের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছি। তাঁর ছোটভাই বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। (এখন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার) বিভাস তখন সম্ভবত ক্লাশ এইটে পড়ত। দমদমের মতিঝিলে ভাড়াবাড়িতে তাঁরা থাকতেন।

বিনোদবাবুরা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি। যতদূর মনে পড়ে ধুবড়ির লোক উনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। মহাযুদ্ধের একাঙ্ক বলে একটি নাটক লিখেছিলেন। এশিয়া পত্রিকায় তাঁর ঝরঝরে সম্পাদকীয় খুব ভাল লাগত।

আমি প্রথম যে লেখাটি দিয়েছিলাম সেটি একটি প্যারডি কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ

দত্তের আমরা কবিতার প্যারডি। ভেবেছিলাম এই অক্ষম প্যারডি কি ছাপা হবে?

বিকাশদা আমায় দেখে বললেন— আরে তুমি এখানে?

ছাত্র ডেলিগেট হয়ে এসেছি।

তোমার সেই প্যারডি কবিতা ছাপা হয়েছে এবারের এশিয়াতে। অনেকে খুব প্রশংসা করেছে। কালইতো স্টলে দাঁড়িয়ে একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছিল।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম—কই দেখি দেখি। বিকাশদা দেখালেন। কার্টুন দিয়ে বেশ যত্ন করেই ছাপা হয়েছে।

বিকাশদা বললেন, তোমাকে দেখে বেশ মজা লাগছে। এইটুকু বয়সে কতদূর চলে এসেছ। কলকাতায় মে মাসে খিদিরপুরে বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স হচ্ছে। যাবে নাকি?

আমি বললাম, আমি ওখানে গিয়ে কী করবো?

তোমার তো এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রাচী প্রকাশনের একটা স্টল দিতে পারো। কিছু পয়সা উপার্জন করতে পারবে।

কথাটা মনে ধরেছিল। জীবনে কোন সুযোগ আমি ছাড়িনি। তা যত সামান্য, যত ছোটই হোক না কেন। কারণ কোথায় কোন সুযোগ জীবনের গতিপথ পালটে দিতে পারে তা কেউ বলতে পারে না।

সত্যি তাই, খিদিরপুর গ্রন্থাগার সম্মেলনে না গেলে আমার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হত না। আর দেখা না হলে আমি কোনদিন সাংবাদিক হতাম না। কারণ পেশাদার সাংবাদিক হবার কোন তাগিদ আমি তখনও অনুভব করিনি।

মালদহ থেকে কলকাতায় হই হই করতে করতে ফিরলাম। কারণ কনফারেন্স গিয়ে অনেক বন্ধু জুটে গেছে। এবারও পাথেয় ও খাওয়া দুটোই জুটে গেল। ট্রেনে একটি ছেলে জীবনানন্দের বনলতা সেন আবৃত্তি করেছিল। ছেলেটির নাম অমর। সে এখন অ্যাডভোকেট। আমি সেই প্রথম বনলতা সেন শুনলাম। তারপর থেকে জীবনানন্দ আমার প্রিয় কবি হয়ে গেলেন।

গোবরডাঙ্গা ফিরে দুদিন থেকে আমি একটি গল্প লিখে ফেললাম। প্রতিবিপ্লব। গল্পের থিম অবশ্য ক্লাশ টেনের ছেলের পক্ষে পাকামো। কারণ এই মেলোড্রামাটিক গল্পের বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক। এক যুবক তার পার্টি কমরেড প্রেমিকাকে অন্তঃস্বত্ত্বা করে দিয়েছিল সেটাই মূল বিষয়বস্তু।

গল্পটি বিনোদবাবু পড়লেন।

বললেন—গল্পটি মোটামুটি উতরেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা না হলে গল্প লিখতে যেও না। তোমার প্রথম উদ্যম বলে গল্পটা ছাপছি।

সেই উপদেশ মাথায় রেখে আজ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার বাইরে কোন গল্প বা উপন্যাস লিখিনি। মাসকয়েক পরে গল্পটি ছাপা হয়েছিল। এটি আমার প্রথম বড়দের গল্প। শুধু তাই নয়, এই গল্পের জন্য বিনোদবাবু আমাকে পাঁচটাকা সম্মান দক্ষিণা দিয়েছিলেন। লিখে সেই আমার প্রথম রোজগার।

প্রাচী প্রকাশন থেকে ট্রাঙ্কে করে বই নিয়ে রিকশায় চেপে খিদিরপুর গেলাম। ট্যাক্সি নেইনি কারণ তা হলে লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে যাবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন তিনদিন ধরে চলেছিল। তিনদিন ওই পাঠাগার চত্বরেই পড়েছিলাম। বিক্রি যে বেশি হল তা নয় তবে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি প্রকাশনা শুরু করেছেন, জাপানে রাসবিহারী বসুর উপর একটি ইংরাজি বই নিয়ে।

গরমের দুপুরে যখন প্রদর্শনী শুনশান তখন তাঁর সঙ্গে নানা গল্প হত।

আমাকে একদিন বললেন — তুমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কী পড়বে ঠিক করেছ?

আমি বললাম, আমি আর্টস পড়ব (তখন হিউম্যানিটিজ শব্দটি চালু হয়নি)।

ঃ কোন লাইনে যাবে?

ঃ আমি বললাম, আর্টসের ছাত্রদের তো কোন লাইন খোলা নেই।

তিনি বললেন, না-না, আর্টসের ছাত্রদেরও লাইন আছে। যেমন বি.এ. পাশ করে তুমি জার্নালিজম পড়তে পারো। লাইব্রেরিয়ানশীপ পড়তে পারো।

সেই প্রথম শুনলাম যে জার্নালিজম বলে একটা সাবজেক্ট আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

আমি ঠিক করলাম আমি জার্নালিজম পড়ব। খবরের কাগজই আমার ভবিষ্যৎ। জার্নালিজম পড়ার জন্য আমাকে গ্রাজুয়েট হতেই হবে।

খিদিরপুর থেকে যেন নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু বাড়ি ফিরতেই বাবা বললেন— ছোটদি জিজ্ঞাসা করছিলেন কালী এবার চাকরি করবে তো?

আমি বললাম, তুমি কী বললে—

বাবা বললেন, চাকরি কী মুখের কথা। পেলে তবে তো— তা ছোটদি বললেন, বোঁজ আমাদের ঠাকুরকে চাকরি দিয়েছে। সে এখন রান্নাবান্না সেরে দুপুরে অফিসে চলে যায়। তুমি ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলো। ওরা হয়তো আরও কিছু বেয়ারা নেবে।

আমি বললাম, আচ্ছা বলবো। এই বলে চলে এলাম।

আমি বাবাকে বললাম, তা তুমি কি বলতে চাও বাবা? চাকরি পেলে নিয়ে নেব?

বাবা বললেন—আমি তো তাই মনে করি। জমিদারি চলে গিয়ে আমি নিঃসহায় পড়েছি। বাড়িটা বাঁধা রয়েছে। দোকান করতে গেলাম তাও ফেল হয়ে গেল। কোনদিকে কোন আশার আলো দেখছি না।

আমি বললাম আমি তো কলেজে পড়ব ঠিক করেছি।

বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ছোটদি খুব রাগ করবে শুনে.....

মা বললেন—ওরা যখন এত পড়ার ইচ্ছে তা দেখা যাক না। বি এটা অন্তত পাশ করুক। গ্রামের মধ্যে যখন কলেজ হয়েছে।

বাবা বললেন—কলেজ হয়েছে তাতে আমাদের কী! শুধু পড়লেই তো হয় না

টাকা লাগে। গ্রামের মধ্যে স্কুল হয়েও নানু ঘোষ মেয়েটার ফ্রিশিপ কেটে দিল। ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়ে বাড়িতে বসে আছে। বিয়ে যে দেব সে ক্ষমতাও এখন নেই। বড় ছেলে ; তার ওপরেই তো দায়িত্ব বাবা মাকে দেখার। সে এখন ম্যাট্রিক পাশ করতে চলেছে আর ভাবনা কী।

' মা বললেন—আগে পাশ তো করুক।

বাবা বললেন—পাশ করবেই। আমি রঘুনাথের কাছে তুলশী দিচ্ছি—রঘুনাথ কী তা শুনবেন না?

পরীক্ষার খবর জানার জন্য এত উদ্বিগ্ন ছিলাম যে যেদিন রেজাল্ট বেরুবে সেদিন কলকাতায় চলে গেলাম। সে সময় বোর্ড থেকে খবরের কাগজকে রেজাল্ট পাঠানো হত। পরদিন দু-তিন পাতা জুড়ে সফল পরীক্ষার্থীদের রোলনং ছাপা হত। আমি চলে গেলাম আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে খবর জানতে।

১৯৫৫ সাল। তখন সবে আনন্দবাজার সুতারকিন স্ট্রিটে উঠে এসেছে। এর আগে আমি একবার আনন্দবাজারের বর্মন স্ট্রিটের অফিসে গিয়েছি গোবরডাঙ্গায় কোন এক সভার জন্য সভাপতি ঠিক করতে। গিয়েছিলাম বিপ্লবী অমলেন্দু দাশগুপ্তর কাছে। তাঁর বক্সা ক্যাম্প পড়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলাম। তিনি তখন আনন্দবাজারে সহকারী সম্পাদক। তাঁকে আনতে চেয়েছিলাম।

বর্মন স্ট্রিটে পুরনো বাড়ি। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসা। সে সময় খবরের কাগজ অফিস মানেই ছিল চুনকাম বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ঝুল পড়া, ভাঙাচোরা বাড়ি। পুরনো চেয়ারটেবল। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাগজপত্র, সিগারেটের টুকরো। বাড়ির পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম। তারপর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সে দেখিয়ে দিয়েছিল অমলেন্দু দাশগুপ্তের ঘর।

সেই বাড়ির তুলনায় সুতারকিন স্ট্রিটে আনন্দবাজারের চারতলা আধুনিক বাড়ির অনেক তফাত।

পরীক্ষার খবর জানার জন্য দুপুর থেকেই প্রচুর ছেলেমেয়ের ভিড় হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার আগে খবর জানা গেল না।

খুব খিদে পেয়েছিল। স্টেশনে বহু দোকানে মাস্থলি টিকিট ভাড়া দেওয়া হয়। সেই রকম একটা মাস্থলি টিকিট বারো আনা দিয়ে ভাড়া করে এনেছি। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম মাত্র চার আনা পয়সা আছে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটা দোকানে গিয়ে চা ও সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিলাম। উনিশ পয়সা বিল উঠল। ছ' পয়সা ফেরত পেলাম। শিয়ালদার ট্রাম ভাড়া তখন নয়া পয়সা অনুসারে সাত পয়সা। বাসভাড়া দশ পয়সা। আমার কাছে আছে ছ' পয়সা। এখন হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু রেজাল্ট যখন হাতে পেলাম তখন রাত নটা। কোনক্রমেই হেঁটে গিয়ে লাস্ট ট্রেন ধরা যাবে না।

মরিয়া হয়ে এক টাক মাথা ভদ্রলোককে সামনে পেয়ে (পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়) বললাম— দেখুন, আমি মফঃস্বলের ছেলে। রেজাল্ট

জানতে এসেছিলেম। লাস্ট ট্রেন মিস করেছি। আমাকে এখানে একটা রাতটা থাকতে দেবেন?

ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন—আমাদের এখানে রাতে কারও থাকার নিয়ম নেই। তুমি বরং হেঁটে শিয়ালদা স্টেশনে চলে যাও। স্টেশনে রাতটা কাটাও।

আমি বললাম— স্টেশনে থাকতে দেবে? ভদ্রলোক বললেন—কত লোক থাকে দেখবে। আমাদের স্টাফদেরও অনেকে ট্রেন মিস করলে শিয়ালদায় রাত কাটায়।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে শিয়ালদার দিকে হাঁটছিলাম।

রাত দশটা বাজে। ঘটাং ঘটাং করে একের পর এক ট্রাম চলে যাচ্ছে। মাত্র একটা পয়সার জন্য আমি ট্রামে উঠতে পারলাম না। ট্রেন মিস করলাম। অথচ আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে গিয়েছি! জীবন থেকে শিক্ষা নিলাম, এক টাকা থেকে এক পয়সা কম থাকলে তা আর এক টাকা থাকে না। ভাবলাম, পৃথিবীতে একটা পয়সার জন্য আমার মত কত লোক হয়তো কত অসুবিধেয় পড়েছে। সুতরাং একটা পয়সারও প্রয়োজনের সময় এক হাজার টাকা দাম।

একবার আমার মামা তাঁর সাইকেলটি বিক্রি করলেন ৩৫ টাকায়। বাবার কাছে ৩০ টাকা ছিল। তিনি বলেছিলেন, কেষ্ট সাইকেলটা আমায় দাও। পাঁচ টাকা আমি তোমায় পরে দেবো। মামা দেননি। তাঁর পাঁচ টাকার তখন খুব দরকার ছিল। আর একজন ৩৫ টাকা দিয়ে সাইকেলটা কিনে নিল।

জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম, সব সময়ই প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি টাকা হাতে রাখতে হয় আপৎকালীন খরচের জন্য। সেটা নিজেরই রিজার্ভ ফান্ড। নিজের রিজার্ভ ফান্ড থেকে নিজেই ধার করতে হয়। নিজেকেই নিজের ধার শোধ করতে হয়।

শুধু আয় বুঝে ব্যয় নয়, আয়ের একটা অংশ ব্যয় না করে জমিয়ে রাখাই আপৎ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। আমার ঋণগ্রস্ত বাবাকে দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কখনও ঋণ করব না। ঋণ দেবও না। শেষের প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারিনি। ঋণ দিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি যে হয়নি তা নয়, কিন্তু কখনও ঋণ করিনি কারও কাছে।

সেদিন সারারাত শিয়ালদা স্টেশনে বেঞ্চের ওপর শুয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাতে কে দেখি আমার পকেট হাতড়াচ্ছে। ঘুম ভাঙতেই দেখি একটা লোক দ্রুত পা ফেলে কোথায় মিলিয়ে গেল।

মনে মনে হাসলাম। পকেটে পয়সা না থাকার কত সুবিধে। পকেটমারের ভয় নেই। যে ছ'টা পয়সা ছিল, তা দিয়ে রাতে পাউরুটি কিনে খেয়েছি। এখন পকেটে লবডঙ্কা। এমনকি পকেট না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই আমার।

আর একটু পরেই স্টেশনে ব্যস্ততা জাগল। শেষ রাতের ট্রেনগুলি একে একে ছেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সকাল সাতটা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে বনগাঁ যাবার কোনও গাড়ি নেই।

বাড়ি ফিরতেই মা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কাল সারারাত কোথায় ছিলি?-আমি বললাম, বলছি, তার আগে বলি আমি পাশ করেছি।

মা তাড়াতাড়ি গিয়ে শাঁখ বাজালেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আমাকে চাকরি করার জন্য কোন চাপ দেওয়া হবে না যদি আমি নিজে থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারি ও সেই সঙ্গে নিজের পড়ার খরচ নিজে চালাতে পারি তাহলে আমি কলেজে পড়তে পারি।

সুযোগ একটা জুটে গেল। বনগাঁ দীনবন্ধু কলেজ সেই বছর থেকে চালু হচ্ছে। বনগাঁর জনপ্রতিনিধি ডাঃ জীবনরতন ধর তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি উদ্যোগ নিয়ে কলেজ করছেন। শহরের বিশিষ্ট লোকদের তিনি শামিল করেছেন। বনগাঁর এস ডি ও তাঁকে সাহায্য করছে। গোবরডাঙ্গা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল অজিতকৃষ্ণ বসু গোবরডাঙ্গা কলেজ ছেড়ে বনগাঁ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে যোগ দিয়েছেন।

গোবরডাঙ্গা কলেজের তখন খুবই নাম ডাক। ১৯৪৮ সালে দৌলতপুর হিন্দু অ্যাকাডেমির হিন্দু অধ্যাপক ও ছাত্ররা রাতারাতি গোবরডাঙ্গায় চলে এসে গোবরডাঙ্গা স্কুলে সকাল বেলা এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের এর পিছনে সহযোগিতা ছিল। সাত বছরে কলেজ তার নিজস্ব জমিতে উঠে এসেছে। কলেজের বিল্ডিংও তৈরি হয়েছে।

কিন্তু ঘরের খেয়ে পড়ার মত আবার অবস্থা নয়। আমি দুমুঠো অন্নের জন্য লোকের দ্বারস্থ হচ্ছি। অথচ কয়েক বছর আগেও বাবা আমার এক মাসতুতো ভাইকে বিনা মূল্যে বাড়িতে রেখে গোবরডাঙ্গা কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে বিশিষ্ট গীতিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু কয়েক মাস থাকার পর একদিন রাতে আমার দাদামশাই আমার মায়ের কাছে মোসোমশাই সম্পর্কে কী একটা মন্তব্য করেন। সেটা কানে যেতেই ওই মাসতুতো দাদা নাটকীয়ভাবে সেই রাতেই বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ওই গীতিকার মাসতুতো দাদা এরপর আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেননি।

আমার এরকম কোন আত্মাভিমান ছিল না। আমি বনগাঁয় গিয়ে অজিত বসু মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আমাকে বনগাঁর কলেজে ফ্রি ছাত্র হিসাবে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। একটি খাওয়া থাকার জায়গাও ঠিক হয়ে গেল। এক ভদ্রলোকের ছেলেদের পড়াতে হবে। পরিবারের টুক-টাক কাজকর্মও করে দিতে হবে। তার মধ্যে একটি কাজ রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল তোলা। এসব আমার কাছে অতিরিক্ত পরিশ্রম নয়। আমার বাড়িতেও আমাকে দূরের টিউবওয়েল থেকে জল টেনে আনতে হত। আমি রাজি হয়ে গেলাম। ঠিক হয় জুলাই মাস থেকে আমি বনগাঁ চলে আসব।

একদিন উষা কথায় কথায় তার বাবাকে বলল—পার্থ বনগাঁ কলেজে ভর্তি হচ্ছে। উষার বাবা উমা বাবু জমিদারি চলে যাবার পর সেটলমেন্ট অফিসার হয়ে কোচবিহারে

কিছুদিন কাজ করেন। তারপর বাড়িতেই বসে থাকতেন। তিনি গোবরডাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতেও ছিলেন।

উমাবাবু আমাকে দেখে বললেন, তুমি নাকি বনগাঁ কলেজে পড়তে যাচ্ছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

গোবরডাঙ্গায় কলেজ থাকতে বনগাঁয় যাচ্ছ কেন?

ঃ ওখানে আমাকে ফ্রিশিপ দেবে তাই।

আমি প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলব। তুমি কাল বিকেলে কলেজে এসো। তোমার যাতে ফ্রিশিপ হয় আমি দেখব। উমাবাবু আমায় বললেন।

বিকেলে কলেজের বারান্দায় চেয়ার পেতে প্রিন্সিপ্যাল অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমাবাবু বসেছিলেন। অমিতেশ বাবু ছিলেন সুপুরুষ। শৌখিন। সব সময় ধোপ দুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি পরে থাকতেন।

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই উমাবাবু বললেন—অমিতেশবাবু, এই ছেলেটির কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

অমিতেশবাবু বললেন—কী পড়বে আটস না কমার্স?

আমি বললাম—আর্টস।

কোন ডিভিশনে পাশ করেছ?

সেকেন্ড ডিভিশন। কিন্তু অঙ্ক ছাড়া সব সাবজেক্টে ফার্স্ট ডিভিশন মার্কস আছে স্যার।

অমিতেশবাবু বললেন— তোমার বনগাঁয় যাবার দরকার নেই। এই কলেজেই তোমায় ভর্তি করে নেব। ফি লাগবে না।

মাকে গিয়ে বলতে মা বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে থাকলেই তো ভাল। আমাদের যদি দুবেলা দুটো খাওয়া জোটে তোরও জুটবে। তুই এখানেই পড়।

গোবরডাঙ্গা কলেজে পড়ব এক রকম নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছি; গোবরডাঙ্গা যমুনা নদীর ওপারে লক্ষ্মীপুর স্বামীজী সেবা সংঘের কদিন ধরে অনুষ্ঠানে খুব খাটাখাটি করলাম। একদিন সেখানে দুজন ভদ্রলোক আমার খোঁজে এলেন।

একজন বেঁটেখাটো। ঘন কৃষ্ণকালো চেহারা। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। পরনে হলুদ খাদির পাঞ্জাবি। আর একজন দীর্ঘদেহী। স্যুট বুট পরা চোখে চশমা। কালো ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তোমার নাম পার্থ? তোমার কথা শুনে তোমার কাছে আসছি। আগে পরচিয় করিয়ে দি, ইনি বিনয় টিকাদার। গোবরডাঙ্গা কলেজের বটানির প্রফেসর। (তখন লেকচারারদেরও প্রফেসর বলার রেওয়াজ ছিল। এমনকী ডেমনেস্ট্ররাও বাইরে নিজেদের প্রফেসর বলতেন)। আমি নমস্কার করলাম।

নরেন বিশ্বাস বললেন—আমি ফরোয়ার্ড ব্লকের হোল টাইমার ছিলাম। আচার্য শীলভদ্র যাজীর সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি। এই অঞ্চলের কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন ছেলেদের সংগঠন জোরদার করতে চাই। আমরা শিগ্রী একটা শিবির করব। তোমার

সাহায্যে দরকার হবে। তুমিতো গোবরডাঙ্গা কলেজে ভর্তি হচ্ছ। আমি বললাম—হ্যাঁ।

বিনয়বাবুকে বেশ লাজুক প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হল। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। *নরেন বিশ্বাস বললেন ঃ এর সঙ্গে কলেজে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।*

গোবরডাঙ্গা কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্র নেতা বলে আমার খেতাব জুটে গেল। মানুষের প্রতিটি কাজের পিছনে হয় বাইরের, না হয় ভেতরের হাতছানি থাকে। আমার কাছে ভেতরের হাতছানি অর্থাৎ অবচেতন মনের একটা তাগিদই কাজ করেছিল বেশী। পরিবারের দারিদ্র্য ও পাড়ার হতশ্রী পরিবেশ থেকে আমি যথাসম্ভব মুক্তি চেয়েছিলাম বলেই এমন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম যার মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। সে সময় যদি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলত আমি হয়তো সক্রিয়ভাবে সেখানে যোগ দিতাম।

আসলে আমি হাতের সামনে যা পাচ্ছিলাম, সেটাকেই আঁকড়ে ধরছিলাম। গণেশওয়ালা বাড়ির প্রভাবে অন্য ছেলেদের দেখাদেখি স্কুলে থাকতে কিছুদিন কম্যুনিস্ট পার্টির কাজকর্মেও ভিড়েছিলাম। শিক্ষক আন্দোলনে আমি ছাত্র ধর্মঘটের নেতাই শুধু ছিলাম না, কম্যুনিস্ট দাদারা আমাকে বক্তাও বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষক সমিতির কম্যুনিস্ট বিরোধী বইগুলি পড়ে কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমার বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। অথচ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকল্প হিসাবে আমি আর একটি প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের মধ্যেই আমি সেই প্ল্যাটফর্ম খুঁছে পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। সেটা একসময় আমার নেশার মত হয়ে দাঁড়ায়। সমাজসেবা, সাহিত্য ও রাজনীতির তিনটি নৌকায় পা দিয়ে আমার আর পড়াশোনার জন্য কোন সময়ই রইল না।

অথচ যদি গোবরডাঙ্গায় না থেকে যদুলাল মল্লিক রোডে রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমে থেকে পড়াশোনার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি পড়াশোনাতেই হয়তো ডুবে থাকতাম। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র কোনদিনই ছিলাম না। কিন্তু ভাল করে পড়াশেনা করলে প্রথম বিভাগে পাশ করার মত আমার যে যোগ্যতা ছিল সে সম্পর্কে আমার শিক্ষকেরা একমত ছিলেন।

কিন্তু যদুলাল মল্লিক রোডের রামকৃষ্ণ মিশনে একটুর জন্য আমার থাকার সুযোগ হয়নি।

রামকৃষ্ণ মিশনের ওই বয়েজ হোমের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ—কানাই মহারাজ। লক্ষ্মীপুর স্বামীজী সেবা সংঘ তাঁরই অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন তাঁর যৌবন। অসাধারণ তেজঃদৃপ্ত চেহারা। তাঁকে দেখে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি মনে পড়ত। অতবড় মানুষটির কোন হাঁকডাক ছিল না। কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে। বক্তৃতাও দিতেন খুব ধীরে ধীরে। থেমে থেমে।

গল্পের মত করে। স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরাজির ছাত্র ছিলেন তিনি। বাড়ি ছিল রাজশাহীতে।

স্বামীজী সেবা সংঘের তরুণ নেতা নন্দদুলাল চক্রবর্তী। আমাকে খুব ভালবাসতেন, বয়েসে তিনি আমার চেয়ে কয়েক বছর বড়। আমি তাঁকে দাদা ডাকতাম। তিনি বরিশাল থেকে আসা উদ্বাস্তু। সমাজ সেবার কাজেই তিনি সারাজীবন আত্মনিয়োগ করেন। স্কুল ফাইন্যালের পর তিনি আর পড়াশোনা না চালিয়ে এন জি ও স্বামীজী সেবা সংঘ গড়ে তুলে ছিলেন লক্ষ্মীপুর গ্রামে। সেটি যমুনা নদীর অপর পারে। স্বামীজী সেবা সংঘের আজ যে বিশাল সংগঠন, তার পিছনে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা থাকলেও নন্দদুলালের বিশাল সাংগঠনিক ক্ষমতা না থাকলে তা সম্ভবপর হত না। তিনিই আমাকে অনেকবার যদুলাল মল্লিক রোডে নিয়ে যান। প্রতিবারই গিয়ে দেখা করতাম কানাই মহারাজের সঙ্গে। তিনি আমায় স্নেহ করতেন। খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। বলে রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে এসো।

আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য হল আমি খুব খারাপ ছেলে বলতে যা বোঝায় তাদের সঙ্গেও যেমন মিশেছি আবার ব্রিলিয়ান্টদের সঙ্গে মিশেছি। স্কুল জীবনে ড্রপ আউট কানাইলাল হরির সঙ্গে আমার যেমন বন্ধুত্ব ছিল তেমনি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র দুর্গাশঙ্কর, অসিত, অমল সমরের মত ছেলেদের সঙ্গেও সখ্যতা ছিল।

যদুলাল মল্লিক রোডে রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমে বার বার যাতায়তের ফলে সারা বাংলার সেরা ছেলেদের সান্নিধ্যে এলাম। মণিলাল খান, প্রশান্ত গিরি, সাতকড়ি ব্যানার্জি আরও অনেকের নাম এখন মনে নেই। যদুলাল মল্লিক রোডের পাঠভবনটিই পরে নরেন্দ্রপুরে উঠে যায়। যদুলাল মল্লিক রোডে বিশাল দুটি বাড়িতে এই সব সেরা ছাত্র থাকত। ছাত্রাবাসে ফিজ দিয়ে সাধারণ ছাত্রদেরও থাকার ব্যবস্থা ছিল। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে পরিসংখ্যানবিদ ভাগবত দাশগুপ্ত, কালীপদদা (এখন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ), প্রণবরঞ্জন ঘোষ ওখানে থাকতেন। প্রণবরঞ্জন ঘোষ পরে আমার পি-এইচ ডি'র গাইড হয়েছিলেন। যদুলাল মল্লিক রোড থেকে নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম উঠে গেলে প্রণবদাকে সেখানে থাকার একটি ঘর দেওয়া হয়। আজীবন অকৃতদার প্রণবদা স্পার্টান জীবন যাপন করতেন। তার ছোট্ট ঘরে স্তূপাকৃতি বই ছাড়া কোন আসবাবপত্র ছিল না। সেই বইগুলি তিনি যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে রাখতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বাংলার রিডার ছিলেন, পরে অধ্যাপক হন।

কিন্তু মানুষের জন্ম ও মৃত্যু বড় বিচিত্র। প্রণবদা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ফ্রি বেডে মারা যান। আমি কয়েকবার দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি অনাদরে অবহেলায় নিঃস্ব রোগীদের মধ্যে পড়েছিলেন। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর প্রভিডেন্ট ফান্ড ও তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় যার হদিশ পাওয়া যায় তাতে তিনি নার্সিং হোমে থেকে চিকিৎসা করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি আজীবন সন্ন্যাসীর মতই জীবন যাপন করে গিয়েছেন।

কানাই মহারাজের খুব ইচ্ছা ছিল আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলে আমাকে বয়েজ হোমে ভর্তি করে নেবেন। কিন্তু আমি তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলাম

না। তখন আমি আর একবার শেষ চেষ্টা করলাম। প্রফুল্ল চন্দ্রসেন তখন খাদ্যমন্ত্রী এবং রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের সভাপতি। মালদা কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয়কে সম্বল করে একদিন কলকাতায় গিয়ে মহাকরণে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

প্রফুল্ল সেন শুধু একজন ভদ্রলোকই ছিলেন না, ছিলেন আগাপাছতলা এক পরোপকারী মানুষ। মানুষকে সাহায্য করার জন্য তিনি মুখিয়ে থাকতেন। যে কোন প্রার্থনা নিয়ে গেলে তিনি দাতাকর্ণের মত তা মঞ্জুর করতেন। এর ফলে প্রফুল্ল সেনের সুপরিশকে অনেক আমলা পাত্তাই দিতেন না।

আমি যেতেই প্রফুল্লবাবু বললেন—তুমি কে? তোমায় তো ঠিক — আমি পরিচয় দিলাম। মালদার রেফারেন্স দিলাম।

প্রফুল্লদা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, কী করতে হবে?

আমি বললাম—গরিবের ছেলে আমি প্রফুল্লদা। যদি ফ্রি স্টুডেন্ট হিসাবে বয়েজ হোমে থাকতে পারি তাহলে আমার পড়াশোনাটা ঠিকমত হয়। যদি কানাই মহারাজকে ফোন করে একবার আমার কথা বলেন।

প্রফুল্লদা বললেন, পড়াশোনা আর করতে চাইছ কেন? কী হবে বেশি পড়ে?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—তাহলে কী করবো—

ব্যবসা করো, ব্যবসা। বাঙালি ব্যবসায়ে উন্নতি না করলে এ জাতের কপাল ফিরবে না।

আমি বললাম, আমি ক্যাপিটল কোথায় পাবো দাদা। আমি কীভাবে ব্যবসা করবো?

প্রফুল্লদা বললেন, মারোয়াড়িরা লোটা কম্বল নিয়ে আসে। কোটিপতি হয়ে ফেরে। ব্যবসার জন্য ক্যাপিটাল লাগে না হে, লাগে বুদ্ধি।

আমি চুপ করে রইলাম। আমি কখনও ব্যবসার কথা আর ভাবিনি। বাবাকে দেখেছি ব্যবসা করতে গিয়ে বার বার ডুবে যেতে। আমি তো সাংবাদিক হবো বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। তার জন্য আমাকে গ্রাজুয়েট হতেই হবে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রফুল্লদা বললেন, দাও, রামকৃষ্ণ মিশনের টেলিফোন নম্বরটা দাও।

তখন ম্যানুয়াল এক্সচেঞ্জ ছিল। ডায়াল করে বড়বাজার, সেন্ট্রাল এইসব এক্সচেঞ্জ চাইতে হত। তারপর নম্বর বলতে হত। টেলিফোন সম্পর্কে আমি খুব অভিজ্ঞ ছিলাম না। আমি কখনও কাউকে টেলিফোন করিনি।

আমি বললাম, নম্বর তো জানি না। গাইড দিলে খুঁজে দিতে পারি।

কিন্তু গাইড দেখার কৌশলও রপ্ত হয়নি। গাইডে আমি রামকৃষ্ণমিশন বয়েজ হোম খুঁজে বার করতে পারলাম না।

প্রফুল্লদা নিজেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তিনি ব্যস্ত মানুষ। এর মধ্যে ফাইল আসছে। টেলিফোন আসছে। বাইরে আরও সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বসে আছে। কিন্তু তিনি অপ্রস্তুত হলেও ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলছেন না। বরং নম্বর না পাওয়াতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন।

আমি বললাম, আজ থাক প্রফুল্লদা। আমি নম্বরটা খুঁজে নিয়ে আপনাকে জানাবো। কিন্তু আমি জানতাম একবার সুযোগ চলে গেলে সে সুযোগ আর আসে না। আমি নম্বর নিয়ে আর প্রফুল্লদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না।

বুঝলাম গোবরডাঙ্গা কলেজই আমার নিয়তি। আমি তাই কোন হতাশা মনে না রেখে কলেজের জীবনপ্রবাহে মিশে গেলাম।

কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় আমার কয়েকজন অনুগামী জুটে গেল। একজনের নাম হরষিত ঘোষ। দীর্ঘদেহী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কথায় যশুরে টান। তার বাবা মা তখনও পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানে তাদের প্রচুর ভূসম্পত্তি। দুই ছেলেকে তাঁরা কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পিছনে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে তাঁদের কার্পণ্য ছিল না। হরষিত ছিল সুরসিক, জমাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যে কোন আড্ডা মাতিয়ে রাখতে পারত। তার মধ্যে শহুরে ভদ্রতা বা শহুরে সংস্কৃতির কোন পালিশ ছিল না। সে তার সমস্ত গ্রাম্যতা, অকপটতা ও সারল্য নিয়েই নিজেতে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে সারাজীবন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। সে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। কিন্তু যার পিছনে সে পাগলের মত ছুটে বেড়াত ক্ষমতা আর ভালবাসা তা সে পায়নি।

আর একজন ছিল উত্তরবঙ্গের ছেলে রমেন সেন। তৃতীয়জন স্বরূপনগর থেকে আসত, মুসলমান ছেলে নাম জনাব আলি মণ্ডল। চতুর্থ জন ছিল আমার চেয়ে সিনিয়র। পাশের গ্রামের ছেলে চিত্তমোহন চট্টোপাধ্যায়। চিত্ত পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টে চিফ জাস্টিসের সহকারী হয়ে রিটায়ার করে।

এদের তিনজনকে আমি ছাত্রপরিষদের সদস্য করলাম। তাদের বললাম— তোমাদের খদ্দর পরতে হবে। ততদিনে আমিও খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরতে শুরু করেছি।

এরা সবাই আমায় শ্রদ্ধা করত। বন্ধু হিসাবেও হরষিত ও চিত্ত সারাজীবন আমার পাশে থেকেছে। জনাব ও রমেনের কোন সন্ধান ছাত্রজীবনের পর আর পাইনি।

আমি কলকাতায় গিয়ে ইতিমধ্যে ছাত্রপরিষদ নেতা মুন্না বাদালিয়র ও শচীকান্ত হাজারির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওঁদের বাড়িতেও অনেকবার গিয়েছি। শচীকান্তদার বাবা ছিলেন বিখ্যাত চোখের ডাক্তার কে. কে. হাজারি। শচীদার সুপারিশে তিনি অনেকবার বিনা পয়সায় আমার চোখ দেখে দিয়েছেন। মুন্নাদা তখন রাজ্য ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

সেসনের গোড়ায় ইউনিয়ন ইলেকশন নিয়ে মেতে রইলাম। ইলেকশনে প্রচারের জন্য কিছু টাকা দরকার। মুন্না বাদালিয়রকে বলায় তিনি ষাট টাকার মত দিলেন। সেই টাকায় লিফলেট ছাপার ব্যবস্থা হল।

সে সময় ছাত্র ফেডারেশনের রমরমা। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলেও বামপন্থীরা প্রচণ্ড শক্তিশালী। বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে পুনর্বাসন নিয়ে নানা অসন্তোষ ছিল।

বামপন্থীরা তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল। আমাদের কলেজে শতকরা ৯০ জন ছাত্রছাত্রীই উদ্বাস্তু। কাজেই তাদের মধ্যে বামপন্থী মনোভাব প্রবল থাকা স্বাভাবিক ছিল।

আমার মধ্যে তখন রাজনৈতিক নেতা হবার উচ্চাশা জেগেছে। তখন ভাবছি সাংবাদিক হয়ে আর কী হবে, তার চেয়ে যারা সংবাদ তৈরি করে সেই মন্ত্রীদের একজন হলে আরও বেশি করে কাজ করতে পারব। এক ডাকে সবাই আমায় চিনবে। কিন্তু পলিটিকসের প্রথম রাউন্ডেই আমি ধাক্কা খেলাম। সেটি ঘটল ইউনিয়ন ইলেকশনকে কেন্দ্র করে। আমার অনুগামীরা চেয়েছিল আমি ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াই। কিন্তু বাগড়া দিল আমারই স্কুল জীবনের প্রাক্তন সহপাঠীরা। তাদের নেতা হানিফ দফাদার।

হানিফ খাঁটুরা গ্রামে এক জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিবারের সন্তান। তার দাদা রুস্তম কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন এক জাতীয়তাবাদী যুবক। তাঁকে ছোটবেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সভায় বক্তৃতা দিতে দেখেছি।

হানিফের মধ্যে কোন গোঁড়া ইসলামি মনোভাব ছিল না। সে খাঁটুরায় দুর্গাপূজা কমিটিতে কাজ করে শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকের পুরস্কার পায়। হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গেই তার ওঠাবসা ছিল। হানিফের নির্দেশে নমিনেশন দেওয়া হল আর একটি ছেলেকে।

কারণ হিসাবে বলা হল, আমি একজন ষড় সংগঠক। আমি ভি পি হলে সংগঠন মার খাবে। আমার মত দক্ষ নেতার ভূমিকা হওয়া উচিত অতুল্য ঘোষের মত অর্থাৎ কিং নয়, কিং অব দি কিংস। যাকে বলে কিং মেকার।

আমার মনটা খুব ভেঙে গেল। তবু মনের ক্ষোভ চেপে রেখে ছাত্রপরিষদের প্রার্থীকে জেতাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। অমন উত্তেজক নির্বাচন আর কখনও হয়নি। ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থীদের হারিয়ে আমরা ক্লাশ প্রতিনিধির মেজরিটি আসনে জিতলাম। তার মধ্যে আমি ক্লাশ প্রতিনিধি হিসাবে জিতলাম রেকর্ড ভোটে।

কিন্তু নতুন কার্যনির্বাহক কমিটিতে আমারই দল আমার গুরুত্ব ছেটে দেবার জন্য আমাকে কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদকের পদটিও সম্পূর্ণভাবে দিল না। একটি মেয়েকে আমার সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদিকা করে দিল। আমি ক্ষমতার ব্যাপারে কোন ভাগাভাগি পছন্দ করি না। হয় আমি পরিচালনা করতে চাই, না হয় পরিচালিত হতে চাই। আমি যখন কর্মী তখন অনুগত। কেন এই প্রশ্ন কখনও করি না। নেতা হিসাবেও কৈফিয়ত দেওয়া আমার ধাতে সয়না। কিন্তু গণতন্ত্রে আমার এই মনোভাবকেই বলে স্বৈরতন্ত্র। গণতন্ত্রে আদর্শ নেতা ভারবাহী পশুর মত। মালের সঙ্গে মালিককেও কাঁধে চাপিয়ে ঘুরতে হবে। কোন বিরক্তি প্রকাশ চলবে না।

আমাদের এই বিজয়ে অমিতেশবাবু খুব খুশি হলেন। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন ভিন্ন রাজনৈতিকমতের অধ্যাপক ও তাঁদের ক্যাডার ছাত্ররা অমিতেশবাবুর পিছনে লেগেছিল। অন্যদিকে অমিতেশবাবু উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছাত্রদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। ব্যাক্তিগত কৃতজ্ঞতার জন্য আমি অমিতেশবাবুর অনুগত ছিলাম। আমার আনুগত্য এত গভীর ছিল যে এজন্য আমার ভাবমূর্তিকে আমি নষ্ট করতেও দ্বিধা বোধ করিনি।

সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

আমার সাংবাদিক হবার জানালাগুলি ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিল। খুলছিল খুব নাটকীয়ভাবে। নরেনদা একদিন বললেন, আমি, বিনয় টিকাদার ও তুমি তরুণকান্তি ঘোষের বাড়ি যাবো। আলাপ-পরিচয় করে আসব। গোবরডাঙ্গা এবার হাবড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে। তরুণবাবু তাহলে এখানকারও বিধায়ক হবেন। আর দুবছর পরেই হলেকশান। চলো আলাপটা ঝালিয়ে আসি।

বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে যুগান্তর অফিসের পিছন দিকে তিনতলার একটা ঘরে তরুণবাবুর অফিস ছিল।

আমি এই প্রথম তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। এর আগে তাঁর খুব বদনাম শুনেছিলাম। তিনি বড়লোকের অপদার্থ ছেলে। বুদ্ধিশুদ্ধি কম। বাপের জোরে মন্ত্রী হয়েছেন। কোন এলেম নেই। রাজনৈতিক বুদ্ধি নেই।

কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখেছি এইসব অভিযোগই অতিরঞ্জিত। তবে তিনি বেশ ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মধ্যে কিছুটা সারল্যও ছিল যা প্রফুল্ল সেন প্রমুখের মধ্যেও দেখেছি।

নরেনদার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, বিনয় টিকাদারকে বিধানসভার কোন একটি আসনের টিকিট পাইয়ে দেওয়া। বিনয়বাবুরও যে রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল না তা নয় তবে তিনি রাজনীতির লোক ছিলেন না। ছিলেন পুরোপুরি অধ্যাপক। এবং যথার্থ একজন সজ্জন মানুষ।

তরুণবাবু চা খাওয়ালেন। সকলের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন—আপনাকে কলেজে একটি সম্বর্ধনা দিতে চাই।

তরুণবাবু রাজি হয়ে গেলেন। তবে দুঃখ করে বললেন—রাজনীতি আর ভাল লাগে না বিনয়বাবু। আমি হাবড়ায় একটা কলেজ করাব জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দান করলাম। সবাই বলতে লাগল, আমি ভোটে দাঁড়াবার জন্য এই টাকা দিয়েছি। সেই দুঃখেই তো ডাক্তার রায়কে বললাম, আঙ্কল, আমি আর হাবড়া থেকে দাঁড়াব না। আমাকে অন্য কনস্টিট্যুয়েন্সি দিন।

এমন সময় অভিজ্ঞ বৃদ্ধের মত আমি বলে ফেললাম— এর জন্য দুঃখ করছেন কেন তরুণদা। আপনি যাঁর শিষ্য সেই চৈতন্যদেবকে দেখুন ; তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রেমধর্ম প্রচার করলেন। কিন্তু তাঁকে কলসির কানা খেতে হল.....। স্বয়ং ক্রাইস্ট মানুষের মঙ্গল করতে গিয়ে ক্রুশিফায়েড হলেন।

তরুণবাবু আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল এই সামান্য কথাই যেন তাঁকে ভীষণভাবে মনের জোর এনে দিল।

তিনি বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ ভাই। মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি .... আমার ঠাকুর্দা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ অমিয় নিমাই চরিতে এই সব কথা লিখে গেছেন।

আমি বললাম—আমি পড়েছি তাঁর বই।

তুমি পড়েছ? তরুণবাবু বিস্মিত।

বিনয়বাবু বললেন--ওর খুব পড়াশোনা আছে। মোটামুটি অনেক বাংলা বই টই পড়েছে। বক্তৃতাও দেয় ভাল।

ওই বক্তৃতা শুনেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হলেন তরুণকান্তি ঘোষ। তিনি কলেজে আসতে রাজি হলেন।

কলেজে তরুণ বাবুকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল। ওই অনুষ্ঠানে অমিতেশবাবু বললেন—আমরা শুনে খুব খুশি হয়েছি আপনি এই অঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই কলেজ বহু মানুষের সংগ্রামের ফসল। আমাদের অনেক অসমাপ্ত কাজ রয়ে গেছে। আপনি আশা করি আমাদের সাহায্য করবেন।

সবশেষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার ধন্যবাদ দেওয়ার পালা।

আমি বললাম—আমরা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আপনার আগমনে ধন্য। আমরা আশা করব আমাদের তরুণদা আমাদের তরুণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন।

নরেনদা এরপর একদিন বললেন, তুমি সেদিন বক্তৃতা দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছ। তরুণবাবু তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।

আমি বললাম, আমি তো মাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। বক্তৃতা দিলাম কোথায়?

নরেনদা বললেন—তাতেই কাজ হয়েছে। শোন, তুমি বলেছিলে না তুমি একটা পত্রিকা বার করতে চাও।

আমি বললাম—হ্যাঁ। বিদ্যার্থী একটা মাত্র সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আর একটা কাগজ বার না করা পর্যন্ত হাত নিসপিস করে। তাই আপনাকে বলেছিলাম।

নরেনদা বললেন—আমি একটা পাক্ষিক বার করার কথা ভাবছি। পলিটিক্যাল ফর্টনাইটলি। হাবড়া অঞ্চলের খবরাখবর থাকবে। তুমি হবে সম্পাদক। কী নাম দেওয়া যায় বলতো? আমি বললাম—জাগৃহি। তার মানে জাগো। এই নামটা আমার মনে কিছুদিন ধরেই গুনগুন করছিল।

এত কঠিন নাম কী পাবলিক বুঝতে পারবে?

আমি রবীন্দ্রনাথ আউড়ে বললাম—

কঠিনেরে ভালবাসিলাম। সে কখনও করে না বঞ্চনা।

নরেনদা বললেন— তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় বাপু। তোমার মুখের ভেতর ছাপা মেশিন বসানো আছে। সব কথা যেন ছেপে বেরিয়ে আসে।

কিছুদিনের মধ্যেই জাগৃহি শুরু হয়ে গেল।

আমিই খবরাখবর যোগাড় করে কপি লিখে প্রেসে দিলাম। প্রথম সংখ্যা আটপাতার ট্যাবলয়েড কাগজ মাসখানেকের মধ্যে বেরিয়ে গেল। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সম্পাদক—আমি।

বেশ কিছু ইস্যু বিলি করা হল। কিন্তু তাতে মন ওঠে না। আমি চাই লোকে সে সময় পয়সা দিয়ে কিনুক। দাম দশ'পয়সা। তবু পয়সা দিয়ে কাগজ কেনার লোক কম। দঃ চাতরা থেকে সংগঠনী নামে একটি পাক্ষিক বেরুতো। কল্যাণগড় থেকে

সংস্কৃতি বলে একটি পত্রিকা বেরুতো। আমি স্বপ্ন দেখলাম জাগৃহি একদিন জেলার বড় পত্রিকা হবে। বারাসত থেকে বীরু সরকার বার করতেন বারাসত বার্তা। ফৌজদারি মামলায় ফেঁসে গিয়ে যখন বারাসত কের্টে যেতে হত তখন আমি এক ফাঁকে গিয়ে বীরুবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এসেছিলাম। স্টেশনের কাছে একটি ছোট্ট ঘরে রোগা, চশমা পরা ওই ভদ্রলোক ছাপাখানা করেছিলেন। নীলাম ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন ছাড়াও কিছু কিছু খবরও প্রকাশিত হত।

সেই পুরনো আলাপ ঝালিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম।

মহকুমার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি সাংবাদিক সংঘও তৈরি করে ফেললাম। যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল ২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের সঙ্গে। জেলা সাংবাদিক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ সম্পাদক) এর সঙ্গে যোগাযোগ হল। ফণীদা তখন পঞ্চাশোর্ধ্ব ; সংঘের সভাপতি। অদম্য উৎসাহ সভাসমিতিতে। প্রতি রবিবারই জেলার কোথাও না কোথাও বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেলে উপস্থিত হতেন।

হাবড়ায় তাঁকে সাংবাদিক সংঘের একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছিলাম। তাঁর বক্তৃতার কথা এখনও আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন মড়ার যেমন কোন জাত নেই, সাংবাদিকদেরও তেমন কোন জাত নেই। তাঁর ওই কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রেখেছি।

ফণীদার সঙ্গে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল। ভারতবর্ষ অফিসে তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা করেছি। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের ওপরতলায় তিনি বসতেন। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ভাল দেখতে পেতেন না। পরবর্তীকালে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে যান। প্রস্ট্রেটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মূত্রাশয় স্বাভাবিক ভাবে কাজ করত না। অপুত্রক ফণীদা দারিদ্র্য ও অসুখে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে কোনদিন হাহুতাশ করতে দেখিনি। তিলে তিলে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু মুখের হাসি কখনও মেলায়নি।

অহঙ্কার করার মত অনেক কিছুই তাঁর ছিল। সোদপুরের মত শহরতলি থেকে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত পত্রিকার তিনি দীর্ঘকাল সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু শিশুর মত নিরভিমান। যে ডেকেছে থার্ড ক্লাশের একটি টিকিট কেটে সেখানে চলে গেছেন। কখনও পাথেয় চাননি। যে কেউ লেখা দিতে বললে, তিনি যত্ন করে লেখা পাঠিয়ে দিতেন তা সে যত ছোট কাগজই হোক।

জাগৃহি বিক্রি করার জন্য আমি নিজেই উদ্যোগ নিলাম। মছলন্দপুর থেকে তিনমাইল দূরে সাতপুর গ্রামে সপ্তাহে দুদিন বড় হাট বসত। এরকম বড় হাট ছিল চাঁদপাড়ায়। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে চাঁদপাড়া হাটে খেজুরের গুড় কিনতে গিয়েছি। সাতপুরের হাটের নাম শুনে এসেছি বাবার কাছে। ওখানে খাজনা আদায়ের জন্য বাবা প্রায়ই যেতেন।

আমি সাইড ঝোলা একশ কপি জাগৃহি ভরে, লিফলেট ও একটি চোঙা নিয়ে পর পর কয়েকবার সাতপুরের হাটে গেলাম।

ট্রেন থেকে নেমে তিন কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হত। প্রথম দিনই চোঙা হাতে আমার মত আরও দু'জনের সঙ্গে আলাপ হল। একজনের নাম বিরল বিশ্বাস। সে আসত ঠাকুরনগর না চাঁদপাড়া থেকে। স্বপ্নাদ্য মাদুলি নিয়ে। তার একটা ঝোলায় ছিল একগাদা মাদুলি যা পরলে অম্বল থেকে অর্শ সমস্ত রোগই আরাম হয়। আর এক ঝোলায় ছিল প্রচুর পোস্টকার্ড আর মানি অর্ডারের রসিদ।

বিরল চোঙা মুখে দিয়ে চেঁচিয়ে লোক জড় করত। তারপর লোক জমলে সে তার অত্যাশ্চর্য মাদুলির গুণ বর্ণনা করত।

মাননীয় জনাব ও মহাশয়েরা,

এই যে এতক্ষণ আমি আপনাদের কাছে অত্যাশ্চর্য মাদুলির গুণ বর্ণনা করলাম তা যদি আপনার প্রয়োজনে লাগে তাহলে তার জন্য এখনই আমাকে কোন টাকা দেবার প্রয়োজন নেই। এখন বিনামূল্যে নিয়ে গিয়ে ধারণ করুন। আপনার রোগ আরাম হলে তবেই আমাকে আপনারা মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠাবেন ও একটি করে পোস্টকার্ডে লিখে জানাবেন আপনারা নিরাময় হয়েছেন।

অনেকে এই শর্তে মাদুলি নিতে রাজি হতেন। তাঁকে সকলের সামনে একটি আসনে বসতে হত। তার হাতে মাদুলিটি তুলে দিয়ে বিরল বলতেন—এইবার হাত দুটো মুঠো করেন—অ্যাহ। প্রথমে দ্যাখেন হাতের তালু গরম ঠেকছে কিনা।

লোকটি বলত—হ্যাঁ একটু একটু গরম ঠেকছে।

বিরল বলত, ব্যস, এতে প্রমাণ হল, আপনার মাদুলিতে কাজ হবে। এইবার আমি যা বলি তাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সকলকে শোনায়ে বলেন—'আমি শ্রী অথবা জনাব এতদ্বারা ঈশ্বর বা আল্লার নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রোগ নিরাময় হইবা মাত্র আমি নগদ পাঁচ টাকা মানি অর্ডার যোগে এই ঠিকানায় পাঠাইব। না পাঠাইলে আবার আমি আরও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইব....

বিরল বিশ্বাসের সঙ্গে ট্রেনে দেখা হত। এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনেক গল্প করতে করতে যেতাম।

আমি বলতাম—মাদুলি নেওয়ার পর কেউ আপনাকে টাকা দেয় বিরলবাবু?

বিরল বিশ্বাস বললেন—সবাই যে দেয় তা নয়, তবে অধিকাংশই টাকা পাঠায়। প্রতিদিনই আমি একটা দুটো এম.ও পাই। এই ভাবেই সংসার চলছে। আমি ওঁকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। গোবরডাঙ্গায় কানাই নাটশাল পাড়ায় এক জাগ্রত বাবার থান আছে। সোম শুক্রবার বেল গাছের গোড়ায় শিবপুজো হয়। এককালে খুব জমজমাট ছিল। পরে এমন অবস্থা যে আর পুজো হয় না। তখন পাড়ার লোকেরা মিলে আমার বাবাকে অবৈতনিক সেবাইত নিয়োগ করল। বাবা মাঝে মাঝে বাইরে গেলে আমি গিয়ে সেবাইত হতাম। মাঝে মাঝে পূর্ব পাকিস্তান বর্ডার পেরিয়েও কিছু যাত্রী আসত। তারা এসে মাদুলি চাইত। এখানকার মাদুলি নাকি অব্যর্থ। বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন—মাদুলি চাইলে পিছনে গিয়ে যাত্রীর চোখের আড়ালে বেলগাছের শিকড় পুরে মাটি বন্ধ করে তাকে দেবে। বলবে শোধন করে ধারণ করতে। পাঁচ সিকে

দক্ষিণে নিতে ভুলবে না।

একদিন এক টিবি রোগী এল পাকিস্তান থেকে। লোকটিকে দেখে আমার মায়া হল। আমি বললাম, তোমায় মাদুলি দিচ্ছি বটে, কিন্তু ওষুধ খেতে ভুলো না।

মাস আষ্টেক পরে একদিন দেখি সেই টিবি রোগীযাত্রীটি পুজো নিয়ে এসেছে। তার চেহারা ভাল হয়ে গিয়েছে। তার অসুখ সেরে গেছে।

সে এসেই গড় হয়ে আমায় প্রণাম করে বলল—আপনার হাত দিয়েই বাবা বিশ্বনাথ আমার জীবন ফিরিয়ে দিলেন। আপনার মাদুলিই আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

বিরল শুনে বললেন, তোমাকে সত্যি কথা বলি। আমি এই যে বুজরুকি করে খাই তা পেটের জ্বালায়। পাকিস্তান থেকে এক বস্ত্রে আইছিলাম। ছটা প্যাট। অনেক কিছু করার চেষ্টা করছি। কিছুই হয়নি। শ্যাষে এই মাদুলির ব্যবসা ধরলাম। আসলে অনেক রোগ আছে যা শুধু ভয়ের আগুনে বৃদ্ধি পায়। মাদুলিডা মনের জোর এন্যে দেয়। ব্যস ফুরয়ে গেল।

আমারও তাই এখন বিশ্বাস হয়েছে। মানুষের মন বড় দুর্বল। মন শুধু অকারণে বিপদের আশঙ্কা করে। মন কাউকে নির্ভর করার মত খুঁজে পায় না। তখন সে নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে মরে। এজন্য পাগলের কখনও শরীর খারাপ হয় না।

বিরলের মত আমিও চোঙা ফুঁকে লোক জড় করতাম। বলতাম—দারুণ খবর। দারুণ খবর। সারা দুনিয়ার খবরের জন্য আপনাদের এত মাথা ব্যথা। কিন্তু আপনার চারপাশে কী হচ্ছে আপনি জানে না। জাগৃহি পড়ুন। জাগৃহিতে আপনার এলাকার খবর পাবেন। মাত্র দশ পয়সা।

কিন্তু আট দশ কপির বেশি বিক্রি করতে পারতাম না।

দু সংখ্যা বার করেই নরেনদার উৎসাহে ভাটা পড়ে গিয়েছে। তাঁর নিজেরই লোকের কাছে চেয়ে চিন্তে চলে। এর বাড়ি ওর বাড়ি যান। ট্রেন ভাড়া বাস ভাড়াটাও পরিচিতদের কাছ থেকে চেয়ে নেন। সাতদিন অন্তর দাড়ি কামান। পরনের জামাটা কাচার সময় পান না। তিনি কী করে পত্রিকা চালাবার টাকা পাবেন। বিজ্ঞাপন দেবারও তেমন চল হয়নি গ্রাম দেশে।

জাগৃহি বন্ধ হয়ে গেল। সে সময় হাবড়ার আর এক ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। নাম বললেন ঃ বিমল দাস। বয়সে তরুণ। ছাপাখানার কর্মী ছিলেন। তিনি একটি কাগজ বার করেছেন হাবড়া বার্তা। একজন সম্পাদক চান। জাগৃহি দেখেছেন। তাঁর মতে এটি একটি সুসম্পাদিত কাগজ। এখন তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা আর আমার প্রতিভা যদি এক সঙ্গে মেলে তাহলে তিনি হাবড়া অঞ্চল কাঁপিয়ে দেবেন।

আমি তাঁকে বললাম—ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষার পর আমি তাঁর প্রস্তাব বিবেচনা করব।

ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলা বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব করলেন। তাঁর মত একজন বিচক্ষণ লোক কেন এরকম একটি অবাস্তব প্রস্তাব করে বসলেন

তা আমার কাছে আজও অজ্ঞাত। তাঁর যুক্তি ছিল। এতে বিহারের লক্ষ লক্ষ বাঙালির উপকার হবে। বাংলা ভাষার প্রসার ঘটবে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বিহারের সঙ্গে বাংলা সংযুক্ত হলে বাংলার শিল্পের কাঁচামাল পাবার পথ সুগম হবে। উন্নত হবে বিদ্যুৎ সরবরাহ। কিন্তু অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনুন্নত বিহারের আর্থিক দায়ভাগও পশ্চিমবঙ্গকেও বহন করতে হবে। চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রতিযোগিতা উভয় রাজ্যের সম্পর্ককে কলুষিত করবে। তদুপরি যুক্ত বিধানসভায় বিহারের প্রতিনিধিদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে।

এখন যত খতিয়ে দেখি তত এই প্রস্তাবের অসারতা অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু আমি তখন পার্টি করি। তাই পার্টির সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত। বঙ্গ বিহার সংযুক্তির সপক্ষে আমি বারাসত মহকুমায় নানা সভাসমিতির আয়োজন করতে লাগলাম। এ ব্যাপারে আমার এক সিনিয়রকে সহযোগী পেলাম। দিলীপ বসু। আমার চেয়ে তিন বছরের সিনিয়র। দিলীপদা একজন খাঁটি কংগ্রেসী ছিলেন। খাদি পরতেন। ছোটখাটো মানুষটি পাশকোর্সে বি. এ. পাশ করেই স্বাবলম্বী হবার জন্য বারাসতে একটি যশোর চিরুণী কারখানা খুলে বসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে আইন পড়ে প্র্যাকটিশ করতে শুরু করেন। সত্তরের দশকের শেষে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন ও একজন সক্রিয় বিচারক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

দিলীপদার সঙ্গে বঙ্গবিহার সংযুক্তির সমর্থনে পরপর কটি সভা করি। তার মধ্যে একটি বারাসত মিলনী সিনেমা হলে। ওই সভায় তরুণকান্তি ঘোষ এসেছিলেন। তরুণকান্তি ওই সভায় বলেছিলেন—বঙ্গবিহার সংযুক্তি হলে বিহারের সব রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় নাম লেখা হবে। বারাসতের সভা ছিল কর্মী সভা। তাই ওই কথা শুনে সবাই হাততালি দিল। কিন্তু গোবরডাঙ্গা কলেজের একসভায় আমি এই পয়েন্টটি বলতে গেলে ছাত্ররা এমন বিদ্রূপ করে উঠল যে আমি পালাতে পারলে বাঁচি।

সে সময় পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের খুব বেশি সমর্থক ছিল না। খুব বেশি কলেজ তাদের হাতে ছিল না। বঙ্গবিহার সংযুক্তির সমর্থনে ছাত্রপরিষদ নেতারা কলকাতায় কয়েকটি পথ সভা করেন। এই সভাতে খুব একটা লোক হত না। তবে পরিষদের কয়েকজন ভাল বক্তা ছিল। একজন শ্যামল ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে অতুল্যবাবুর কোপে পড়ে তিনি ছাত্রপরিষদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আমার দেখা তরুণ কংগ্রেসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বক্তা।

শ্যামলদা কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দেবেন শুনে আমি গোবরডাঙ্গা থেকে ছুটে গেলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দিকে, গোল দিঘির পুব দিকে সভা শুরু হল। মাইক নিয়ে শ্যামলদা জমিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, এমন সময় দমাদম ইট এসে পড়ল। একটা ইট এসে লাগল আমার ডান হাতে। জামা ছিঁড়ে ইটটি তীক্ষ্ণ বর্শার ফলার মত আমার বাহুমূলে আঘাত করতেই আমি সভা ছেড়ে পালালাম। মুহূর্তের মধ্যে লাঠিসোঁটা নিয়ে বামপন্থী ছাত্ররা এসে আমাদের সবাইকে হঠিয়ে মঞ্চ

দখল করে নিল। এবার সেই মঞ্চ ও মাইক থেকে তারা সংযুক্তির বিপক্ষে সভা করে চলে গেল।

ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ঠিক করলেন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন গ্রুপকে সংযুক্তির তাৎপর্য বোঝাবেন। প্রতিদিনই তিনি তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করতে লাগলেন। কাগজে তার বিবরণ ফলাও করে বেরুতে লাগল।

কী মনে ভেবে আমি ডাঃ রায়কে একটি চিঠি লিখলাম—আমরা গোবরডাঙ্গা কলেজের ছাত্র অধ্যাপকেরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কিছুদিনের মধ্যেই জবাব পেলাম—ডাক্তার রায় নিজের হাতে দু ছত্র লিখেছেন।

তোমার চিঠি পেয়েছি। ২ মে সন্ধ্যা সাতটায় আমার বাড়িতে চলে এসো।

এতটা ভাবিনি তাই খুবই রোমাঞ্চ হল ডাক্তার রায়ের নিজের হাতে লেখা চিঠিটি পেয়ে। পনের জনের মত একটা গ্রুপ ঠিক করে ফেললাম। ঠিক হল অধ্যাপক বিনয় টিকাদার আমাদের সঙ্গে যাবেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ওই বিখ্যাত বাড়িটির নিচের তলায় একটি ঘরে আমাদের বসানো হল। তারপর ঠিক সাতটার সময় পাশের ঘরে ডাক্তার রায় আমাদের ডাকলেন।

এর আগে তাঁকে আমরা দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু কখনও মুখোমুখি হইনি। ডাক্তার রায় বঙ্গবিহার সংযুক্তির সমর্থনে তাঁর যুক্তি দিলেন। বোঝালেন দুই রাজ্যের সম্পদ এক জায়গায় হলে এই যুক্তরাজ্য ভারতের একটি শক্তিশালী রাজ্য হয়ে উঠবে। তিনি আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বিনয়বাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে ডাক্তার রায় বললেন—মাস্টার, ছেলেদের আত্মগরিমা শেখাও।

ডাক্তার রায় কাউকে আপনি বলতেন না। অপরিচিত ভদ্রলোকদেরও তিনি তুমি বলতেন। সেক্রেটারিদেরও তুমি বলতেন। পরবর্তীকালে কয়েকবছর পরে আমি একবার তাঁর কাছে একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গিয়েছিলাম তখন তিনি আমায় আপনি বলে সম্বোধন করে খটকায় ফেলে দেন। সম্ভবত সেদিন তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন।

আমি বুঝতে পারছিলাম বঙ্গবিহার সংযুক্তি বাঙালির এক সেন্টিমেন্টাল ইস্যু। এই ইস্যুতে জনমতের সায় নেই। একে তো বামপন্থীরাই সে সময় রাজনৈতিক জনমতকে প্রভাবিত করত। যুবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বামপন্থী হওয়াটা তখন ফ্যাড। তার ওপর এটি তো একটি সেন্টিমেন্টাল ইস্যু। বাঙালি কিছুতেই এটা মেনে নেবে না।

ঠিক এই ইস্যুতে কলকাতার উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়ে গেল। কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন ব্যারিস্টার অশোক সেন। বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে প্রার্থী দাঁড় করাল মোহিত মৈত্রকে। অশোক সেন হেরে গেলেন।

ডাক্তার রায় জনগণের রায় মেনে বঙ্গবিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন।

১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লিতে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের ডাকে একটি ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। গোবরডাঙ্গা কলেজের ইউনিয়নের কাছে ডেলিগেশন পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ এল।

সাধারণ সম্পাদক অনিল হাওলাদার আমায় চিঠিটি দেখিয়ে বলল, কী করা যায়।

আমি বললাম, প্রিন্সিপ্যাল যদি যাবার অনুমতি দেন আমরা যেতে পারি।

অমিতেশবাবু বললেন—সেক্রেটারি অনিল ও ম্যাগাজিন সম্পাদক পার্থ দুজনেই যাক।

আমরা দিল্লি রওয়ানা হয়ে গেলাম। এই আমার প্রথম দিল্লি ভ্রমণ। তখন হাওড়া দিল্লি থার্ড ক্লাশের ভাড়া ছিল সাতাশ টাকা। আমরা দুজনে জনতা এক্সপ্রেসে দিল্লি পৌঁছলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম এন ইউ এস এর মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই রয়েছে। একদিকে বর্তমান সম্পাদক প্রাণ সগরওয়াল। প্রাণ পরবর্তীকালে সাংবাদিকতা করত। তার সঙ্গে অনেকবার দেখাও হয়েছে। ছাত্রনেতা প্রাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে সি আই এর লোক। নিষিদ্ধ দেশ ফরমোজা ভ্রমণ করে এসেছে। তার বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা ডাঃ সেলাট বলে এক ছাত্র। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ তো হবেই। গুজরাতের ছেলে। শোনা যায় তিনি মেডিকেল পড়ার সময় বছরের পর বছর ইচ্ছা করে পাশ করতেন না। কারণ একবার পাশ করে গেলে আর ছাত্র পলিটিক্স করতে পারবেন না। তখন কলেজ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাকে পাশ করিয়ে দেওয়া হবে। সেলাট প্রতিটি পরীক্ষায় সামান্য কিছু লিখে খাতা জমা দিতেন। সেই লেখার ওপর ভিত্তি করেই তাঁকে পাশ করিয়ে দেওয়া হল।

বিস্মিত সেলাট দেখলেন তিনি পাশ করে গেছেন। তাতে তাঁর কী রাগ। তবে তাতেও তিনি দমলেন না। ওকালতিতে ভর্তি হয়ে গেলেন।

এন ইউ এস-এর সভামঞ্চে মাইক দখলের জন্য দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রীতিমত মারপিট শুরু হয়ে গেল। প্রাণ সগরওয়াল বিতাড়িত হলেন। এই গোলমালের মধ্যে কলকাতার এক ছাত্র প্রবীর স্যান্ডেল এন ইউ এস-এর নতুন সেক্রেটারি হলেন।

প্রবীর স্যান্ডেল পুরোদস্তুর সাহেব। দারুণ ইংরাজি বলেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পরনে স্যুট। তিনি খোদ প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন। তখন সবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করছেন।

প্রবীর পরবর্তীকালে ভারত সরকারের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির বড় অফিসার হয়েছিলেন। আমার কর্মজীবনে আমার সঙ্গে তাঁর দু-একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল।

দিল্লিতে গিয়ে অনেকগুলো লাভ হল। তার মধ্যে একটি হল আত্মোপলব্ধি। ওখানে গিয়ে বুঝলাম রাজনীতিতে জাতীয় স্তরে কলকে পেতে গেলে ইংরাজি ও হিন্দি অনর্গল বলতে হবে। এ দুটোতেই আমি রপ্ত নই। দ্বিতীয় লাভটি হল, দিল্লিকা লাড্ডু চোখে দেখা। তখন যাযাবরের দৃষ্টিপাত পড়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। শব্দ নিয়ে খেলা করার প্রবণতা জাগছে। রম্যরচনা আর ভ্রমণ মিলিয়ে ভ্রম্যরচনা লিখে ফেললাম কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য 'দিল্লি ঘুরে এলাম।'

এক লেখাতেই বাজি মাত। কত লোক যে সে লেখার প্রশংসা করল তার ইয়ত্তা নেই। একে তো লেখক খ্যাতি ছিলই—এই লেখা বার হবার পর, মনে হল বোধ হয় লেখক জীবনই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কলকাতার বান্ধব বস্ত্রালয় থেকে

জনৈক লক্ষ্মণ বিশ্বাস আমায় অভিনন্দিত করে চিঠি লিখলেন। তাঁর একটি কাগজ আছে সেখানে লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করতে চান। আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। শুধু তাই নয়, প্রতিবছর ইডেন গার্ডেনে একটি যুব উৎসব হত। গুরুদাস দাশগুপ্ত ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। ওই উৎসবের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আমি লেখাটি পাঠাতেই প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

অন্যদিকে কলেজে বিরোধীরা আমাব ওই লেখাটি কোট করে করে প্রচার করতে লাগল আমি ইউনিয়নের পয়সায় দিল্লি বেড়িয়ে এসেছি। যে অনুষ্ঠানটিতে গিয়েছিলাম, সেটি যে ফালতু একটি সংস্থা আমার লেখার মধ্যেই তার স্বীকারোক্তি রয়েছে। তারা আমার লেখা উদ্ধৃত করে যা তা বলতে লাগল।

এইসব নানা কারণে ক্লাসে আমার জনসমর্থন কমে গেল। পরের বছরের নির্বাচনে আমি ক্লাশ থেকে জিতলাম কিন্তু ভোট কমে গেল।

১৯৫৭ সালে ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন হল মার্চ মাসে। এই নির্বাচনের যেদিন ফলাফল বেরুচ্ছে তার পরের দিন থেকে আমার পরীক্ষা শুরু।

কিন্তু তখন পরীক্ষা আমার মাথায় নেই। তরুণবাবুর বিপক্ষে জবরদস্ত প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী। ওই বিখ্যাত বিপ্লবীকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমাকে তাঁর বিরুদ্ধেই ক্যামপেন করতে হত। কারণ তরুণবাবুকে আমার জেতাতেই হবে।

নির্বাচনে তরুণবাবুর প্রচারের কোন ত্রুটি ছিল না। অসংখ্য নির্বাচনী অফিস তৈরি হয়েছিল। ফ্যাকটরি থেকে অর্ডার দিয়ে হাজার খানেক নতুন সাইকেল আর কয়েক হাজার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন আর পোস্টার আনা হয়েছিল। তরুণবাবু গ্রামে গঞ্জে গিয়ে খোল করতাল নিয়ে খালি পায়ে নগর সংকীর্তনে বেরুতেন। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রচারের জন্য মৌলবী মৌলানাদের আনা হয়েছিল।

আমি তাঁর বিভিন্ন সভার অন্যতম প্রধান বক্তা হয়ে গেলাম। তরুণবাবুও বেশ ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। আমায় বলেছিলেন, ১৯৫২ সালের নির্বাচন যখন প্রথম দাঁড়াই তখন কিছুই বলতে পারতাম না। তারপর পাঁচ বছর ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্র্যাকটিশ করেছি।

রাজনীতির পেশার মধ্যে যে উত্তেজনা আছে তা আব কোন পেশায় নেই। শুধু উত্তেজনাই নয়, হাজার হাজার লোকদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা করাটা অনেকটা আগুন নিয়ে খেলার মত। কিন্তু অনেক খেলোয়াড় আগুনের খেলাও তো নানাভাবে দেখায়।

বক্তৃতা যারা দেয় তারা বক্তৃতা দিতে পারে এবং দিতে ভালবাসে বলেই বক্তৃতা দেয়। আমি আবিষ্কার করলাম, বক্তৃতা দিতে আমি ভালবাসি। রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়া অনেকটা অভিনয়ের মত। চোখে মুখে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হয়। কখনও আবেগ, কখনও যুক্তি, কখনও ছলছল চোখ ছদ্ম ক্রোধ— অভিনেতাব মত গলা ওঠাতে হয়, নামাতে হয়। উদ্দেশ্য একটাই ঃ ঘনঘন করতালি। এই আর্ট আমি রপ্ত

করে ফেলেছিলাম।

তরুণবাবু জিতলেন বিপুল ভোটে। পরদিন পরীক্ষা শুরু। বাড়িতে বসে হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে পড়ছি। ছেলেরা দল বেঁধে এসে খবর দিয়ে গেল তরুণবাবু জিতেছেন।

মনে হল, আমিই যেন ভোটে জিতলাম। পড়া ফেলে রেখে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বিজয় মিছিলে বেরিয়ে পড়লাম। বিজয়ের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বেগুনি রঙের সার্জের পাঞ্জাবি পরা, চোখে চশমা এক প্রবীণ ভদ্রলোকের মুখখানি বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল। একদা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মত এক রোমাঞ্চকর অভিযানের তিনি সৈনিক ছিলেন। যাঁর এতদিন ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেওয়ার কথা ছিল।

সেই পরাজিত নায়ক এই মুহূর্তে এখন হয়তো পার্টি অফিসে ভাঙা টেবলের সামনে বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন।

পুরনো ইতিহাস যত গৌরবদৃপ্ত হোক চলমান জীবন তাকে আবর্জনার মত ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়ে তার রাস্তা করে নেয়।

অম্বিকা চক্রবর্তীর শেষ পরিণতি হয়েছিল পথ দুর্ঘটনায় এক রহস্যজনক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত মানুষকে দেখেছি চরম দুরবস্থার মধ্যে অগৌরবের গ্লানি নিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হল না। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলাম অধিকাংশ প্রশ্নই আমার পড়া নেই। এখনও মাঝে মাঝে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি, পরীক্ষার হলে বসে কিছুই লিখতে পারছি না। গলা শুকিয়ে আসছে আতঙ্কে। এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ রাইটিং। স্টপ রাইটিং। কিন্তু আমি শেষ মুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এমন সময় ইনভিজিলেটর আমার খাতা কেড়ে নিল।

এবারেও সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করলাম।

আবার যথারীতি বাড়ি থেকে চাকরি করার চাপ এল। সেই ক্লাশ এইট থেকে চাকরির চেষ্টা করছি। ফাঁকি দিয়ে দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। এবার আর চাকরির চেষ্টা না করলেই নয়।

খবরের কাগজে চাকরি আমার পক্ষে সম্ভব হবে না জানি। কারণ গ্রাজুয়েট ছাড়া খবরের কাগজে তখন আর চাকরি হত না। আমার ইস্কুলের সহপাঠীরা একে একে রেলে কিংবা রাজ্য সরকারি অফিসে কেরানীর চাকরি পেয়ে গেল। আমার সহপাঠী দুর্গা রেলের গার্ড হয়ে গেল। সুপ্রকাশ ইলেকট্রিক কোচের মোটরম্যান। তার প্রেমিকাকে বিয়েও করে ফেলেছে। হানিফ চিত্রা বলে ব্রাহ্মপরিবারের একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে পাকিস্তান পালিয়ে গিয়েছে। অনন্ত দে রেলের কমার্সিয়াল ক্লার্ক। আর আমি, যার সবচেয়ে বেশি চাকরির দরকার সে কিনা ছাত্র রাজনীতি আর শখের সাংবাদিকতা করে জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করছি।

একজন বলল— তোর সঙ্গে তো তরুণবাবুর এত খাতির। যা-না। তার কাছে

গিয়ে চাকরির কথা বল না। উনি স্টেট বাসে খুঁটুরা হৃদয়পুরের চার পাঁচজন ছেলেকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। স্টেটবাসের কন্ডাক্টরের চাকরি খারাপ নয়। হাজার টাকার ওপর বেতন। তা বাদে ইনসেনটিভ। অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছেলে কনডাক্টরি করছে।

কিন্তু আমি কী করে বলব তরুণদা, আমায় একটি চাকরি দিন।

কিন্তু বাড়ির অবস্থার কথা ভেবে একদিন তরুণকান্তির শিশির কুঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। কিন্তু মুখে প্রার্থনার কথা বলতে সঙ্কোচ হল। তাই একটি কাগজে সব কথা লিখে নিয়ে গেলাম। হৃদয়পুরে যশোর রোডের উপর বিশাল বাগান বাড়ি শিশির কুঞ্জ। আধুনিক জীবন যাপনের সমস্ত উপাদানই সে বাড়িতে আছে।

সকাল থেকে ওই বাড়িতে প্রার্থীদের ভিড় লেগেই আছে। তরুণবাবু যতটা সম্ভব সবাইকে সাহায্য করতেন। বিশেষ করে দুঃস্থদের জন্য মোটা অর্থ সাহায্যের বাজেট ছিল ঘোষ পরিবারের।

বাড়ির সমস্ত ভিড় সামলাতেন বারাসাতের পুরনো কংগ্রেস কর্মী ভাগীরথী চাটুজ্যে। ভাগীরথীদা আমায় স্নেহ করতেন। শিশির কুঞ্জে আমি আগেও কয়েকবার গিয়েছি। আমার জন্য অবারিত দ্বার ছিল। কিন্তু নিজে কখনও প্রার্থী হয়ে যাইনি। তাই খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। একটি কমলা রঙের ফিনফিনে খাদির পাঞ্জাবি পরে তরুণবাবু সোফায় বসে আর্জি শুনছিলেন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। ডাক্তার রায় এবার তাঁকে কৃষিমন্ত্রী করেছেন। আমাকে দেখে তরুণবাবু বললেন—কী খবর তোর? (তরুণবাবু সবাইকে তুই বলতেন। এমনকী পিতৃব্যতুল্য ভাগীরথীদাকেও)।

আমি বললাম—এই বি এ পড়ার কথা ভাবছি।

ভাল করে পড়াশোনা কর।

আমি বললাম—আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা ছিল তরুণদা—

ঃ তা বেশ তো। আমি একটু পরে রাইটার্স যাবো। তুই আমার সঙ্গে চ। একসঙ্গে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।

আমি হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম।

কিন্তু যাওয়া বললেই যাওয়া নয়। যাত্রার আগে কিছু নিত্যকর্ম করেন তরুণকান্তি। বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে বেরুলেন। সোজা চলে গেলেন কোণের মন্দিরে। সেখানে আধঘণ্টা ধরে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর স্বামীজী এসে তার হাতে চরণামৃত ও তুলসীপাতা দিলেন। সেটি খেয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন পাঁচমিনিট ধরে।

তারপর বললেন—চ।

উনি চাপতেন একটি শেভ্রোলে। তখনও পর্যন্ত আমি খুব বেশি মোটর গাড়ি চাপিনি। বিদেশী গাড়িতে চড়া সেই প্রথম। বসামাত্র গদিতে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। সামনের আসনে সিকিওরিটি। আমি ও তরুণবাবু পিছনের আসনে।

গাড়ি নিঃশব্দে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে।

তরুণবাবু মালা জপছেন।

আমি সাহস সঞ্চয় করে চাকরির কথা বলতে পারলাম না। চিঠিটিও দিতে পারলাম না। আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি যুগান্তরের গোবরডাঙ্গা সংবাদদাতা হই। তখন যুগান্তরে প্রায় প্রতি বড় গ্রাম শহরেই নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল। তারা একটি লেটার হেড ও প্রতিদিন এক কপি করে ফ্রি যুগান্তর পেত। তার বিনিময়ে স্থানীয় এলাকায় তাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি। ১৯৫৬ সালে বাদকুল্লায় পশ্চিমবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় এই মফঃস্বল সংবাদদাতাদের দারুণ প্রতিপত্তি দেখেছি। কৃষ্ণনগরের মোহিত রায়, নির্মল ঘোষ, সমীরেন্দ্র সিংহরায়, কালিকা প্রসাদ ভাদুড়ির মত সফল সফল মফঃস্বল সাংবাদিকদের সেই প্রথম দেখি।

আমার মনের মধ্যে ইচ্ছা হল, তরুণবাবুর কাছে যদি একটি মাত্র বর চাইতে হয়। তাহলে আমি একটি বরই চাইব—প্রভু তুমি আমায় যুগান্তরের মফঃস্বল সংবাদদাতা করে দাও।

কিন্তু বলতে গিয়ে মফঃস্বল কথাটা মুখে এল না। বললাম ঃ তরুণদা, আমায় যদি যুগান্তরের করেসপনডেন্ট করে দেন।

তরুণবাবু বুঝলেন, আমি বোধ হয় যুগান্তরে চাকরি চাইছি।

তিনি বললেন ঃ তুই বি.এ. পাশ কর, তোকে যুগান্তরে নিয়ে নেব।

সেই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হয়ে গেলেও বোধ হয় এত খুশি হতাম না। একেই বলে মেঘ না চাইতে জল। কিন্তু আমি বি এ পাশ করতে পারব কী!

বললাম—বি এ পড়াটাই আর্থিক কারণে বড় মুশকিল হয়ে যাচ্ছে তরুণদা।

তরুণবাবু বললেন—যতদিন না তুই বি এ পাশ করছিস ততদিন তোকে পার্সোনাল ফান্ড থেকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করে দেব।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাহলে আমি বি এ ক্লাশে ভর্তি হয়ে যাবো বলছেন.....

তরুণবাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—আরও ২০ লাখ মেট্রিক টন দরকার বুঝলি..... তা না হলে খাদ্য ঘাটতি মেটানো যাবে না। স্টেটকে খাদ্যে সেলফ সাফিসিয়েন্ট না করতে পারলে ডাঃ রায়ের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আমি বললাম—তা তো বটেই...

তরুণবাবু বললেন—ফুড সিনারিওর একটা ভাল অ্যাসপেক্ট এখন কী বলতো....

আমি বলতে পারলাম না।

তরুণবাবু বললেন—গম। পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ শুরু হয়েছে। আরও ফলন বাড়াতে হবে। চালের দাম যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাকে রোধ করতে গেলে গমের ফলন বাড়াতে হবে।

আমি বললাম—ঠিকই বলেছেন। এখন তো গ্রামের লোকেরাও রুটি ধরেছে.....

তরুণবাবু সে কথার উত্তরা না দিয়ে বলতে লাগলেন—হরি বোল, হরিবোল.... গৌর হরিবোল..... গাড়ি ততক্ষণে এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে নাগেরবাজারে চলে এসেছে।

উপকারি মানুষ আমার কাছে ওষধির মত। একবার ফসল দিয়ে তারা মরে যায়। আমার জীবনে তাই একজন উপকারি মানুষ নেই, যিনি সারাজীবন পিতার মত গভীর

অপত্য স্নেহে আমাকে রক্ষা করেছেন। তার বদলে এসেছেন কিছু কিছু মানুষ। ওই ওষধির মতই উপযুক্ত সময় আমায় একবার সাহায্য করে তাঁরা জনারণ্যে মিশে গেছেন। আবার তাঁদের সঙ্গে অকারণে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি তাঁদের কখনও ভুলিনি। উপকারির ঋণ সারাজীবন স্মরণ করেছি পরম পবিত্রতার সঙ্গে।

ত্রিশ টাকা তখনকার দিনে এখনকার তিনশ টাকা। তাই আমার আপাত সমস্যা মিটে গেল। চাকরি এখন না করলেও চলবে। তদুপরি এক ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে ষাটটাকা বেতনের সেচ দফতরের একটি পার্ট টাইম একটি চাকরি দিলেন। রোজ সকালে গিয়ে যমুনা নদীর খালের মুখে জোয়ারের জল কতখানি ওঠে নামে তার হিসাব নিকাশ করা।

ইচ্ছা ছিল অর্থনীতিতে অনার্স পড়ার। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। কারণ গোবরডাঙ্গা কলেজে সে বছর শুধু একটি বিষয়ে অনার্স খোলা হয়েছে সেটি বাংলায় অনার্স। তদুপরি শুনলাম, অনার্স পড়বার জন্য একবছর ড্রপ করে ঊষাপ্রসন্ন আমাদেরই ইয়াবে ভর্তি হচ্ছে। নতুন একটি ছেলেও ভর্তি হয়েছে। মেদিনীপুরের তমলুকের ভৌমিক পরিবারের ভাই-বোনেরা সবাই শিক্ষক। এদের ছোটছেলে সুহৃদ ভৌমিক। সুহৃদ পরবর্তীকালে যাদবপুরে কমপ্যারেটিভ লিটারেচর নিয়ে এম এ করে সাঁওতাল ভাষার অথরিটি হয়ে ওঠে।

শুরু হল বাংলায় অনার্সের নতুন ক্লাশ। বাংলায় অনার্স পড়ার এই সুযোগও পেতাম না যদি ক্লাশ এইটে এক বছর আটকে না থাকতাম। আমার পক্ষে ঊষার মত ড্রপ দেওয়া সম্ভব হত না। আমাকে পাশ কোর্সে বি এ পাশ করতে হত। আর তাহলে আমি কোনদিনই সাংবাদিকতার অধ্যাপনার চাকরি পেতাম না। কারণ এম এ পড়ার সুযোগই পেতাম না। অনেকের জীবন ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। তাদের জীবন পূর্ব নির্ধারিত। প্রতিটি মুহূর্তই তাদের মাপা—ভি আই পির ট্যুর প্রোগ্রামের মত।

কিন্তু আমার জীবন স্রোতের ফুলের মত। ভাসতে ভাসতে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে গিয়েছি। ভেসেছি শুধু জীবনের খরস্রোতে। নইলে আমার নিজের কোন হাল ছিল না, দাঁড় ছিল না, যে তার জোরে জীবন সমুদ্রের মধ্যে বিধার কম্পাস দেখে গতিপথ ঠিক করে নেব।

গোবরডাঙ্গা কলেজে বাংলা বিভাগে পড়ার ফলে অনুকূল স্রোতের আর এক ধাক্কায় আমি কলকাতার সাংবাদিক সমাজে গিয়ে পড়েছিলাম।

কী করে সে কথাই বলি—

বাংলা অনার্স খোলার সময় ১৯৫৭ সালে কলকাতা থেকে লেকচারের পদে যোগ দিলেন ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টচার্য। ব্রজেনবাবু দুদিনের মধ্যেই আমাকে আপন করে নিলেন। অধ্যাপনা জীবনের প্রথাসিদ্ধ পটভূমি তাঁর ছিল না। তিনি গরিবের ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিকেশন বিভাগে চাকরি করতেন। সেই সূত্রে এক সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁদের এই আলাপ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। এই সাংবাদিকের নাম অমিতাভ চৌধুরী। যিনি শ্রীনিরপেক্ষ নামে পরিচিত হন ও ম্যাগসেসে

পুরস্কার লাভ করেন। এখন দেশ পত্রিকার সম্পাদক।

অমিতাভ চৌধুরী ছিলেন ইংরাজির ছাত্র। কিন্তু ব্রজেনবাবুর অনুরোধে দুই বন্ধু প্রাইভেটে বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। অমিতাভ তার আগেই যুগান্তরে যোগ দিয়েছিলেন। শিয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকা উদ্বাস্তুদের উপর প্রতিবেদন লিখে তিনি প্রথম সাড়া জাগিয়েছিলেন। অমিতাভ চৌধুরী তখন নিয়মিত যুগান্তরে লিখতেন নেপথ্য দর্শন বাংলা সাংবাদিকতায় সেই প্রথম সুপরিণত তদন্তধর্মী প্রতিবেদন।

ব্রজেনবাবু আমাদের কাছে এসে প্রায়ই গল্প করতেন অমিতাভ চৌধুরী আর গৌরকিশোর ঘোষের কথা।

১৯৫৮ সালে ব্রজেনবাবু কথায় কথায় জানালেন, তাঁর সাংবাদিক বন্ধুরা মিলে অতি শীঘ্রি কলকাতা থেকে দর্পণ বলে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বার করেছেন। তিনি ওই কাগজের সম্পাদক।

ব্রজেনবাবু একদিন গোবরডাঙ্গা কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যুগান্তরের সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীকে নিয়ে এলেন। সেই প্রথম দেখলাম অমিতাভ চৌধুরীকে। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বত্রিশ। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ চেহারা। বুদ্ধিদৃপ্ত মুখ। কথা বলেন চিবিয়ে চিবিয়ে। কিন্তু কথা বলার মধ্যেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। হড়বড় করে কথা বলেন না। যা মনে এল বলে দেন না। মনে হয় প্রতিটি কথা গুছিয়ে বলছেন। বাজে কথা খরচ করার লোক তিনি নন। যা প্রাসঙ্গিক একমাত্র তাতেই তাঁর রুচি।

ওঁর বক্তৃতার প্রতিটি লাইন আমি গোগ্রাসে গিলছিলাম। বলছিলেন — (নেপথ্য দর্শন) তদন্তধর্মী সাংবাদিকতা। এর জন্য যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়। যাদের দুর্নীতির কথা লেখা হয় তারা প্রভাবশালী। অনেক সময় মালিক পক্ষকে প্রভাবিত করে তারা। সেজন্য নেপথ্য দর্শন প্রকাশের দিন তিনি খুব উদ্বেগের মধ্যে থাকেন মালিকের টেলিফোন আসে কিনা। তাই নিয়ে উদ্বেগ। আর যদি টেলিফোন না আসে তাহলে একটা সপ্তাহ ভালয় ভালয় কেটে যায়।

শুনতে শুনতে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছিলাম। জীবনের প্রায়োরিটি ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছি। তরুণবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমাকে যুগান্তরে নিয়ে নেবেন। যদি যুগান্তরে ঢুকতে পারি তাহলে এই কিংবদন্তী নায়কের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবো।

অনুষ্ঠান ভাঙার পর ব্রজেনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন—অমিতাভ, এই হল আমার এক ছাত্র পার্থ। এর সাংবাদিক হবার ইচ্ছা। ভালই লেখে।

টিপিক্যাল মফঃস্বল ছেলেদের মত ঢিপ করে অমিতাভ চৌধুরীকে প্রণাম করলাম।

অমিতাভ চৌধুরীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে মনটা বেশ আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন—শান্তার বিয়ের জন্য হরুবাবু খুব ঘোরাঘুরি করছেন। পাত্র ওঁর শ্যালক। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি। একমাত্র ছেলে.....।

ছেলে কী করে? কী পাশ?

পাশটাশ কিছু না। তবে ফিল্মের ডিস্ট্রিবিউটর কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ না কি বলে তাই। মানে সিনেমা হলে সিনেমা হলে ঘোরে।

আমি বললাম, ওর তো মাত্র ষোল বছর বয়স এখনই বিয়ে দেবে?

মা বললেন, কিন্তু আজ দু'বছর পড়া ছেড়ে বাড়ি বসে আছে। ভাল সম্বন্ধ পেলে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল। আমাদের তো এক পয়সা নেই। ওরা পয়সা কড়ি নেবে না। তাছাড়া ফণী ডাক্তারের আত্মীয়। জানাশোনার মধ্যে। ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাবো?

মনে হল সত্যিই তো দুবছর ধরে বাড়ি বসে আছে বোন। সুন্দরী মেয়েদের পদে পদে বিপদ। যদিও আমার বোন চুপচাপ প্রকৃতির। বাইরে কারও সঙ্গে মেশে না তবু আমাদের পাড়াটা ভাল নয়। এখানে প্রতিটি বাড়িতেই কোন না কোন হিস্ট্রি রয়েছে।

বাবার কী মত?

উনি তো এক পায়ে খাড়া।

তারা মেয়ে দেখবে না?

না, ভগনিপতি দেখেছে তাতেই হবে। ওরা তাড়াতাড়ি কাজ করতে চায়।

আমি বললাম—বাবাকে বলো, কলকাতা গিয়ে ওদের বাড়ি ঘরদোর দেখে আসুক।

বাবা কলকাতা গিয়ে পাত্রপক্ষের বাড়ি দেখে এসে রিপোর্ট দিলেন। ভগবান বোধ হয় মুখ তুলে চাইলেন, বুঝলে। কি বিরাট বাড়ি। (অতিশয়োক্তি) ঘরে সোফা পাতা। সব ঘরে ফ্যান ঘুরছে। কলঘর রয়েছে ওপরে নিচে। ভদ্রলোক বড়বাজারে চিনির দালালি করেন। একমাত্র ছেলে। চমৎকার স্বাস্থ্য।

কত বয়স হবে?

তা একটু বয়স হয়েছে। সাতাশ আটাশ তো হবে।

মেয়ের বয়স তো ষোল ..... একেবারে প্রায় ডবল বয়স।

দ্যাখো, আগেকার দিনে আরও তফাতে বিয়ে হত। আমার সেজদির ন'বছরে গৌরী দান হয়। সরোজ জামাইবাবু তখন পঁচিশ। তোমার সঙ্গেই আমার বয়সের তফাত বারো বছরের।

মা বেশী কথা বড়ালেন না।

বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেল। নিতান্ত নিরাড়ম্বরভাবে বিয়ে হলেও অন্তত দুতিন হাজার টাকা দরকার।

দোকান করার জন্য বাবা যে বাড়ি বন্ধক দিয়েছিলেন সে টাকা শোধ হয়েছিল বিমলদার সাহায্যে। বাবা আবার বাড়ি বাঁধা দিলেন।

পাশের পাড়ার বড় লোক বীরেন কুণ্ডুর পুজোর দালানে মোটামুটি ধূমধাম করেই বিয়ে হয়ে গেল।

বর ও বরযাত্রীরা সাজানো মোটরে চড়ে কলকাতা থেকে বিয়ে করতে এল। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী মিলে শ'খানেক লোকও খেল।

তরুণবাবুর মাসোহারা ত্রিশ টাকা আর জল মাপার বেতন ষাট টাকা পেতে শুরু

করেছি। সেই সময় পোস্ট অফিসে পাশ বই খুললাম। তার আগে আমাদের পরিবারের কারও নামে কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিল না। দু'তিনশ টাকা জমেও গেল। সে টাকা বোনের বিয়েতে লেগে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে বোন পরদিন শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। মায়ের চোখেও জল। তার মধ্যে সান্ত্বনা—একটা মেয়ের খাওয়ার জন্য কাল থেকে তাঁকে আর ভাবতে হবে না।

ব্রজেনবাবুর দর্পণ পত্রিকা বেরিয়ে গেল। ষোল পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড। ঝকঝকে লোইনোতে ছাপা। তখন কম্পিউটর আসেনি। লাইনো বা মনো টাইপে ছাপা হলেই তা আভিজাত্যের পরিচয় বলে গণ্য হত।

দর্পণ বামঘেঁষা কাগজ। প্রতিটি খবরই নেপথ্যের খবর। এছাড়া আছে বিশ্লেষণ। বই এর সমালোচনা। সিনেমা সমালোচনা। এক কথায় দর্পণ গতানুগতিক বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিয়ে এল।

ব্রজেনবাবু আমাকে লিখতে বললেন। আমি তখনও কবিতা লিখি। রম্যরচনা লিখি। গল্প লেখার খুব চেষ্টা করিনি। গল্প লিখতে বসলে বিনোদবাবুর সেই কথাটা কানে বাজত—অভিজ্ঞতা না হলে গল্প লিখতে যেও না।

বিভিন্ন ধরনের টুকরো গদ্য লেখায় হাতেখড়ি হল দর্পণে।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস। বি.এ. পরীক্ষা চলছে। ব্রজেনবাবু ডেকে বললেন ঃ বললেন—কী করবে ঠিক করেছ?

আমি বললাম—অমিতেশবাবু চাইছেন আমি এম এ পাশ করি। তাহলে তিনি আমায় কলেজে লেকচারার করে নিয়ে নেবেন।

ব্রজেনবাবু বললেন—কলেজে পড়ালে আর কত মাইনে পাবে? বড় জোর তিনশ টাকা। ওয়েজ বোর্ড হয়ে গিয়েছে সাংবাদিকদের মাইনে এখন কলেজের অধ্যাপকদের চেয়েও বেশি।

আমি এতদিন মন্ত্রগুপ্তর মত যা চেপে রেখে দিয়েছিলাম অর্থাৎ তরুণবাবুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি তা ব্রজেনবাবুকে খুলে বললাম। বললাম—আমায় তরুণবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম তাঁকে।

ব্রজেনবাবু বললেন—তাহলে তো খুবই ভাল হল। কিন্তু তুমি এম এ পড়া ছেড় না। এম এটা কমপ্লিট করা থাকলে পরে সাংবাদিকতা ভাল না লাগলে কলেজে চলে আসতে পারবে... .

ঃ তরুণবাবুর ইচ্ছা আমি সাংবাদিকতা পড়ি।

ঃ কিচ্ছু লাভ নেই। সাংবাদিকতায় শুধু ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে। ডিগ্রি হলেও না হয় কথা ছিল। তুমি তরুণবাবুকে বলবে সাংবাদিকতাই পড়ছ। বড়লোকের জেদ তো। তুমি না শুনলে রেগে যাবেন। তোমার যা করার তুমি তাই করবে। তাহলে সাংবাদিকতায় যখন যাবেই ঠিক করেছ, তখন পরীক্ষা শেষ হলেই কলকাতায় চলে এসো। দর্পণে

কাজ শেখো ততদিনে; তারপর রেজাল্ট বেরুলে যুগান্তরে চলে যাবে।

আমিও কলকাতায় যাবার জন্য কতদিন থেকে মুখিয়ে আছি। কলকাতা মাত্র দু'ঘণ্টার রাস্তা। কিন্তু এত কাছে থেকেও কলকাতা দূর অস্ত।

বাবাকে বললাম—তুমি একটু চেষ্টা করবে একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু বাবাই বা কোথায় চেষ্টা করবে। নিকট আত্মীয় বলতে বালিগঞ্জে ছোট পিসীমার বাড়ি। কিন্তু সেখানে তাঁরা আমায় রাখবেন না। ছোটবেলার পর আর সেখানে কখনও রাত্রিবাসও করিনি। আমার বোনের শ্বশুরবাড়িতে থাকা যায় না। নতুন কুটম্ব। তাদের সঙ্গে এমন কিছু হৃদ্যতার সম্পর্কও তৈরি হয়নি। তাছাড়া যেমনটি শুনেছিলাম তেমনটি তাঁরা সম্পন্ন বলেও মনে হয়নি। আমার ভগিনিপতি ম্যাট্রিক পাশ করেননি। এমনিতে চটপটে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু দাগা ডিস্ট্রিবিউটার্সের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর মাসিক বেতন খুবই সামান্য। তাঁর বাবাও কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। আমি বোনের শ্বশুর বাড়িতে কদাচিৎ যেতাম।

এমন সময় সমস্ত মুশকিল আসান করলেন আমার বাবার কাজিন দাদা পঙ্কজ জেঠামশাই-এর মেজ জামাই শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানুষের প্রকৃত পরিচয় গরিব আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তারা কেমন ব্যবহার করে তার ওপর। এটাই মনুষ্যত্বের অ্যাসিড টেস্ট।

বাবা গিয়ে বলতে শিবদাস জামাইবাবু এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

বাবা এসে যখন বললেন—শিবদাসকে তোমার কথা বলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। শিবদাসের মনটা তো খুব ভাল। বীণারও তুলনা হয় না। তখন আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থিত জীবন দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বললাম —তুমিই আমাকে হাত ধরে ঠিক পথে নিয়ে চলেছ সখা। আমি বার বার তোমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করেছি। তুমি আমায় ঠিক খুঁজে নিয়ে এসেছ।

১৯৫৯ সালের ২৭ এপ্রিল জীবনের একটি অধ্যায়ের শেষ হল। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় ও আমার জন্য বহু নাটকীয় উপাদান নিয়ে যে তৈরি ছিল, তা তখনও বুঝিনি।

॥ চোদ্দ ॥

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্য ভারে

চিত্তরঞ্জন এভিনিউর চাঙ-ওয়া রেস্টুরেন্টের দক্ষিণে লাহা পেন্ট হাউসের সর্বোচ্চ তলায় দর্পণ পত্রিকার অফিস। এই অফিসটির ঠিক নিচে সাধন দত্তর কুলজিয়ন কর্পোরেশনের অফিস। অমিতাভ চৌধুরী সাধনবাবু ভাগনে। এই দুটো ফ্লোরই কুলজিয়নের ছিল। অমিতাভ বাবুর সৌজন্যে দর্পণের জন্য ওপরের ফ্লোরটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। ওই তলার একটি ঘর সাবলেট করা ছিল এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবের নামে। তিনি মুম্বাই-এর অনেকগুলি টেকনিক্যাল কাগজের বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ও তাঁর মেমসাহেব স্টেনো ওই ঘরে বসতেন।

পাশের ঘরটি ছিল দর্পণের অফিস। এখানে ব্রজেন বাবু কলকাতায় থাকলে বসতেন।

রাতে এখানেই থাকতেন ব্রজেনবাবু। তাঁর এক সহকারী ছিল। মেদিনীপুরের লোক। অফিসের কাজকর্ম থেকে শুরু করে রান্নাবান্না সেই সামাল দিত। আমি তাকে নন্দদা বলতাম।

ব্রজেনবাবু আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেদিন তাঁর অফ।

আমি যেতেই তিনি বললেন—আরে এসো এসো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। সামনের টেবলে রোগা ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক বসেছিলেন।

ব্রজেনবাবু বললেন—আলাপ করিয়ে দেই। ইনি হলেন সুকুমার রায়। আনন্দবাজারের রিপোর্টার। দর্পণের কর্মাধ্যক্ষ। সুকুমারবাবু, এর কথা আপনাকে বলেছিলাম। আমার ছাত্র। এবার বি এ অনার্স দিয়েছে। ভাল বাংলা লেখে।

সুকুমারবাবু বললেন—ওর লেখা তো দর্পণে পড়েছি। ওকে দিয়ে আরও লেখান।

ব্রজেনবাবু বললেন, সেজন্যই তো ওকে নিয়ে এসেছি। ওর ইচ্ছে সাংবাদিক হবে। তা আমি বললাম, সময় নষ্ট করে আর কী হবে। কাজ শিখতে শুরু করো। সুকুমার বাবু একে মাঝে মাঝে অ্যাসাইনমেন্ট-টেন্ট দেবেন।

একটু পরে দর্পণের সহকারী সম্পাদক হীরেন বসু এলেন। ব্রজেন বাবু বললেন, হীরেন এও তোমার মত ছোটগল্প টল্প লেখে। সংস্কৃতির ব্যাপরেও দারুণ উৎসাহ।

বেলা যত বাড়তে লাগল ততই যেন ওই ছোট্ট ঘরে নবরত্ন সভা বসে গেল। ব্রজেনবাবু একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন—

স্টেটসম্যানের রিপোর্টার প্রশান্ত সরকার। ফণীন্দ্র চক্রবর্তী, আনন্দবাজারের গৌরকিশোর ঘোষ—রূপদর্শী।

রিপোর্টারেরা আমার কাছে তখন অন্য গ্রহের মানুষ। কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত প্রশান্ত সরকারকে আমার খুব ভাল লাগত। তখন তিনি সবে কালিম্পং থেকে দলাই লামা কভার করে ফিরেছেন। প্রশান্তবাবু মার্কা মারা কম্যুনিস্ট। শুনেছিলাম একদা হাওড়ার কোন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন। ইউনিয়ন করতে গিয়ে চাকরি খোয়ান। তারপর থেকে সাংবাদিক হয়েছেন। সেদিন বলছিলেন, তিব্বতের সমস্ত ব্যাপারটা আমেরিকার কারসাজি। দলাইলামার সঙ্গে যে সব তিব্বতি এসেছে তারা নাম করা সব গুণ্ডা। প্রচুর ধনরত্ন খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তারা নিয়ে এসেছেন। ভারতের পক্ষে দলাইলামাকে আশ্রয় দেওয়া একদম উচিত হয়নি। এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।

এরপর প্রশান্তবাবু যতদিন বেঁচেছিলেন, আমি তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলাম। একজন দক্ষ রিপোর্টার হবার যা গুণ দরকার—সুস্বাস্থ্য, সৎসাহস, কয়েক পেগ হুইস্কি খেয়ে স্টেডি থাকা, চটপটে ব্যক্তিত্ব, অ্যাগ্রেসিভ অর্থাৎ মারমুখী ভাব, ঝড়ের মত টাইপ করার ক্ষমতা আর লেখাকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত থেকে বিচ্ছিন্ন করা এসব গুণই তাঁর মধ্যে ছিল।

তিনি পরস্পর বিরোধী কাগজের সংবাদদাতার কাজ করেছেন। এক সঙ্গে একই খবরের আলাদা আলাদা ইমট্রো লিখে খবরকে সেই কাগজের পলিসির অনুগামী করে

তুলতে পারতেন।

কিছুটা রূপদর্শী, কিছুটা বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি তখন রম্যরচনা লিখতে শুরু করেছি নানা কাগজে। ব্রজেন বাবু বললেন— তোমার স্যাটায়ারের হাতটা খুব ভাল। তুমি দর্পণে একটা স্যাটায়ার কলম লেখো।

একেই বোধ হয় বলে কপাল। বি এ পরীক্ষা দিয়েছে এমন একজন যুবককে ধারাবহিক লিখতে বলা হচ্ছে বাংলার এক শ্রেষ্ঠ সংবাদ সাপ্তাহিকে যেখানে বাংলা সংবাদপত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা আছেন।

আমি লিখতে শুরু করলাম। ব্রজেনবাবু গৌরকিশোর ঘোষকে বললেন, গৌর, তুমি ওর একটা যুৎসই ছদ্মনাম দাও তো।

গৌরকিশোর নাম দিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত। যেন স্বর্গ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত এসে এ লেখাগুলো লিখছেন।

সেই সব ব্যঙ্গ রচনা যে প্রশংসিত হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। নয়তো পাঁচ ছমাস ধরে এক নাগাড়ে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। গৌরদা একদিন বললেন—দ্যাখো, তোমার মত বয়সে আমিও এত ভাল লিখতে পারতাম না।

ব্রজেনবাবু বললেন, তোমার তো কিছু হাত খরচ দরকার। আমি বি এ অনার্সের জন্য একটি প্রবন্ধ সংগ্রহ তৈরি করছি। নাম দিয়েছি (সাহিত্য ও পাঠক)। তোমাকে টপিক গুলো লিখে দিচ্ছি। রেফারেন্স বইও দিয়ে দিচ্ছি। গোটা ত্রিশেক প্রবন্ধ তৈরি করতে হবে তোমাকে। আমি ফাইন্যাল দেখে দেব। মাসে ত্রিশ টাকা করে পাবে। আপাতত এই বই দিয়েই শুরু। এরপর আমি আরও কাজ নিয়ে আসব।

এতো মেঘ না চাইতে জল। আমি তরুণবাবুর কথার ওপব ভরসা করে কলকাতা এসেছি। কিন্তু আমার পকেটে তখন মাত্র ত্রিশ টাকা।

আমি তখনও মাসের গোড়ায় গিয়ে ভাগীরথীদার কাচ থেকে ত্রিশ টাকা নিয়ে আসতাম। ঠিক করলাম, ব্রজেনবাবু যদি ত্রিশ টাকা দেন, তাহলে তরুণবাবুর দেওয়া মাসোহারার টাকা বাড়িতে বাবার কাছে দিয়ে আসব।

ব্রজেনবাবুর বই লেখার কাজ শুরু করলাম। প্রথম প্রথম ব্রজেনবাবু সম্পাদনা করে দিতেন। দু চার লাইন অতিরিক্ত সংযোজন করে দিতেন। কিন্তু পরে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাছাড়া আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাসও এসে গিয়েছিল। কাজেই আমার ওপরেই লেখার ভার ছেড়ে দিলেন।

সুকুমার বাবু ও হীরেন বসু মাঝে মাঝে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে লাগলেন। তখন ব্রডওয়ে হোটেল ও মেট্রোপোল হোটেলে প্রেস কনফারেন্স হত। আমি মাঝে মাঝে কভার করতে যেতাম। বড় কাগজের সাংবাদিক হংসদের মধ্যে বক হয়ে একাসনে বসতে বেশ গর্ব হত।

একদিন ফিরপো হোটেলে আলি আকবর খানের প্রেস কনফারেন্স কভার করতে

গিয়ে সাহস করে খান সাহেবকে বললাম—আমি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই।

খান সাহেব বললেন—আপনি কোন কাগজ?

দর্পণ।

দপণের তখন যথেষ্ট নাম। কাজেই আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। বললেন—পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ গড়িয়াহাট মার্টে আমার বাসায় চলে আসুন।

সুকুমারদাকে বলতেই তিনি বললেন—আলি আকবর আমেরিকা থেকে সদ্য ফিরেছেন। আপনি তাঁকে পাশ্চাত্তে ভারতীয় বাজনার কদর সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। দেখবেন সাক্ষাৎকারটি যেন সিরিয়াস হয়। আমরা সিনেমা পত্রিকার মত চটুল সাক্ষাৎকার ছাপি না। আপনার তো ট্রাম ভাড়া লাগবে। এই দু টাকা রাখুন। সুকুমারদা দু টাকার একটা নোট বার করে দিলেন।

গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে একটি বাড়ি গড়িয়াহাট মার্ট। দোতলায় উঠতেই তবলচি মহাপ্রভু মিশ্রের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। খান সাহেবের একটা জরুরি প্রোগ্রাম আছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঘরের ভেতরে পাজামা পাঞ্জাবি পরা খান সাহেব বসেছিলেন।

আমাকে বসতে বললেন।

বললেন—বলুন ভাই।

সেই জীবনে প্রথম সাক্ষাৎকার নিলাম। এরপর কত বড় বড় লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি রাধাকৃষ্ণণ, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, জিয়াউল হক, নরসিমা রাও, জৈল সিং, ম্যাকমিলান—কিন্তু সেদিনের প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি ভোলার নয়। সাংবাদিকতায় আমার কোন শিক্ষাই নেই। প্রথাসিদ্ধ সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিও জানি না। যা মনে এসেছে জিজ্ঞাসা করে গিয়েছি। যদিও দু যুগ ধরে ছাত্রছাত্রীদের সাংবাদিকতার প্রকার প্রকরণ পড়িয়ে আসছি, কিন্তু আমার তত্ত্ব হল—সাংবাদিকতা কমন সেন্স প্লাস আনকমন রাইটিং স্কিল ছাড়া আর কিছুই নয়। কবিতা লেখার মত রিপোর্টিং লেখাও শেখানো যায় না। শুধু আইডিয়া দেওয়া যায় মাত্র।

যাওয়া আসায় বারো পয়সা খরচ হল। দুপুরের চাটাও খান সাহেব খাইয়েছেন। বারো পয়সা কেটে রেখে দু টাকার চেঞ্জ ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

সুকুমারদা বললেন—চেঞ্জটা আপনার কাছেই থাক। পরে আপনার কাজে লাগবে।

চোখে জল এসে গেল। প্রায় এক টাকা বারো আনা নগদ প্রাপ্তি ঘটল। এতে আমার দু সপ্তাহ মানিকতলা থেকে যাওয়া-আসা হয়ে যাবে।

দর্পণের সুবাদে কলকাতার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরির সুযোগ ঘটে গেল।

তখন কলকাতায় ভাল নাটক বা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। বহুরূপীর নাটক থেকে উদয়শঙ্করের নাচ, পি সি সরকারের ম্যাজিক, সবই হত নিউ

এম্পায়ারে। রবিবার সকালে হত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবিবার সকালে বাচ্চাদের একটি অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে তরুণবাবুর সঙ্গে দেখা হল। সস্ত্রীক এসেছিলেন। তাঁর পাশে বসা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, অধ্যাপক নির্মল ভট্টচার্য এম এল সি। তাঁর নাম সকলেরই জানা। সুবক্তা হিসাবে তাঁর পরিচয়।

আমি তাঁকে প্রণাম করলাম।

নির্মলবাবু বললেন, তোমার মত ছেলের সাংবাদিকতায় খুব দরকার। কেন বললেন, সেকথা জানি না। হয়তো গুরুজনের প্রতি আমার বিনয়বশত শ্রদ্ধা দেখেই। আসলে তরুণদের মধ্যে সেই আমল থেকেই বিনয় বস্তুটা উঠে যাচ্ছিল। আইন অমান্যের চিতাভস্ম বামপন্থীরা তখন ছড়িয়ে দিয়েছে রাজাময়। কিছু না মানার সংস্কৃতিকেই বিপ্লবের তুল্যমূল্য করা হচ্ছে। চারিদিকে নেতিবাদ। জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও। মানছি না মানব না। যাব না যাচ্ছি না—সর্বত্র শুধু না-না-আর সেই চরম নেতিবাদের মুখে আমি হ্যাঁ বলতে কী করে শিখলাম তা আমিই জানি না। আমার তো কোন গুরু ছিল না। আমার সামনে তো কোন দীপ্যমান আদর্শ পুরুষ ছিলেন না। তবে মনের ভেতর জোর জাগিয়ে দেবার মত মানুষ ছিল। যেমন ব্রজেনবাবু।

মে মাস আসতেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর হিড়িক এসে গেল। তখন মহাজাতি সদন ও বিডন স্কোয়ারের পনের দিন ধরে রবীন্দ্রজয়ন্তী হত। মহাজাতি সদন ও বিডন স্কোয়ারে রবীন্দ্র জয়ন্তী কভার করার ভার আমার ওপর পড়ল। মহাজাতি সদনে শম্ভু মিত্রের চার অধ্যায় দেখলাম সে সময়। ডাউন ট্রেন দেখতে গিয়ে আলাপ হল নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা বরুণ দাশগুপ্তর সঙ্গে। পরবর্তীকালে তিনি আমার স্বর্ণভিলা নাটকটি শতাধিক রজনী মঞ্চস্থ করেছিলেন।

দর্পণ অফিসে ব্রজেনবাবুর কাছে যারা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে দু'জনের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করবো। একজন কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বীরভূমের এই মানুষটিকে একই পোশাকে সারাজীবন দেখে গেলাম। গায়ে হাইকলার পাঞ্জাবি আর ধুতি। চাঁচাছোলা কথা বলতেন। রসিক, আড্ডাবাজ। এক সময় সোস্যালিস্ট পার্টিতে ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের পি-এ ছিলেন কিছু কাল। উঁ স্তরের ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ— 'ঘোড়া করো ভগবান'।

পরবর্তীকালে সোস্যালিস্ট পার্টি ও কবিতা লেখা দুটোই ছেড়ে দিয়ে শুধু সমকালীন সাহিত্যপত্রটি চালাতেন। শেয়ার মার্কেটের টুকটাক দালালিও করতেন। কিন্তু তাঁর মত উদ্বেগহীন রিলাক্সড মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ওঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হত, পৃথিবীতে আর কোন কাজেই তাঁর উৎসাহ নেই এই একমাত্র আড্ডা দেওয়া ছাড়া।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মুহূর্তের মধ্যে আনন্দদা হয়ে গেলেন। বললেন, ২৪ বি, চৌরঙ্গী রোডে সমকালীনের অফিস কাম বাড়ি সন্ধ্যাবেলা করে এসো। রোজ আড্ডা বসে। আমি তারপর থেকে ওই আড্ডায় যেতে শুরু করলাম। আলাপ হল মঞ্জু বউদির সঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যেই আপন করে নিলেন।

আর একজন সুদর্শন তরুণ আসতেন, অনেকটা উত্তমকুমারের মত চেহারা। তবে

গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। এই মানুষটিকে দেখে ভাবিনি একদিন ইনি বাংলা সাংবাদিকতার জগৎ তোলপাড় করে ফেলবেন আর আমার কর্মজীবনের সঙ্গে তিনিও উত্তরকালে জড়িয়ে যাবেন। তাঁর নাম বরুণ সেনগুপ্ত।

কর্মজীবন শুধু নয় আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল এমন আর একজন তরুণ দর্পণ অফিসে আসত। তার নাম সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত। তখন তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে কেরানীর চাকরি করত ডি ভি সিতে। দুর্গাপুরে তখন তার পোস্টিং। সে এসে দশ কপি করে দর্পণ নিয়ে যেত দুর্গাপুরে বিক্রির জন্য।

বরুণ সেনগুপ্তর নাম প্রথম শুনি সাপ্তাহিক বর্তমানের সম্পাদক হিসাবে। সে সময় দেবজ্যোতি বর্মণ সম্পাদিক সাপ্তাহিক পত্রিকাটি খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্তমান পত্রিকা ছিল তারই হুবহু কার্বন কপি। একই ফর্মাট , এমনকী সম্পাদকীয়র স্টাইল, থার্ড কভারে যুগবাণীর স্টাইলে পর্দার অন্তরালের অনুকরণে ব্যঙ্গাত্মক চুটকি সবই যুগবাণীর আদলে। তার ভেতরে থাকত দেবজ্যোতি বর্মণের বিরুদ্ধেই একটি দুটি প্রবন্ধ। এই কাগজটির উদ্দেশ্য ছিল যুগবাণীকে হেয় করা।

কিন্তু কেন?

আমি যা লোক মুখে শুনেছিলাম তা হল এই— দেবজ্যোতি বর্মণ বিড়লা বাড়ির রহস্য লেখায় বিড়লারা খুব চটে যান। এর বদলা নেবার জন্য তাঁরা বিড়লা ব্রাদার্সের পি আর ও সন্তোষ মুখার্জিকে অনুরোধ করেন।

বরুণবাবু আর সন্তোষ মুখার্জি এক সময় ছাত্র ব্লক করতেন। বরুণবাবু ছিলেন সন্তোষবাবুর শিষ্য। সন্তোষবাবু জানতেন, বরুণবাবুর লেখার হাত আছে। কাগজ করার প্রবণতা আছে। তদুপরি তিনি তখন বেকার।

এই সময় বর্তমান প্রকাশিত হয়। এ কাগজটি আদতে কার পরিকল্পনা তা আমার জানা নেই। তবে মালিকানা ও সম্পাদনার দায়িত্বে বরুণবাবুই নিজে। পরবর্তীকালে সন্তোষ মুখার্জির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি আমার একটি সংস্থার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আমাকে বিড়লাদের নানা কথা বলতেন।

১৯৫৬ সালে অশোক সেন ও মোহিত মৈত্রের উপনির্বাচনে লড়াই-এর সময় বর্তমান মোহিত মৈত্রের বিরুদ্ধে কিছু লেখায় মানহানির দায়ে পড়ে। অশোক সেন ওই মামলায় বর্তমানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর থেকে অশোক সেনের সঙ্গে বরুণবাবুর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ওই নির্বাচন হয়েছিল বঙ্গ বিহার সংযুক্তির ইসুতে। অশোক সেন হেরে গেলে ডাঃ রায় বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

১৯৫৯ সালে বর্তমান অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত হত। কিন্তু তার রমরমা ভাবটা ছিল না।

বরুণবাবু আনন্দদার আড্ডায়ও আসতেন। আনন্দবাজারের সরকার পরিবারের সঙ্গে মঞ্জুদির আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু কানাই সরকার মশাই-এর সঙ্গে আনন্দদার বোধহয় ভাল সম্পর্ক ছিল না। কানাইবাবু ছিলেন সরকারদের সম্পর্কে মামা। বর্তমানে চুটকিতে কানাই সরকারকে একবার শকুনি মামা বলে লেখা হয়েছিল। এতে কানাই বাবু বর্তমান

সম্পাদকের উপর চটে ছিলেন।

কানাইবাবু সে সময় আনন্দবাজারে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। আনন্দবাজারে তখন দুটি গোষ্ঠী। একটি বিনোদবিহারী বসুর। আর একটি কানাই সরকারের। ১৯৬০-৬১ সালে আমি বিনোদবাবুরই আধিপত্য দেখেছি।

কানাই সরকার ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কেউই বিরোধ বেশিদিন জিইয়ে রাখতে পারতেন না। তাদের দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হল। কানাইবাবু কথায় কথায় বললেন, তাঁকে শকুনি বলে ব্যঙ্গ করায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। আনন্দদা বললেন, বর্তমানের সম্পাদক বরুণকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। কানাইবাবুর ওপর তার কোন ব্যক্তিগত বীতরাগ নেই। ওটা নেহাৎই মজা করার জন্য লেখা। তবে তিনি চান, দুজনের মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝি না থাকে।

এরপর কানাইবাবু ও বরুণবাবুর মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়। অনুঘটক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তিনি জানতেন বর্তমানের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কাগজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বরুণ যদি কানাই সরকারের সৌজন্যে আনন্দবাজারে ঢুকতে পারে তাহলে তার হিল্লে হয়ে যায়। আফটার অল ছেলেটির মধ্যে পার্টস আছে। সম্পাদকীয় দফতরে তখন সর্বেসর্বা সন্তোষকুমার ঘোষ। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কারও ঢোকা সম্ভব নয়। কানাইবাবু একদিন সন্তোষবাবুর সঙ্গে বরুণের পরিচয় করিয়ে দেন।

সেই শুরু। যথেষ্ট বুদ্ধিমান বরুণবাবুকে এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

দর্পণের বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে ছিলেন নন্দুদা। এই অজাতশত্রু মানুষটি পরে আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন বিভাগে যোগ দেন।

দর্পণ অফিসের ভাড়াটিয়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক মিঃ ব্রাউনের কাছে আমি বেশি ঘেঁষতাম না ইংরাজি বলার ভয়ে। বিলেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার ইংরাজি জ্ঞান খুবই সামান্য ছিল। বাংলায় ভেবে তারপর তার ইংরাজি করে বলতে যথেষ্ট সময় লাগত। অনর্গল বলতে পারতাম না। একে তো বাংলার মাধ্যমে পড়েছি। তদুপরি ক্লাশ নাইন পর্যত স্কুলে যেটুকু ইংরাজি শিখেছিলাম হেড মাস্টার বঙ্কিমবাবুর কৃপায় ক্লাশ টেনে উঠে তাও ভুলে গেলাম। গ্রামার না পারলে তিনি প্রচণ্ড মারতেন। তার হাতের আঙুলগুলো ছিল এক একটা চাঁপা কলার মত। একটা চড় খেইে মাথা ঘুরে পড়তে হত। আমাদের স্কুলে ডাস্টার দিয়ে মারা রেওয়াজ ছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু জানতেন এর ফলে রক্তপাত হতে পারে। তিনি অহিংস ভাবে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে চড় মারতেন। তাঁর ক্লাশে সব ছেলে এমন নার্ভাস হয়ে যেতে যে অজিত রক্ষিতকে আমার একটি কলম আছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে ফেলেছিল—মাই হ্যাজ এ পেন।

বঙ্কিমবাবু তাতে এতটা শকড হয়েছিলেন যে তিনি মারতেও ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, ফাইভ গ্যালো, সিক্স গেলো, নাইন গেলো, ক্লাশ টেইনের ছাইলা বলে মাই হ্যাজ। অজিত একটু স্বাস্থ্যবান ছিল। বঙ্কিমবাবু বললেন—খাইয়া ফেলা, খাইয়া ফেলা তোর মাংস কিছুটা জানোয়ার দিয়া খাইয়া ফেলা।.....

ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃত ইংরাজি শিখতে পেরেছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সব শহরেই সামান্য। এর একটা কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শেখার পদ্ধতিটাই দুর্বল। আর ইংরাজি মাধ্যমে স্কুলে স্পোকেন ইংরাজি ফর ফর করে বলতে শিখলেও নির্ভুল ইংরাজি কী করে লিখতে হয় তার ওপর জোর দেওয়া হয় না। আমি গত ৪০ বছর ধরে বাড়িতে বসে নিজে নিজে ইংরাজি শিখতে গিয়ে দেখছি এ শিক্ষার শেষ নেই। গ্রামার নির্ভুল ইংরাজি খুবই সূক্ষ্ম এবং নিয়মিত অনুশীলন সাপেক্ষ। কিন্তু অনেক ভুল নিত্য ব্যবহারে এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে সংশোধিত রূপটাই লোকে ভুল বলে মনে করবে।

পরবর্তীকালে আমি যখন আনন্দবাজারে চাকরি করতাম তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে সত্যসুন্দর চক্রবর্তী বলে এক মজার মানুষ রিপোর্টারের চাকরি করতেন। তিনি সার্ভেন্ট পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক ও স্বদেশী যুগের কংগ্রেস নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ছেলে। তাঁর আক্ষেপ ছিল তিনি যে সব ইংরাজি লিখতেন তা ডেস্কে কেটে দেওয়া হত। তখন তিনি তাদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য চার্লস ডিকেন্স, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন ব্যানার্জি প্রমুখ বিখ্যাত লোকদের ইংরাজির লাইন চুরি করে জুড়ে দিতেন। তাঁর চিফ রিপোর্টার সে সব শব্দ বদলে অন্য শব্দ বসিয়ে দিতেন।

সত্যদা বললেন—আজ চার্লস ডিকেন্স রেপড হয়ে গেল। কোন দিন বলতেন, আজ সুরেন বাড়ুজ্যে কাটা পড়ল।

আগেই বলেছি আমি ইংরাজি ভাল বলতে পারতাম না বলে পাশের ঘরের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবকে এড়িয়ে চলতাম।

একদিন কয়েকটি আলপিনের দরকার হল। আমি সাহেবের ঘরে ঢুকে ইংরাজিতে বললাম—গিভ মি সাম পিন প্লিজ।

সাহেব আমাকে বললেন—ইয়ং ম্যান, এভাবে ইংরাজি বলতে হয় না। বলতে হয় — মে আই হ্যাভ স'ম পিন প্লিজ?

আমি একটু বিব্রত হ'ম।

সাহেব বললেন— না-না, এতে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। অধিকাংশ বেঙ্গলিই সঠিক ইংরাজিতে কথা বলতে পারে না। যাক, তোমাকে ক'দিন ধরে এখানে দেখছি, তুমি কি করো?

ঃ আমি দর্পণ পত্রিকায় কাজ শিখছি। আমার ইচ্ছা সাংবাদিক হবো।

ঃ তা বেশ। কিন্তু সাংবাদিক হয়ে কী করবে? ওতে পয়সা নেই। তুমি বিজ্ঞাপনের কাজ শিখলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। এই দ্যাখো, আমি শুধু ফ্রিল্যান্স করেই একটা অফিস মেনটেন করছি। এমন সময় কি মনে পড়ে যেতেই ডাকলেন, স্টেলা স্টেলা।

তাঁর স্টেনো মেয়েটি এল। কালো রঙ। লম্বাটা মুখ। ববড চুল। স্টেলা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। নন্দদা বলত মেম সাহেব।

ব্রাউন বললেন, স্টেলা কেমিক্যাল উইকলির চেক এখনও এল না। তুমি একটু

তাগাদা দাও।

স্টেলা চলে যেতেই ব্রাউন ফিস ফিস করে বললেন — বড় ভাল মেয়েটি। আমি কোন সুন্দরী স্টেনো রাখি না। কেন জানো? ইয়ংম্যানরা তাকে স্পয়েল করে দেবে। এতে তারা প্রায়ই কামাই করবে। আগে আগে অফিস থেকে চলে যাবে। তার চেয়ে এই ধরনের মেয়েরা খুব খাটিয়ে হয়।

আমি বললাম—আমি যাই স্যার।

ব্রাউন আবার হেসে বললেন—এটিকেট হল আসার সময় যেমন মে আই কাম ইন বলতে হয়—যাবার সময়ও তেমনি মে আই লিভ নাউ বলতে হয়। তোমার ঢোকারও রাইট নেই। আর একবার ঢুকলে বেরুবারও রাইট নেই।

সাহেব নিজের রসিকতায় হেসে উঠে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

বি এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুল জুলাই মাসের শেষে। আমি অনার্স পেয়েছি। কলেজের মধ্যে আমারই বেশি নম্বর। ব্রজেনবাবু বললেন—এবার এম এতে ভর্তি হয়ে যাও।

আমি বললাম—ভর্তির টাকা হাতে নেই স্যার। বড় মুশকিলে পড়েছি।

ব্রজেন বাবু তখন শ্যামহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে বাসা ভাড়া করেছেন। তিনি আর নন্দদা থাকেন। নন্দদার ইতিমধ্যে গোবরডাঙ্গা কলেজে চাকরি জুটে গেছে। সপ্তাহে তিন চার দিন প্রভু ভৃত্য কলেজে চলে যান। বাকী সময়টা কলকাতায়।

রবিবার করে তাঁর বাড়িতে আড্ডা জমে। সাংবাদিকদের মধ্যে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আর তাপস সাহা, যুগান্তরের রিপোর্টার সুধীন ঘোষ নিয়মিত যেতেন। আর যেতেন কিছু মফঃস্বল কলেজের লেকচারার। আড্ডার মাঝে মাঝেই আসত চা আর জল খাবার।

ব্রজেনবাবু বললেন—নতুন বাড়ি ভাড়ার জন্য অ্যাডভান্স দিতে গিয়ে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে গেল। তবু তোমার ভর্তির টাকা আমি দেব। কত লাগবে আমি বললাম প্রায় ষাট টাকার মত।

আমার কাছ থেকে নিও। ভর্তি হবার পর হাফ ফ্রির জন্য দরখাস্ত কোর। তোমার যুগান্তরে চাকরির কি হল?

আমি বললাম—এবার তরুণবাবুর কাছে যাবো। গিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা বলবো।

তরুণবাবুর জন্য মহাকরণে যাই। নিচের রিসেপশন থেকে জবাব পাই উনি এখনও আসেননি। অথবা উনি মিটিঙে ব্যস্ত আছেন।

আমার মনে হল আমাকে সঠিক খবর দেওয়া হচ্ছে না।

আমি মহাকরণের গেটের সামনে রোজ গিয়ে দাঁড়াতে লাগলাম। তিনচারদিন পর একদিন দেখলাম তরুণবাবুর কালো শেভ্রোলেটা মহাকরণের ভি আই পি গেটে ঢুকছে।

আমি হাত নাড়লাম।

গাড়ি মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে ঢুকে গেল। ভি আই পি লিফট ধরে তরুণবাবু উঠে গেলেন।

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের মধ্যে একটি পুলিশ আমায় ডাকল।

আপনার নাম পার্থ চ্যাটার্জি?

হ্যাঁ।

যান, এগ্রিকালচার মিনিস্টার আপনাকে ডাকছেন।

গেট পাশ করে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তরুণবাবুর চেম্বারে গিয়ে পৌঁছলাম।

তরুণবাবু বললেন—ওখানে সঙের মত দাঁড়িয়েছিলি কেন?

আপনার জন্য।

আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। তুই কখন আসবি সব কাজ ফেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসব। বল কী চাস?

আমি বি এ পাশ করে গেছি। রেজাল্ট বেরিয়েছে।

খুব ভাল। এই বলে তিনি গম্ভীর হয়ে ফাইল দেখতে লাগলেন।

বড়লোকের খেয়ালের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। একটু থেমে বললাম—আপনি বলেছিলেন, আমাকে যুগান্তরে নিয়ে নেবেন।

তরুণবাবু গম্ভীর হয়ে বেল টিপলেন। তুলসী তুলসী।

হলুদ খাদির পাঞ্জাবি পরা তুলসী দে বিশ্বাস এসে দাঁড়ালেন।

এই যে তুলসী। একে চেন তো?

হ্যাঁ, গোবরডাঙ্গায় বাড়ি তো।

হ্যাঁ। দক্ষিণাকে বলে দাও, ওকে অ্যাপ্রেনটিস নিয়ে নিতে।

তুলসীবাবু বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

পিএর ঘরে বসেছিলেন তরুণবাবুর আর এক পিএ, শুভেন্দু বসু। তুলসীবাবু যুগান্তরে ফোন করে দক্ষিণারঞ্জন বসুকে বলে দিলেন।

তারপর আমাকে বললেন—তুমি এখনই যুগান্তরে চলে যাও।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে দক্ষিণারঞ্জন বসুর চেম্বারে ঢুকলাম বেলা তিনটে নাগাদ। উনি তখন বীরভূমের এক কবি বাগবুল ইসলামের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ওঁকে গোবরডাঙ্গা স্কুলের একটি অনুষ্ঠানেও নিয়ে গিয়েছিলাম।

যুগান্তরে আমার কিছু কিছু খবরও প্রকাশিত হত। এক কপি করে যুগান্তরও ফ্রি পাচ্ছিলাম।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর জনসংযোগ ছিল তৃণমূলে। সারা পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল সাংবাদিক, মফঃস্বলের সাহিত্য ও সাংবাদিকতা যশঃপ্রার্থীদের তিনি চিনতেন। আমি পরবর্তীকালে তাঁর ঘরানা অনুসরণ করে সারা রাজ্যের মফঃস্বল সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিলাম।

আমাকে দেখে দক্ষিণাদা বললেন, কী খবর? আমি বললাম, আপনাকে তুলসী

দে বিশ্বাস মশাই কিছু বলেছেন?

ঃ হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন, তুমি কাজ শিখতে চাও।

আমি বললাম, না, আমাকে তো তরুণবাবু চাকরির কথা বলে পাঠিয়েছেন।

ঃ না, সে কথা তো আমায় বললেন না।

আমার সামনে কথা হয়েছে। তবে কী তিনি বুঝতে পারেননি। বাইরে গিয়ে ফোন করলাম তুলসী দে বিশ্বাসকে। তিনি বললেন—আমি বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। তুমি যাও।

এবার যেতেই দক্ষিণাদা বললেন—চল, তুমি কোথায় বসে কাজ করবে দেখিয়ে দেই। ওঁর চেম্বারের লাগোয়া বিশাল হলঘর। একদিকে যুগান্তর আর একদিকে অমৃত বাজারের নিউজ রুম। উনি আমাকে যুগান্তরের দিকে নিয়ে গেলেন। সামনে ডানদিকে টেবলে এক কালো বয়স্ক ব্যক্তি বসে প্রুফ দেখছিলেন। দক্ষিণাদা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।

এই ছেলেটি এখানে কাজ করবে।

সেই বয়স্ক ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে আমার ঈশ্বর বোধ হয় বলালেন—নতুন?

ঃ হ্যাঁ। রন্টুবাবু পাঠিয়েছেন।

ঃ এখানে নতুন কেউ কাজ করতে পারবে না। অন্য জায়গা থেকে শুরু করান।

ওটা আসলে ছিল প্রুফ রিডিং ডিপার্টমেন্ট। ওখানে একবার ঢুকলে সহজে কেউ আর বেরিয়ে আসতে পারে না। খবরের কাগজে আমি অনেক যোগ্য লোককে দেখেছি সারাজীবন প্রুফ রিডারই থেকে যেতে। দক্ষিণাদা আমাকে তার একটু দূরে সাব এডিটরদের টেবিলে নিয়ে গেলেন। একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। সেই টেবলে বসে কয়েকজন বয়স্ক লোক ও দুজন তরুণ কাজ করছিলেন।

দক্ষিণাদা বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন—শিশিরবাবু, এই ছেলেটি আজ থেকে এখানে কাজ করবে। রন্টুবাবুর ক্যান্ডিডেট।

আমাকে বসিয়ে দক্ষিণাদা চলে গেলেন। শিশিরবাবু মোটা সোটা চেহারার মানুষ। মাথায় টাক। গায়ে ফিনফিনে আর্দ্দির পাঞ্জাবি। পরনের ধুতি হাঁটু পর্য'' তোলা। এক পা কোলের ওপর দিয়ে তিনি মৌজ করে বসেছিলেন।

আমায় বললেন— তোমার বাড়ি কোথায়?

গোবরডাঙ্গা।

কী পড়েছ?

এবার বাংলা অনার্স নিয়ে পাশ করেছি।

তোমার সঙ্গে এদের আলাপ করিয়ে দেই— প্রদ্যোৎ মিত্র, আশ্রয় তিলক ঠাকুরতা, দেবকুমার ঘোষ, কৃষ্ণ ধর আর এই দুই ইয়ংম্যান হল দেবব্রত মুখোপাধ্যায় আর বরুণ রায়।

আমি প্রত্যেককে নমস্কার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক তাড়া পি টি আই-এর ক্রিড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে শিশিরবাবু বললেন—নাও এগুলো অনুবাদ করো।

দীনেন্দ্র স্ট্রিটে বীণাদির বাড়িতে মাস তিনেকের বেশি ছিলাম না। আর একটু এগিয়ে ৪/৪ রামমোহন রায় রোড। জেঠামশাইয়ের বাড়ি। বাড়িতে তখন বিধবা জেঠাইমা আছেন। আছেন দুই দাদা দোতলা আর তেতলায়। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা থাকেন। তিনতলায় একটি ঘর খালি। সেটি বড়দাদা শিশির কুমারের ভাগে। তিনি দক্ষিণ পূর্ব রেলের ক্যাশিয়ার। খুর্দা রোডে পোস্টেড। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ চেহারা। মানুষটিও সদালাপী। খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকতেন। যুদ্ধের সময় গোবরডাঙ্গায় গিয়েছিলেন কিছুদিন। আমাকে খুব ভালবাসতেন। বাবা প্রথমে দাদাদের কাছে গিয়েছিলেন আমার থাকার ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু শিশুদার সঙ্গে কথাবার্তা না বলা পর্যন্ত তাঁরা আমার থাকার ব্যাপারে কিছু করতে পারেননি। এত দিন পরে খুর্দা রোড থেকে শিশুদা অনুমতি দিয়েছেন। অথবা বাড়ির ছোট ছেলে আমার ছোটদা সুশীল হয়তো নিজের উদ্যোগেই ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। রামমোহন রায় রোডের বাড়িতে চলে এলাম আগস্টের মাঝামাঝি নাগাদ। তিনতলার এই ঘরটি যথেষ্ট বড়। আলো হাওয়া যেমন খেলে তেমনি ঘরে ডবল বেডের একটি খাট পাতা।

উত্তরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তা দেখা যায়। পরের বাড়িটাই ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণু ঘোষের বাড়ি।

আমার দুবেলা খাওয়ার জায়গা রেস্টুরেন্টটা ছিল মানিকতলা ব্রিজের ঠিক মুখে। সেখানে আট আনা দিলেই একবেলা পেটভরা মিল পাওয়া যেত।

ব্রজেনবাবুর পরামর্শ মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম এ ক্লাশে ভর্তি হয়ে গেলাম। ভর্তির টাকা তিনিই দিলেন।

দুপুর তিনটে পর্যন্ত ক্লাশ করে কফি হাউসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যুগান্তরে ইভনিং শিফট করতে যেতাম।

ফিরতাম রাত দশটা নাগাদ।

বাংলা কাগজে সাব এডিটরের চাকরি মানে মুখ্যত অনুবাদকের চাকরি। আমাদের সময় খবরের কাগজের ভাষা ছিল সাধু ভাষা। বাংলা সাহিত্য থেকে সাধুভাষা চল্লিশ দশকের পর থেকেই বিদায় নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও শেষ জীবনে চলিত ভাষায় লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু খবরের কাগজে সাধুভাষা ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চালু ছিল। এখনও আনন্দবাজার সম্পাদকীয়তে সাধু ভাষা চালু রেখেছে। আমার মতে এটা যথার্থই হয়েছে। কারণ সম্পাদকীয় রচনার তীব্র শ্লেষ, অনুপ্রাস যমক সাধুভাষায় খোলে বেশি। চলিত ভাষায় ব্যঙ্গধর্মী রচনা ফুটিয়ে তোলা যায় না। নব্বই-এর দশকে আমি যখন বঙ্গলোক পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলাম তখন সম্পাদকীয় রচনা সাধু ভাষাতেই রেখেছিলাম।

যুগান্তরে আমাদের অনুবাদ করতে হত পি টি আই-এর কপি। তারপর হেডলাইন দিতে হত। অনুবাদ করা বা বড় লেখাকে সংক্ষিপ্ত করার নিয়মকানুন কেউ আমাকে শেখায়নি যেটি সাংবাদিকতার ক্লাশে এখন আমি ছেলেমেয়েদের হাতে ধরে শেখাই। আনাড়ির হাতে কোন কোন অনুবাদ আক্ষরিক করতে গিয়ে হাস্যকর হত। সে সম্পর্কে

নানা গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন Police was patrolling the area-এর অনুবাদ হয়েছিল পুলিশ ওই এলাকায় পেট্রোল ছড়াইতেছিল। রেল লাইন থেকে স্লিপার অপসারণ-এর অনুবাদ হয়েছিল চটি জুতো অপসারণ। তখনও পর্যন্ত আমার ভাল ইংরাজি জ্ঞান ছিল না। আমি সেজন্য ডিক্সনারি দেখতাম। সেই থেকে আমার ডিক্সনারি পড়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারপর দীর্ঘকাল ধরে নানা ধরনের ডিক্সনারি সংগ্রহ আমার হবিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

আমাদের চিফ সাবদের মধ্যে অনেকেরই স্নেহ পেয়েছিলাম। শিশির বাবু (চক্রবর্তী) নাকি এক সময় চিত্রপরিচালক ছিলেন। তিনি অনেক মজার মজার গল্প বলতেন। একটি ছবি এত খারাপ হয়েছিল যে শুভমুক্তির দিন দর্শকেরা তাঁকে কলাগাছ নিয়ে তাড়া করে। ছবি রিলিজের দিন মঙ্গল ঘট ও কলাগাছ দিয়ে হল সাজানো হয়। সে গল্প করার সময় ডেস্কের সবাই হেসে কুটি কুটি হত।

সাব এডিটরদের কাজে কিছুটা মনোটনি আছে এজন্য সবাই খুব গল্পবাজ হয়। গল্প করতে করতে কাজ হয়। বিশেষ করে ইভনিং শিফটের গোড়ায় কাজের তত চাপ থাকে না। তখন ঘন ঘন চা, মুড়ি খাওয়া আর গল্প হয়। অনেক সময় বাইরের ভিজিটররা এসেও যোগ দেয়।

তিনতলায় ঢুকতেই প্রথমে পড়ত রিপোর্টিং বিভাগ। অনিল ভট্টাচার্য ছিলেন চিফ রিপোর্টার। কাজ কর্মে প্রবল প্রতাপ। রিপোর্টিং বিভাগে সবাই সিনিয়র। তাদের মধ্যে ডাকসাইটে সাংবাদিকও দু-একজন ছিলেন। যেমন মহেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন রিপোর্টারদের মধ্যে জীবন্ত কিংবদন্তী— সেটি তাঁর ব্যাপক পরিচিতির জন্য। অমিতাভ চৌধুরী তখন সহকারী সম্পাদক হয়েছেন। বসেন বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে। আর একজন নামী রিপোর্টার ছিলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত—ব্রজেনবাবুর বন্ধু।

তরুণতম রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম সুধীন দে। ডাক নাম কচি। তাকে দেখে আমার চেয়ে কম বয়সের বলে মনে হত। কিন্তু পরে জেনেছিলাম সে আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। কচি যুগান্তর থেকে স্টেটসম্যান, পরে টাইমস অব ইন্ডিয়ায় যায়। বাংলা কাগজ থেকে ইংরাজি কাগজে যাওয়ার রেওয়াজ সাংবাদিকতায় খুব কম। তবে ইংরাজি কাগজ থেকে অনেকে বাংলায় আসেন।

১৯৫৯ সালে পুজোর আগে পশ্চিমবঙ্গে যে খাদ্য আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান কতখানি হয়েছিল জানি না কিন্তু তাতে আমার বিরাট ব্যক্তিগত লাভ হল। আমি সাব এডিটরের কাজ আরও ভাল করে শিখে গেলাম। এই সময় অনেকের সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয়ও হল।

আন্দোলন না বলে ওটিকে ছোটখাটো বিপ্লব বলাই সঙ্গত। পঞ্চাশের দশকটাকে হিংসাত্মক গণ আন্দোলনের দশক বলা যায়। ওই দশকে শিক্ষক আন্দোলন হয়। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে ট্রাম বাস পোড়ে। (১৯৫৩) গুলি লাঠি চলে। কলকাতা উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের গণ আন্দোলন পর্বের ইতি পড়ে। ১৯৬৯ সালে রাজ্যপাল ধর্মবীর যখন

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন তখনও গুলি লাঠি চলেছিল। কিন্তু ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের মত তা তীব্র ছিল না।

খাদ্য আন্দোলনের ফলে পর পর কয়েকদিন কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ট্রামে বাসে দুধের গুমটিতে আগুন লাগালে হয়। পুলিশ জনতায় খণ্ড সংঘর্ষ হতে থাকে। হরতাল চলে পর পর।

যুগান্তরের অধিকাংশ সাংবাদিক ও কর্মী সে সময় কাজে যোগ দিতে পারেননি। দক্ষিণাদা আমাকে বলেন— তোমার তো কাছেই বাড়ি। তুমি আজ রাতে সাবধানে বাড়ি ফিরে গিয়ে বলে এসো, কাল থেকে তুমি কদিন অফিসে থাকবে।

আমি বাড়ি যেতে গিয়ে আমার জীবন নাট্যের আর এক চাঞ্চল্যকর অঙ্কের সংযোজন করে ফেললাম। ওই যে বলেছিলাম, আমার জীবন এত অনিশ্চয়তা ও নাটকীয়তায় ভরা যে আগে থেকে তার গল্পটা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু সিরিয়ালের মত অপেক্ষা করে থাকতে হয় পরবর্তী এপিসোডের জন্য।

এই ঘটনাটি এত ব্যক্তিগত যে আমি পাত্র-পাত্রীর নামধাম বদলে দিতে বাধ্য হলাম। এখানে পাত্রপাত্রীর পরিচয় গৌণ। ঘটনাই প্রধান।

রাত নটা নাগাদ যুগান্তর থেকে বেরিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। দোকানপাট বন্ধ। ট্রাম বাস গাড়ি চলছে না। মাঝে মাঝে পুলিশ বোঝাই ট্রাক হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ সারাদিন ধরে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় জনতা-পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ চলেছে। ট্রামবাস পুড়েছে। সারা শহর থমথম করছে।

সাহিত্য পরিষদ পর্যন্ত এগিয়ে দেখলাম মানিকতলা মোড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পুলিশের গাড়িতে ছয়লাপ। কাঁদানে গ্যাস ফাটার আওয়াজ শুনলাম। এদিকটায় ফুটপাথে বহু কৌতূহলি লোকের ভিড়।

একজন বলল —ওদিকে যাবেন না। মানিকতলায় গুলি চলছে।

হঠাৎ মনে পড়ল এম এ ক্লাশে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর কথা। সে তার মামার বাড়িতে থেকে পড়ে। বন্ধুর নাম প্রভাত। আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, আমি সাহিত্য পরিদ স্ট্রিটে থাকি। যদি এদিকে এসো তাহলে আমার বাড়ি ঘুরে যেও।

এত রাতে এই বিপদের মধ্যে কি করি। আবার অফিস ফিরে যেতে মন চাইল না। আমি খুঁজে খুঁজে সাহিত্য পরিষদে বন্ধুর ঠিকানা বার করে দোতলা একটি পুরনো বাড়ির দরজায় বেল টিপলাম।

কে?

দোতলার বারান্দা থেকে এক মুহূর্তের জন্য বেণী দোলানো এক কিশোরী মুখ দেখতে পেলাম। মেয়েটির মুখে কী এক বিষণ্ণ মায়া জড়ানো। হয়তো তেমন কিছুই নয়, কিন্তু সেই চমকপ্রদ রাতে কর্পোরেশনের নিষ্প্রভ আলো-আঁধারিতে আমার তাই মনে হয়েছিল।

আমি বললাম—প্রভাত ব্যানার্জি থাকে এ বাড়িতে?

মেয়েটি বলল— কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম—আমার নাম পার্থ। প্রভাতের সঙ্গে পড়ি। ওকে একটু খবর দিতে পারেন?

মেয়েটি কিছু কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রভাত এসে দরজা খুলে দিল।

তুই এত রাতে?

বললাম, বলছি। চল ভেতরে কোথাও বসি। সামনে বসার ঘর। একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবল। কয়েকটি পুরনো চেয়ার পাতা। ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। পুরনো আমলের পাখা। সুইচ টিপতেই পাখাটি প্রতিবাদ জানিয়ে উঠল। তার আপত্তি জানিয়ে তবেই সে ঘুরতে লাগল।

বললাম—অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। দেখি মাণিকতলার মোড়ে গোলমাল হচ্ছে। গুলি চলছে বলে মনে হল।

প্রভাত বলল— রেডিওতে খবর শুনছিলাম গোটা দশেক ট্রাম বাস পুড়েছে। দশ জায়গায় গুলি চলেছে। তোরা তো আরও খবর রাখবি।

আমি বললাম-- এখন দেখছি আজ রাতটা অফিসে থেকে গেলেই হত।

ঃ তুই কোন চিন্তা করিস না। কালুদা এখানে আছে। আমার মামার আত্মীয়। তোকে গলির মধ্যে দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। যাক এই গুলি গোলা চলছিল বলে তোর আমার বাড়িটা দেখা হয়ে গেল। এখন মাঝে মাঝেই চলে আসবি।

ঃ এটা কি তোর মামার বাড়ি?

ঃ নিজের বাড়ি না, ভাড়া বাড়ি। তবে ১৯৫০ সাল থেকেই ওরা এখানে আছে। খুলনা জেলার ফুলতলা স্টেটের নাম শুনেছিস। মামারা ছিলেন সেখানকার জমিদার। এত বড় জমিদার যে লোকে রাজাবাবু বলে ডাকত। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর প্রায় এক বস্ত্রে কলকাতা চলে আসেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে গায়ে ফতুয়া, পরনে ধুতি খুব ফর্সা গোলগাল চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক নেমে এলেন।

ঃ কীরে প্রভাত, কার সঙ্গে কথা বলছিস?

ঃ মামা, এ আমার সঙ্গে পড়ে। আবার রাতে যুগান্তরে চাকরিও করে। বাড়ি ফিরছিল। মানিকতলায় গুলি চলছে দেখে এখানে চলে এসেছে।

প্রভাতের মামা বললেন--কী যে অবস্থা হল দেশের। একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। রেডিওতে শুনলাম বিধানসভায় কারা ডাক্তার রায়ের দিকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। এ কীরকম অসভ্যতা বলতো....

দুচার কথার পর প্রভাতের মাসীমা চা নিয়ে এলেন।

তাঁকে দেখে সত্যি তাকিয়ে থাকার মত। তখন তাঁর বয়স চল্লিশের ওপর। কিন্তু ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী। অনেকটা পাঞ্জাবিদের মত। টকটকে ফর্সা রঙ। ওঁকে দেখে কেন জানি না শ্রীকান্তের অন্নদাদিদির কথা মনে পড়ে।

প্রভাত বলল—আমার মামীমা।

মামীমা বললেন—বাড়িতে মিষ্টি নেই বাবা। এত রাতে দোকান টোকানও খোলা নেই। প্রভাত গিয়ে বলল আমার এক বন্ধু এসেছে। তা এই আসাটা কিন্তু তোমার আসা হল না। আবার আসতে হবে.....

বলেছিলাম, আসব।

রাত দশটা নাগাদ যখন সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাড়ি থেকে কালুদাকে সঙ্গে করে বেরুলাম তখন রাত যেন আরও নিঝুম হয়ে এসেছে। যাবার সময় বারান্দায় তাকিয়ে খুঁজছিলাম সেই বেণী দোলানো চকিত হরিণীর মত চোখে সেই কিশোরীটি দাঁড়িয়ে কিনা।

না, বারান্দায় কেউ নেই।

আমি কালুদাকে অনুসরণ করলাম।

বিশ বাইশের ইতিহাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কিছু ভাল ভাল অধ্যাপক পেলাম। যাঁদের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়ে আজও মনে হয় জীবন ধন্য। কারণ সে সময় বাংলা বিভাগে মহাজ্যোতিষ্ক সম্মেলন ঘটেছিল। শশীভূষণ দাশগুপ্ত আমাদের হেড ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য পড়াতেন। ছোটখাটো মানুষ। পড়াতেনও খুব সুন্দর। প্রমথনাথ বিশী পড়াতেন ছিন্নপত্র। তাঁর আবেগ ছিল না। কিন্তু পড়ানোর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকত। হরপ্রসাদ মিত্র, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টচার্য, মহেশ্বর দাস সকলেই নিজের নিজের জগতে কৃতী।

দুটো সেকসন মিলিয়ে দেড়শ ছাত্র। অত ছাত্রের ভিড়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। হরপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুবাদে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম। খুবই ইচ্ছা ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার। তাঁর টোপ গল্পটি পড়েছি স্কুলে থাকতেই। পড়েছি উপনিবেশ-এর সব কটি পর্ব। তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসামান্য আর তেমনি ঋজু ছিল তার গদ্য। যেমন সুপুরুষ ছিলেন তেমনি ছিল স্মৃতিশক্তি।

তখন তিনি থাকতেন বৈঠকখানা রোডে।

আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলাম আরও অনেক পরে। আনন্দবাজারে কাজ করার সময়।

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। রুদ্রদা ইংরাজি পড়তেন। আমাদের চেয়ে এক ক্লাস সিনিয়র। তখনই তিনি নাটক করে নাম করেছেন। কফি হাউসে তিনি আর কেয়া চক্রবর্তী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

আমাদের ইয়ারের ছাত্রদের মধ্যে হিরো ছিল পবিত্র সরকার। সে আসানসোল কলেজ থেকে সেবার অনার্সে সেকেন্ড ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিল। সে সময় বাংলায় ফার্স্ট ক্লাশ কদাচিৎ কেউ পেত। পবিত্র এ সেকশনে পড়ত। আমি বি সেকশনে। আমাদের

সেকশনে ছাত্রদের মধ্যে প্রেসিডেন্সির একটি গ্রুপ ছিল। এরা প্রেসিডেন্সি কলেজেই ফিজ টিজ জমা দিত। লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারত। এদের মধ্যে ছিল পল্লব সেনগুপ্ত আর শুভঙ্কর চক্রবর্তী। পল্লবের বাবা নন্দগোপাল সেনগুপ্ত শান্তিনিকেতনে পড়াতেন। পরে তিনি যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক হন। সেই দিক থেকে তিনি আমার সহকর্মী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখলাম ছেলেমেয়েদের একাংশ খুব কনজারভেটিভ। আর এক অংশের মধ্যে অবাধ মেলামেশা রয়েছে। বেশ কিছু মেয়ে তো শিক্ষকরা ক্লাশে ঢুকলে তবে ঢুকত। কিছু ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে থেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা। সহপাঠিনীদের সঙ্গে প্রেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সংস্কৃতি ছিল। অনেকে ঠাট্টা করে বলত মাসে বারো টাকায় এত ভাল ক্লাব আর পাবে না।

পবিত্র সরকার, পল্লব সেনগুপ্ত, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সত্য, রণজিৎ এমন বেশ কিছু ছেলে তার সহপাঠিনীদেরই বিয়ে করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রেমের সংক্রমণ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা খুব মুশকিল ছিল। কিন্তু আমি এত লাজুক ছিলাম যে আগ বাড়িয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে পারতাম না। পরে শুনেছিলাম, অনেক মেয়ের আমার প্রতি আগ্রহ ছিল কিন্তু গম্ভীর স্বভাব দেখে আর এগুতে সাহস করেনি।

একটি মেয়েকে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেটি সম্ভবত মেয়েটি খুব সপ্রতিভ ছিল বলেই এবং আমার মত একজন গম্ভীব প্রকৃতির ছেলের সঙ্গেও সপ্রতিভ ভাবে কথাবার্তা বলত বলে। তার আসল নাম বলব না। ধরা যাক তার নাম মোনালিসা।

মোনালিসা কিন্তু সুন্দরী ছিল না। কিন্তু একটা বয়সে স্মার্ট সপ্রতিভ মেয়েদের যৌন আবেদন থাকলেই পুরুষের কাছে তারা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর সে যদি কারও প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ না করে তাহলে তার ভক্তরা সবাই ভাবে সে তাদের প্রতিই অনুরক্তা। এমন ঘটনা বাংলা সিনেমায় প্রায়ই দেখা যায়। শেষে তৃতীয় পুরুষ এসে তাকে বিয়ে করে চলে যায়। মোনালিসাকে কেন্দ্র করে ভক্তদের এটি চক্র গড়ে উঠেছিল। সবাই তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করত। আমিও করতাম। এ কারণে তার একটি অতি সাধারণ কবিতাও আমি একটি কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। তাকে কেন্দ্র করে তার এক প্রেমিকের (বর্তমানে একজন কবি) সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আজও খারাপ হয়ে রয়েছে। মোনালিসার কিন্তু একজন বাইরের প্রেমিক ছিল। সেটি আমি জানলেও সেটা সে আর কাউকে জানতে দেয়নি। পরে সেই প্রেমিককেই সে বিয়ে করে ঘরকন্না করছে।

গোবরডাঙ্গা কলেজ থেকে আমরা তিনজন—আমি, ঊষাপ্রসন্ন ও সন্তোষ ভৌমিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই। আমি ছাড়া বাকী দুজনই পাশ করে কলেজে শিক্ষকতা করছে।

একদিন শুভঙ্কর ক্লাশের মধ্যে এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসে বলল, ইনি খুব ভাল হাত দেখতে পারেন। চল তোমার হাতটা দেখাই। ভদ্রলোকের বেশবাস দীন। পোড় খাওয়া তুবড়ানো চেহারা।

জ্যোতিষের উপর আমার আগ্রহ ছোটবেলা থেকে। যদিও তাদের প্রতি আমার

অন্ধ নির্ভরতা নেই। তবু আমার বেশ মজা লাগে যখন কোন জ্যোতিষী হাত দেখে বা কোষ্ঠী বিচার করে বেশিরভাগ সময়ই ভুলভাল বলতে থাকে। অনেক ভুলের মধ্যে দু-একটা কথা কিন্তু আশ্চর্যভাবে ঠিক ঠাক বলে। আমার কোষ্ঠী দেখে প্রায় সব জ্যোতিষীই আমার সংগ্রামী জীবনের কথা, অসংখ্য গুপ্ত শত্রুতার কথা ও আমার চরিত্র সম্পর্কে সঠিক কথাই বলেছেন। আবার তাঁদের অধিকাংশ ভবিষদ্বাণীই আমার ক্ষেত্রে খাটেনি। আমি কখনও জ্যোতিষীর উপর নির্ভর করে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপদ্ধতি ঠিক করিনি। বিবেকের নির্দেশেই সারা জীবন চলে এসেছি। বিবেক যা যুক্তিসঙ্গত ও নীতিসঙ্গত বলে মনে করেছে তাই করেছি। কখনও লোকলজ্জা বা শাস্তির ভয়ে কোন কাজ থেকে বিরত থাকিনি।

বহু সময় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ বুঝতে পারিনি কারণ অনেক সময় মানুষ নিজেব ভাল বুঝতে পারে না। কারণ নিজের সম্পর্কে সব মানুষেরই একটা অন্ধমোহ তাকে। সে ভাবে একমাত্র সেই ঠিক করছে। এজন্য সদগুরুর দরকার হয়।

ব্রজেনবাবুই ছিলেন আমার সে সময়কার গুরু। গুরুর ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমি তাই করেছিলাম। ব্রজেনবাবুর পর আর কাউকে সেভাবে গুরু হিসাবে পাইনি। তখন নিজের বিবেককেই জীবনের ধ্রুবতারা করেছি। রবীন্দ্রনাথের মত বলেছি— ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।

শুভঙ্কর ওই জ্যোতিষীকে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে গেল। আমরা গোলদিঘিব দিকে মুখ করে ঘাসের ওপর বসলাম। প্রথমে শুভঙ্করের হাত দেখে তিনি বললেন. তুমি শিক্ষাজগতের টপে উঠবে। শুভঙ্কর অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল— এবার পার্থর হাতটা একবার দেখুন।

আমার কব কোষ্ঠীর দিকে এক পলক চেয়ে তিনি বললেন—তুমি তো শিগ্রি বিলেত যাচ্ছ।

আমি হো হো করে-হেসে উঠলাম।

যুগান্তরে আজ তিনমাস চাকরি করছি, এখনও একটা পয়সাও হাতে ঠেকায়নি কেউ। ব্রজেনবাবুর ত্রিশ টাকাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার সম্বল তখনও তরুণবাবুর ত্রিশ টাকা। কলকাতা থেকে প্রতিমাসে বারাসতে গিয়ে হাত পেতে নিয়ে আসি। আমার এক জোড়ার বেশি জামা কাপড় নেই। একটি শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া চটিজুতো সম্বল। পড়াশোনা কতদিন চালাতে পারব জানি না। গৌরদা আমাকে পাকাপাকি চাকরির জন্য কয়েক জায়গায় পাঠিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে শ ওয়ালেশের পি আর ও একজন। তাঁরা নাকি চাষীদের জন্য একটি বাংলা হাউস জার্নাল বার করতে চান। আর একটি কোচিং ক্লাশে পাঠিয়েছিলেন, বাংলা অনার্সের নোট লিখে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোন জায়গাতেই নগদ প্রাপ্তির আশ্বাস পাইনি।

সেই আমি, যে চাকরিটা পাকা হয়ে গেলেই খুশি সে যাবে বিলেত! তাও আর কিছুদিনের মধ্যে!

জ্যোতিষ ভদ্রলোক কিন্তু নিশ্চিত। তিনি বললেম, তোমার কাছে একটা অনুরোধ।

বিলেতে যখন যাবে আমাকেও নিয়ে যাবে।

এতক্ষণের সন্দেহটা এবার পাকা হল। ভদ্রলোকের মাথার গোলমাল আছে।

ডিসেম্বর মাসের দিকে ছোটদের পাততাড়ির বার্ষিক উৎসবে সাহিত্যিকদের অভিনয়ের আয়োজন করা হল। একজন উঠতি লেখক হিসাবে তখন আমার আরও উঠতি লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তারাই আমাকে খবর দিয়ে পাততাড়ির অফিসে নিয়ে গেল। ৭২/১ বাগবাজার স্ট্রিটে যুগান্তরের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকেরা বসতেন। সিনেমা বিভাগ ও ছোটদের বিভাগও ওখানে। রবিবারের পাতা দেখতেন পরিমল গোস্বামী। তাঁর সহকারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পঞ্চতপা ও চলাচল লিখে তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছেন। তার ওপর ওই দুটি উপন্যাসের সার্থক চলচ্চিত্ররায়ণ হয়েছে। আশুতোষবাবুর সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে তাঁর মেয়ে সর্বাণী জার্নালিজম ক্লাশে আমার ছাত্রী ছিল। পাততাড়ির সম্পাদক ছিলেন অখিল নিয়োগী। তাঁর লেখার আমি ভক্ত ছিলাম। তিনি ছিলেন জাত শিশু সাহিত্যিক। আমাদের ছোটবেলায় যে সব শিশু সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে ভাল লাগত তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনির্মল বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অখিল নিয়োগী, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। স্কুলে পড়ার সময়ই সাউথ সিঁথি রোডে গিয়ে নীহাররঞ্জন গুপ্তর সঙ্গে আলাপ করি। ঢাকুরিয়ায় একবার সুনির্মল বসুর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। যুগান্তরে চাকরি করা সত্ত্বেও অখিল নিয়োগীর সঙ্গে আলাপ হয়নি। পাততাড়ি উৎসবে নাটকের মহলার সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি মদন মিত্র লেনে সি আই টি বিল্ডিং-এ থাকতেন। আমার সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। আমার বিবাহে তিনি এসেছিলেন।

অখিল নিয়োগীর সহকারী ছিলেন হরেন ঘটক। খুব ভাল ছড়া লিখতেন। মানুষটিও হাসিখুশি ছিলেন। পাততাড়িতে আর এক তরুণ শিশুসাহিত্যিক কাজ করত। তার নাম হিমালয় নির্ঝর সিংহ। ওই আকর্ষণীয় নামের কল্যাণে তার নাম সবার মনে গেঁথে গিয়েছিল। আমাকে এক সহকর্মী বলতেন, ওই নামটা আমি ভাড়া নিতে রাজি আছি। হিমালয়ের সঙ্গে আমার সে সময়ই আলাপ। পরবর্তীকালে তার বহু ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। ঘটনাক্রমে জানা যায় হিমালয় যে মেয়েটিকে বিবাহ করে সে আমার স্ত্রীর স্কুলের সহপাঠিনী। যৌবনে হিমালয়ের চেহারা খুব সুশ্রী ছিল। তার একমাত্র উচ্চাশা চিল সে খবরের কাগজে অন্তত প্রুফ রিডারের একটি চাকরি করবে। কিন্তু সে চাকরিও সে পায়নি। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার সমাদর হয়নি। আমার কাছে সে বছরের পর বছর একটি ব্রেক পাবার জন্য ঘুরেছে। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েকে যা সহজে করে দিতে পেরেছি, হিমালয়ের বেলা তা পারিনি। সে জীবিকার জন্য শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিশ ধরে। জ্যোতিষ চর্চায় তার আগ্রহ ছিল। একটি ছাপাখানা বসিয়ে সে ছোটদের জন্য একটি কাগজও বার করত

এবং ওই কাগজ নিয়ে সে গর্বিতও ছিল। কিন্তু পারিবারিক জীবনে সে নানা ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত ছিল। অল্প বয়সেই সে মারা যায়।

সাহিত্যিকদের অভিনয়ের জন্য যে নাটকটি মনোনীত হয় তা হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাড়াটে চাই। তখনও নাটকটি অপ্রকাশিত। নারায়ণবাবু নাটকটি লিখে গ্যালি প্রুফ করিয়ে নিয়েছিলেন। ওই নাটকের রিহার্স্যাল দেবার জন্য নারায়ণবাবু যেমন আসতেন, তেমনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও আসতেন। শৈলজাবাবু পাইকপাড়ায় টালাপার্কে থাকতেন। একটা সময় চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার সুযোগে নাটক ও নাট্যাভিনয় তাঁর সহজাত ছিল।

নারায়ণবাবুকে বললাম, স্যার, আমি আপনার ছাত্র। যুগান্তরে চাকরি করি। নারায়ণবাবু বললেন, তোমায় ক্লাশে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে। তুমি কী পবিত্রদের সেকসনে পড়?

না স্যর, আমি বি-সেকশনে।

নারায়ণবাবু রসিকতা করে বললেন-—বাংলা ডিপার্টমেন্ট তো পটলবাবুর বাজার। এত ছাত্র যে থই রাখা মুশকিল। আমি ঠাট্টা করে বলি গ্রাম থেকে দুজন বেড়াতে এসেছে কলকাতায়। কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ হাইকোর্ট দেখার পর পটলডাঙ্গা দিয়ে যেতে যেতে একজন আর একজনকে বলল—নিচে দোকান, ওপরে অতগুলো ঘর। ওপরেও কি দোকান আছে? আর একজন বলল—না-না। ওপরে দোকান নেই। ওপরটায় বিশ্ববিদ্যালয়। ওখানে ক্লাশ হয়।

কী পড়ানো হয় ওখানে?

সে অনেক বিষয়।

বাংলাও কী পড়ানো হয়?

হ্যাঁ, বাংলাও পড়ানো হয়।

তাহলে তুমি স্যুটকেশটা রাখো। আমি ভর্তি হয়ে আসি।

এই বলে সঙ্গীর হাতে স্যুটকেশ দিয়ে লোকটি বাংলা এম এ-তে ভর্তি হয়ে এল।

নারায়ণবাবু এত মজা করে বলতেন যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত।

এক এক সময় মনে হত, বাংলা পড়ে কী হবে। এই যে এত ছেলেমেয়ে বাংলায় এম এ করছে তারা পাশ করে কী করবে! কোথায় বাংলা ভাষার মর্যাদা। সরকারি কাজেও বাংলা ভাষা চালু হল না। ছেলেমেয়েরাও বাংলা সাহিত্য আর আগের মত ভালবাসে না। অথচ অনেক ভাল ভাল ছেলে বাংলা পড়ছে। তারা যে কোন বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কথা বলতে পারে। আমাদের অধ্যাপকেরা সবাই পণ্ডিত, বহু শাস্ত্র বিশারদ। কিন্তু তাঁরা শুধু বেকার সৃষ্টি করে চলেছেন যেন।

নারায়ণবাবু আমাকে বললেন ভাড়াটে চাই কমিক নাটক। কমিক চরিত্র ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন। দেখবে যেন ভাড়ামো না হয়ে যায়। তোমার কি নাটক করা অভ্যাস টভ্যাস আছে?

আমি বললাম হ্যাঁ স্যর। ইস্কুলে নাটক করেছি—সিরাজের স্বপ্নে সিরাজ। কলেজে

দুই পুরুষে সুশোভন। আমাদের ক্লাশে সুনীত মুখার্জি ভাল নাটক লেখে। তার নাটক হল কালীঘাটে। আমি শিবনাথ বলে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছি।

ব্যস, তাহলে তো কথাই নেই। অখিলবাবু একে তাহলে নিয়ে নিন। নারায়ণবাবু আমাকে সিলেক্ট করলেন। ভাড়াটে চাই এর অভিনয় মহাজাতি সদনে বড়দিনের ছুটিতে হবে। আমি তখন রীতিমত গর্বিত। নামী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার নামও ছাপা হচ্ছে। অভিনয়ের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকী। হঠাৎ বাসায় ফিরে জ্বরে পড়লাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি গায়ে হাত পায়ে ব্যথা। বেশ জ্বর। ছোট বৌদি ডাকতে এলেন—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমচ্ছো। আজ কখন ডিউটি? আমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁকে বললাম—কাল রাতে জ্বর এসেছে। এখানে ডাক্তার কে আছে বলতে পারেন? আর সাতদিন পরে আমার অভিনয়। আমাকে ভাল হয়ে উঠতেই হবে।

ছোট বৌদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন— এ যে দেখছি তোমার মুখে কী সব বেরিয়েছে। দেখি দেখি তোমার হাত দেখি। হাত দুটো বাড়াও।

দুহাত প্রসারিত করলাম।

ছোট বৌদি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন— তোমার চিকেন পক্স হয়েছে। সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছে। তুমি আজই বাড়ি চলে যাও কালী। ঠাকুর (ওই বাড়ির ঠাকুর। যে জেঠাইমার রান্না করে দেয় ও কর্পোরেশনে চাকরি করে) তোমাকে শিয়ালদা স্টেশনে দিয়ে আসবে।

॥ ষোল ॥

বসন্তের দিন

সেই প্রথম যৌবন থেকে আমি শিখেছি, মানুষ ভাবে এক হয় এক। তার বহু ইচ্ছা ফলবতী হতে পারে না দৈব দুর্ঘটনায়। কোন প্রচেষ্টা যে সফল হবে, কোনটা হবে না বলা যায় না। পরিণতির কথা ভেবে আশঙ্কিত হতে নেই। কিন্তু এমন সংশয় রেখে সব কাজ করতে হয় যে হলে ভাল, না হলে আর কি করা যাবে।

কিন্তু মন তো মানে না। মন সব সময় আশার ছলনে ভুলে যায় সব কিছু। আশাপূরণ না হলেই তাই সে ভেঙে পড়ে।

বনগাঁ লোকালের একটি কম্পার্টমেন্টের এক কোণে বসে আমি এসব কথা ভাবছিলাম। চিকেন পক্স মানে কুড়ি বাইশ দিনের ধাক্কা। তার মানে আমার সাহিত্যিকদের সঙ্গে অভিনয় করা আর হল না। নতুন চাকরি যা এখনও পাকা হয়নি, সেখানেও একটা ছেদ পড়ে গেল। তাছাড়া ক্লাশ কামাই হল কতদিন।

এক একটা করে টেলিগ্রাফের লাইন দূরে সরে যাচ্ছে আর আমার জন্মভূমির সঙ্গে দূরত্ব কমে আসছে। সেই যে এপ্রিল মাসে গ্রাম ছেড়েছিলাম। তারপর এই ডিসেম্বরে যাচ্ছি।

একটি ছোট ছেলে পিঠে একটা ভারি ক্যানেস্তারা বেঁধে সোডা লেমনেড বিক্রি করছিল। এক হাতে ধরা একটি বোতল কর্ক দিয়ে বাজাতে বাজাতে

বলছিল ঃ সোডা লেমনেড। সোডা লেমনেড..... তেরো চোদ্দ বছরের এই ছেলেটিকে দেখে মায়া হয়। তারতো এই সময় ইস্কুলে পড়ার কথা। কৈশোর-স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার কথা। ওকে দেখে মনে পড়ে গেল আমাদের সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত শিবু বলে একটি ছেলে। সেই ছোটবেলাতেই শিবুর বাবা মরে গেল। শিবু পড়া ছেড়ে দিল। তার কয়েক বছর পরে একদিন ট্রেনে উঠে দেখে শিবু চলন্ত ট্রেনে বাদাম বিক্রি করছে। আমাকে দেখে সেই চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই দরজা খুলে বিপজ্জনক ভাবে পাদানি বেয়ে পাশের কামরায় চলে গেল।

খুব তেষ্টা পেয়েছিল। তার কাছ থেকে এক বোতল জল কিনলাম। মনে মনে ভাবলাম। আমি তো বিএ পাশ করেছি। এম এ পড়ছি। কলকাতার কাগজে লেখালেখি করছি। চাকরিটাও হয়তো পাকা হবে। কিন্তু আমারও এই ছেলেটার মত অবস্থা হতে পারত। আমিও তো কাঁধে কেনেস্তারা ঝুলিয়ে ট্রেনে ট্রেনে জল বিক্রি করতে পারতাম।

মনে মনে সে কথা ভেবে শিউরে উঠলাম।

বাড়িতে যেতেই মা আমাকে দেখে চমকে গেলেন।

তুই হঠাৎ?

চিকেন পক্স হয়েছে মা। বউদি বাড়ি পাঠিয়ে দিল। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার বিছানা করে দাও।

মা বললেন ঃ একী কাণ্ড হল, এই সময় মায়ের দয়া বাঁধিয়ে বাড়ি চলে এলি? শান্তাকে দশমাস অবস্থায় তার শ্বশুর এখানে তুলে দিয়ে গেছে। আজ পনের দিন হল হাসপাতালে তার ছেলে হয়েছে। এখনও ষষ্ঠীপুজো হয়নি। ওই কচি ছেলে বাড়িতে, এখন মায়ের দয়ার রোগী তোকে কথায় রাখি।

দুখানামাত্র ঘর। একটি ঘরে খাট পাতা। খাটের এক পাশে ঠাকুরদের আসন। পাশে এক চিলতে জায়গা। সেখানে বিছানা করলে দুজনের বেশি ধরে না। আর একটা ঘর টুকটাক জিনিসে বোঝাই। সেটা সরিয়ে একপাশে বোন আর সদ্যোজাত শিশুর জায়গা হয়েছে। ঠিক ওই এক চিলতে জায়গাতেই আমার বোনের জন্ম হয়েছিল। সেখানেই তার প্রথম সন্তানের আঁতুড়ঘর।

শ্বশুর মশাই দশমাসের গর্ভবতী পুত্রবধূ অর্থাৎ আমার বোনকে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলেছেন, আমাদের পরিবারের নিয়ম হল প্রথম বাচ্চা বৌমার বাপের বাড়ি হবে। তাই বউমাকে দিয়ে গেলাম। মুখে ভাতের আগে নিয়ে যাবো। তাছাড়া এ সময়টা নিজের মা-বাপের কাছে থাকলে যে যত্ন আত্তি হবে তাকি আমরা করতে পারব বেয়াই। একেতো রুগ্‌ন আপনার মেয়ে। কোথা থেকে কী হয়ে যাবে। আমরা দায়ী থেকে যাবো সারা জীবন।

বাবা আবার অকূল পাথারে। বাড়ি বন্ধকের ধার শোধ হয়নি। আসলের চেয়ে সুদের জন্য ঘনঘন তাগাদা দিচ্ছে হায়দারপুরের পালমশাই। অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সদ্যপ্রসূতি মেয়ে। ফ্রি বেডে ডেলিভারি হলেও ওষুধ পথ্য কিনতে হয়েছে।

আমার ভীষণ অপরাধী মনে হল নিজেকে। কিন্তু আমি কোথায় যাবো? চিকেন পক্সের রোগীকে হাসপাতালও ভর্তি করবে না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবছি আর ভাবছি। সেই বিষণ্ণ মুহূর্তে মনে পড়ল মোনালিসাকে। হাসিখুশী সপ্রতিভ এই মেয়েটি প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে ফলবান বৃক্ষশাখার মতই নিজেকে অবনত করেছে তার বন্ধুদের কাছে। আমি চিঠি লিখতে বসলাম। সুচরিতাসু, মোনালিসা। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। যদিও এখনও শীতের পরমায়ু অক্ষয়। আমরা জানালা দিয়ে উত্তরের বাতাস এসে ঘন ঘন কাঁপন লাগাচ্ছে। বসন্ত প্রকৃতিতে আসেনি। এসেছে আমার সারা দেহে। এক এক সময় তার আগমন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি।

আমি এখন কলকাতা থেকে দূরে আমার স্বগ্রামে আমার বাড়ির ঘরে শুয়ে আছি। কত ছবি মনের পর্দায় এসে ছায়া ছবির মত দ্রুত সরে যাচ্ছে। অনেক পরিচিত অপরিচিত মুখের মিছিলে তোমরা মুখটাই কেন বার মরে পড়ছে মোনালিসা। সেকি তোমার মোনালিসা হাসির জন্য। কী মোহিনী যাদু জানো তুমি, যে যাদু আয়নায় তোমারই মুখ। কী করছ তুমি এই মুহূর্তে—

ভাইকে দিয়ে চিঠিটি পরদিন ডাকে দিলাম।

মায়ের সেবা যত্নে উঠলাম পনের দিনের মধ্যেই। মনে পড়ল ছোটবেলায় কতবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরোছি। কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় আচ্ছন্নের মত শুয়ে শুয়ে আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখেছি। একবার নিমপাতা পাড়তে গিয়ে নিমগাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম মাটিতে। ঢপ করে একটা আওয়াজ। নিজের পতনের শব্দ নিজেই শুনতে পেয়েছিলাম, তারপর এক অস্ফুট কোলাহলের মধ্যে চৈতন্য লোকের সীমানা পেরিয়ে কোন অন্ধকারের দেশে গিয়ে পৌঁছেছি। আলো যখন জ্বলেছে তখন মায়ের কোলে মাথা রেখে এই খাটেই শুয়ে আছি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনতাম। ওই কান্নার মধ্যে আছে জীবনের স্পন্দন। প্রতিমুহূর্তে সে তার গৌরবদীপ্ত অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। তার দাবিও। তার ক্ষুধার দাবি।

বিদায় নেবার সময় মা বললেন : এবার গিয়ে দেখো, যদি কিছু পাঠাতে পারো। তোমায় একটা কথা বলি, সর্বনাশ হয়েছে। শান্তা আসার সময় দু গাছা সোনার চুড়ি এনেছিল। হাসপাতালে যাবার সময় আমি খুলে বাক্সের মধ্যে রেখেছিলাম। এখন দেখি সে চুড়ি জোড়া নেই।

॥ সতের ॥

যে মর্ত্যে সকলে বাঁচি

কলকাতায় ফিরে ঠিক করলাম দক্ষিণাদাকে বলতে হবে কিছু বেতন যদি দেন। চারামাস কাজ করছি, একটা পয়সাও পাইনি। ট্রেনিদের নাকি টাকা দেওয়ার নিয়ম

নেই। দক্ষিণাদাকে বলতে পারলাম না। শুধু একটা চিঠি লিখে চিঠিটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

তাতেই কাজ হল। ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। দক্ষিণাদা বললেন, তোমার চিঠি পেলাম। পড়ে কষ্ট পেলাম।

আমি চুপ করে রইলাম। কী নরম মন মানুষটার। দক্ষিণাদা বললেন, তোমাকে একশা টাকা করে ফিক্সড অ্যালাউন্স করে দিয়েছি। জানুয়ারি থেকে প্রতিমাসে পাবে। ছ'মাস প্রবেশনে থাকার পর গ্রেড পাবে।

খুব খুশি হয়ে উঠল মন। একশ টাকা—সে তো অনেক টাকা। এতখানি বয়স পর্যন্ত একশ টাকা এক সঙ্গে কখনও হাতে পাইনি। ঠিক করলাম সামনের মাস থেকে তরুণ বাবুর টাকা আর নেবো না। তাছাড়া উনি আমার ছাত্রবৃত্তি হিসাবে টাকাটা দিয়েছিলেন। ও টাকা নেওয়ার এখন আর আমার কোন অধিকার নেই।

দুটো প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে। এখন আমি প্রফেশনাল সাংবাদিক হতে যাচ্ছি। দুনৌকোয় পা দেব না। সন্ন্যাসীকে সবার আগে নিজের পৈতে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। তার কোন জাত নেই। পূর্ব পরিচয় নেই।

আমি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না ঠিক করলাম। আরও একটা কারণে কংগ্রেস রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। সেটি অতুল্যবাবুর জমিদারি কায়দায় নেতৃত্ব দেবার জন্য।

ব্যক্তিগতভাবে আমি অতুল্য ঘোষের গুণমুগ্ধ ছিলাম। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি তৃণমূলস্তর পর্যন্ত রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ।

সমকালীন রাজনীতি ও বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল। তাঁর বক্তৃতায় এই শিক্ষার ছাপ পাওয়া যেত। ঝকঝকে বাংলা লিখতেন। পত্রাবলী বলে তাঁর চিঠিপত্রের সংগ্রহ বেরিয়েছিল পরবর্তীকালে। তখন কংগ্রেসের মধ্যে বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত ছিলেন ভূমি রাজাস্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁর অকালমৃত্যুর পর অতুল্যবাবু ছাড়া তেমন কেউ বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব কংগ্রেস রাজনীতির প্রথম সারিতে আসতে পারেননি।

কিন্তু অতুল্যবাবু ছিলেন ডিক্টেটর। কম্যুনিস্টদের কায়দাতেই তিনি কংগ্রেস চালাতেন। তিনি যা বলছেন তাই হচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে অজয় মুখার্জিকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

ছাত্রপরিষদকে অতুল্যবাবু তাঁরই একটি পকেট সংগঠন করে রাখার চেষ্টা করেন। রমেন ঘোষ, শ্যামল ভট্টাচার্যরা চাইতেন ছাত্রপরিষদেব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। তাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য পার্টির মদত থাকবে ষোল আনা কিন্তু তা পরোক্ষভাবে।

আমি এঁদের সমর্থন করতাম। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন বিচারমন্ত্রী তখন অতুল্যবাবু তাঁকে ছাত্র পরিষদ দেখাশোনার ভার দেন। সিদ্ধার্থবাবু প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ছাত্র পরিষদ নেতাদের সভা ডাকেন। সেখানে অতুল্যবাবুও ছিলেন।

আমি ছাত্র পরিষদের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মনোভাবের সমালোচনা করলে অতুল্য

বাবু আমাকে বলেন ঃ তোমাকে দু মিনিট সময় দিচ্ছি। তোমার কী বক্তব্য বলতো......

আমি একটি ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলি যা অতুল্য বাবুর মনঃপুত হয়নি। তিনি আমাকে চিনতেন না। শুনেছি তিনি পরে নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কে। কোথা থেকে আসছি।

তারপর থেকে প্রদেশ নেতৃত্ব আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। আমিও ছাত্র পরিষদের কাজকর্ম থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকি।

এসব আমার কলেজ জীবনের কথা।

যুগান্তরে চাকরি হবার সময় আমার সঙ্গে দলের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। সাংবাদিক হবার সুবাদে পরবর্তীকালে আমি কংগ্রেস নেতাদের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাঁদের কারও কাছে দলের সম্পর্কের কথা তুলিনি। পরবর্তীকালে আনন্দবাজারে ঢুকে দেখেছিলাম অতুল্যবাবুকে পয়গম্বরের মত দেখা হয়। শুধু বিশ্বস্ত ও 'অসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন' রিপোর্টারদেরই অতুল্য বাবুর খবর কভার করার সুযোগ দেওয়া হত। কর্তৃপক্ষ আমাকে এ দুটোর একটাও মনে করতেন না, তাই আমি অতুল্যবাবুর কাছাকাছি যাবার আর সুযোগ পাইনি। শুনেছি তিনি তাঁর স্নেহভাজন সাংবাদিকদের পুজোর সময় খদ্দরের ধুতি উপহার দিতেন। সেটি পাওয়া অনেকটা রাজ শিরোপা পাওয়া বলে গণ্য হত।

১৯৬৭ সালে কংগ্রেস যখন ক্ষমতাচ্যুত হল, সে সময় এক ডেনিশ টিভি সাংবাদিক দলকে আমি নির্বাচন কভার করতে সাহায্য করি। তখন আমি সাহস করে অতুল্যবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার চাই। তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, ওদের সাহায্য করছ কেন? ওরা তো ব্যবসা করতে এসেছে। তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। নির্বাচন সদ্য শেষ হয়েছে। সেই দিনই ভোটগণনা শুরু হয়েছে। অতুল্যবাবু তাঁদের বলেছিলেন। আমরা এবারও সরকার করবো।

বলা বাহুল্য তার ভবিষদ্বাণী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

এরপর আমি তাঁর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম ১৯৮৩ সালে। তখন আমি পরিবর্তনের সম্পাদক। অতুল্যবাবু রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে বিধান শিশু উদ্যানের মধ্যে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছেন। যিনি ছিলেন এক যুগের ওপর বঙ্গেশ্বর, তার শেষ জীবন কাটছে এক রকম লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাচীর ঘেরা বাগানে শিশুদের মধ্যে।

আমি তাঁর স্মৃতিকথা ছাপছিলাম। আমার একজন রিপোর্টার পাঠিয়েছিলাম তাঁর সাক্ষাৎকার টেপ করার জন্য। তিনি বার বার তাকে বলছিলেন, পার্থকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।

আমি গিয়েছিলাম দু তিন দিন। নির্জন দুপুরে গাছের নিচে বসে বৃদ্ধ আমায় কীভাবে আপ্যায়ন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমার মনে পড়ল তিনি যখন বঙ্গেশ্বর তখন একদিন নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে আমাকে তাঁর কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাড়িতে তাঁর একটা হঠাৎ ডাকা প্রেস কনফারেন্স কভার করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রথম, সেই শেষ তাঁর কভারেজ। তিনি কী বলেছিলেন তা মনে নেই।

শুধু দৃশ্যটি মনে আছে। তিনি একটি পালঙ্কে তাকিয়া মাথায় শুয়ে আছেন। নিচের মেঝের উপর চার পাঁচজন সাংবাদিক বসে নোট নিচ্ছেন। আজ আর পেশাদার সাংবাদিকরা কেউ তাঁর কাছে যায় না। কাজেই জীবনের সায়াহ্নে স্বেচ্ছা নির্বাসিত এই রাজনীতিবিদ আমাকে কাছে পেয়ে তাঁর আবেগ দমন করতে পারেননি।

দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে বেশ হালকা বোধ করেছিলাম। এরপর অতিমাত্রায় আদর্শ নির্ভর হতে গিয়ে কিছুটা বাস্তববুদ্ধিও বিসর্জন দিলাম। ঠিক করলাম, তরুণবাবু আমার মালিক। এখন আর শিশির কুঞ্জে তাঁর কাছে নিয়মিত যাওয়াটা লোকে ভাল চোখে দেখবে না। ভাববে মালিককে খোশামোদ করাই বুঝি আমার স্বভাব।

তরুণবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বন্ধ করার ফলে তাঁর মনে স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা হল, কাজ গুছিয়ে নেওয়ার পর পনের আনা লোকের মত আমিও তাঁকে ত্যাগ করেছি।

অথচ মজাটা হল এই যুগান্তরে রন্টুবাবুর লোক বলে আমার ওপর স্ট্যাম্প পড়ে গেল। যুগান্তরে মালিকের নিজস্ব লোক হওয়াটা খুব অপরাধ বলে গণ্য হত। কারণ কর্মীদের মধ্যে অনেকেরই ঘোষ পরিবারের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ভয় বা ভক্তি কিছুই ছিল না। বরং তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা রঙ্গ রসিকতা এইসব চলত। এক কথায় যুগান্তরের কর্মীরা প্রকৃত অর্থেই সাংবাদিক স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

১৯৬০ সালে জানুয়ারি থেকে আমি যুগান্তর থেকে ১০০ টাকা করে মাসিক বেতন পেতে শুরু করলাম।

একশ টাকা থেকে আমি ত্রিশ টাকা বাড়িতে পাঠাব ঠিক করলাম। সত্তর টাকায় আমার যথেষ্ট চলে যাবে। আমি বেতন পাচ্ছি শুনে ছোট বউদি বললেন ঃ তুমি তাহলে আর হোটেলে খেতে যাবে কেন? আমাদের সঙ্গেই খেও।

ছোটদাদাদের সংসারে দাদা বৌদি আর একটি বাচ্চা মেয়ে। দাদা ডব্লু বি সি এস অফিসার। আলিপুরে বসেন। তাঁদের কিচেনে পিঁড়ি পেতে বসে খেতে হত।

আমার জন্য আর একটি পিঁড়ি পাতা হল। মাস গেলে সকালের চা জলখাবার ও দুবেলা মিলের দরুন আমি ত্রিশ টাকা করে দিতাম। কিন্তু টাকাটা বড় কথা নয়, তাঁদের আন্তরিকতাটাই বড় কথা।

গোবরডাঙ্গা থেকে ফিরে ইউনিভার্সিটি-তে মোনালিসার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু কথা হয়নি। সে আমার চিঠি পেয়েছে কিনা তাও বলেনি।

তার বাড়ি আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। আমার চাকরির ব্যাপারটা মোটামুটি থিতু অবস্থায় আসার খবরটা তাকে দিতে ইচ্ছা করল। অবশ্য এটা তার বাড়িতে যাবার একটা ছুতো। এই ফাঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে আমার চিঠিটা সে পেয়েছে কিনা।

একটি পুরনো আমলের বাড়ি। একতলায় মোনালিসারা থাকে। বেল টিপতেই একটি ছেলে বেরিয়ে এল। কাকে চাই জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম, মোনালিসা চক্রবর্তী এই বাড়িতে থাকে?

কোথা থেকে আসছেন?

আমি নাম বললাম। বললাম ওর সঙ্গে পড়ি।

আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে ছেলেটি বলল ঃ আমি দিদিকে খবর দিয়ে আসছি।

বুঝলাম ভাই। মুখের আদলটাও মোনালিসার মত। খবর দিয়ে ভেতর থেকে—ঘুরে এসে ছেলেটি আমার সামনে বসে বেশ সপ্রতিভ ভাবে গল্প জুড়ে দিল। সে কলেজে পড়ে। কথায় কথায় জানাল পাশ্চাত্ত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত তার খুব প্রিয়। বিশেষ করে বেটোফেন। আমি তখনও বোটোফেন সম্পর্কে ভাল জানি না।

একটু পরে মোনালিসা এল। আটপৌরে শাড়ি পরনে। তখন মেয়েরা বাড়িতেও শালোয়ার কামিজ পরত না। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল যেন।

কী ব্যাপার তুমি হঠাৎ?

আমার চাকরিটা পাকা হয়েছে এ খবরটা দিতে এলাম।

বেশ তো আমাদের সবাইকে খাইয়ে দিও একদিন।

তা দেব। প্রথম মাসের মাইনেটা আগে পেতে দাও। আমার চিঠি পেয়েছিলে?

মোনালিসা গম্ভীর হয়ে গেল। পুরু লেন্সের চশমা খুলে শাড়ির খুঁট দিয়ে মুছবার ফাঁকে ওর চোখ দিয়ে বিরক্তি ঝরে পড়তে দেখলাম। চশমাটা চোখে দিয়ে সে বলল ঃ তোমার চিঠি পড়ে বড় ভয় হল পার্থ।

আমি অবাক হলাম।

ভয়? কীসের ভয়?

আমার জন্য অনেক ছেলের কেরিয়র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাকে নিয়ে অনর্থক দ্বন্দ্বে তুমি দুলে উঠো না ; প্লিজ।

এইবার আমার পৌরুষে ঘা লাগল। একথা ঠিক, আমার জীবন ছিল স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক। ইউনিভার্সিটিতে এসে তবেই কোন বান্ধবীর সঙ্গে একান্তে কথা বলছি। বন্ধুত্বের মধ্যে অনুরাগের ছোঁয়া থাকতেই পারে। একথাও ঠিক আমি অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক। অনুভূতিপ্রবণ। এই গাছ পালা, আকাশ পৃথিবী কাছের মানুষ নিছক এক অস্তিত্বমাত্র নয়। তাদের সঙ্গে আমার অন্তরের সম্পর্কে। তারা আমাকে ভাবায়। উদ্দীপ্ত করে। হাসায়, কাঁদায়। আমার সে ভাবনাকে দলিত মথিত করার অধিকার কারও নেই।

আমি বললাম ঃ নিজেকে তুমি বড় বেশি দুর্মূল্য করে তুলছ মোনালিসা। সত্যিই কী এসব কথা বলার কী কোন দরকার ছিল—চা আসার আগেই আমি কাঁপতে কাঁপতে চলে এলাম।

আমার আজকের শীতের মিষ্টি সকালটা মাঠে মারা গেল।

কেন আমিই বা নিজেকে এত শস্তা করে তুললাম। কেন? কেন?

সব খবরের কাগজ অফিসেই সব কটি দৈনিক কাগজ আসে। সাংবাদিকরা সব কটি কাগজই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেয়। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে

কোন কাগজ কোন খবরটা দিতে পারেনি তা নিয়ে।

কাগজে ঢুকে আমার দুটি অভ্যাস হয়ে গেল। ঘন ঘন চা খাওয়া আর খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়া। চা পাওয়া যেত ফ্রিকুপনের বিনিময়ে। আমার চা খাওয়ার নেশা ছিল না। পেলে খেতাম, না পেলে নয়। আমাদের বাড়িতে নিয়মিত চায়ের পাট ছিল না। যুগান্তরে নাইট ডিউটি দিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, নাইট ডিউটি দিতে গেলে দুপুরটা ঘুমিয়ে নিতে হয় আর ঘন ঘন চা খেতে হয়।

খবরের কাগজগুলো নিয়মিত পড়তাম। বিশেষ করে দৈনিক লোকসেবক। বিজ্ঞাপন তেমন থাকত না বলে অনেক খবর থাকত। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের খবর। বিদেশের খবর। কারণ লোকসেবকই কলকাতার একমাত্র কাগজ যা পূর্ব পাকিস্তানে যেত।

এমনি একটা ছোট্ট খবর চোখে পড়ল। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন ছয়জন তরুণ সাংবাদিককে ভ্রমণ বৃত্তি দেবেন। তাঁরা ইংলন্ডে এসে হাতে-কলমে কাজ শিখবেন। আগ্রহী ব্যক্তিরা আবেদন করুন। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন। ১৫৪ই ফ্লিট স্ট্রিট। লন্ডন ই-সি ফোর।

আমি ঠিকানাটি একটি কাগজে লিখে নিলাম।

তারপর দিন বাড়িতে বসে ইংরাজিতে একটি দরখাস্ত লিখে কৃষ্ণ ধরকে দেখালাম।

দেখুনতো, একটা দরখাস্তের মুসাবিদা করেছি। হয়েছে কিনা।

কৃষ্ণদা পড়ে বললেন ঃ বিলেত যাবে নাকি?

আমি বললাম ঃ কপাল ঠুকে দরখাস্ত একটা দিয়ে দেই তো। হবে না জানি। তবে দিতে দোষ কী?

আসলে ওই বিজ্ঞাপনটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে গেল। আমি একটি দরখাস্ত মুশাবিদা করলাম।

কৃষ্ণদা ইংরাজি সংশোধন করে দিলেন। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে দরখাস্ত টাইপ করালাম।

তারপর সেটা নিয়ে দক্ষিণাদার কাছে গেলাম।

দক্ষিণাদাকে বললাম ঃ একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে দক্ষিণাদা। আমি যে এখানে চাকরি করি তার প্রমাণপত্র চাই।

ঃ তুমি কি বিলেত যেতে চাও নাকি?

ঃ যেতে তো চাই। কিন্তু যাওয়ার পথ তো জানি না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। এখন আপনার সার্টিফিকেট তো একটা লাগবে। তা নাহলে দরখাস্ত ভ্যালিড হবে না।

ঃ ঠিক আছে। কী লিখতে হবে লিখে নিয়ে এস।

লিখে নিয়ে গেলাম। খসখস করে দক্ষিণাদা সই করে দিলেন। এইভাবে সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও সার্টিফিকেট জুটল।

সাহিত্যিকদের নাটকের সূত্রে কবি মৃত্যুঞ্জয় মাইতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাকে

আমার দরখাস্ত করার কথা বললাম। বললাম, ডাক্তার রায়ের সঙ্গে কী করে দেখা করা যায় বলতে পারেন? আমি তাঁর সুপারিশ নেব।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু খাদ্য দফতরের প্রতি মন্ত্রী চারু মহান্তির পিএ। বসতেন ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের অফিসে। যথেস্ট প্রভাবশালী লোক। বললেন ঃ আমি একটা কাজ করতে পারি; চারুদাকে দিয়ে একটি চিঠি করে দিতে পারি ডাঃ রায়কে। বাকিটা তোমার দায়িত্ব।

ওই চিঠি নিয়ে একদিন সকাল দশটা নাগাদ হাজির হলাম মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারের সামনে। ওঁর অন্যতম ব্যাক্তিগত সচিব ছিলেন, ধীরমাধব বসু। তাঁকে চিঠিটা দিতেই তিনি নানা জেরা করতে শুরু করলেন। কেন দেখা করতে চাই। আমি কে? চারু মহান্তিকে কীভাবে চিনলাম?

অবশেষে ডাঃ রায়ের চেম্বারে আমার ডাক পড়ল। সেই ১৯৫৬ সালে তার কাছে গিয়েছিলাম। তারপর আজ চার বছর পরে আবার।

কিন্তু আমার আগের কোন পরিচয় দিলাম না। ডাঃ রায়ের পক্ষেও আমায় মনে রাখা সম্ভব নয়।

কী চাই? ডাক্তার রায় তাঁর বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বললাম ঃ আমি যুগান্তরের সাংবাদিক। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের একটি ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত করছি। আপনি যদি একটা সুপারিশপত্র লিখে দেন।

ডাঃ রায় বললেন, ওটা কি সরকারি কোন সংস্থা?

আমি বললাম, না। আমি যতদূর শুনেছি, কমনওয়েওথ দেশগুলির খবরের কাগজের মালিকদের সংগঠন। সরকারি কি না ঠিক বলতে পারছি না।

ডাঃ রায় বললেন ঃ সরকারি ছাড়া আমি কোন প্রাইভেট অর্গানিজেশনকে এই চেয়ারে বসে অনুরোধ করতে পারি না। আপনি বরং খোঁজ-খবর নিন। তারপর আসবেন।

'আপনি' বলে আমায় সম্বোধন করায় একটু অবাক লাগল। আমি শুনেছিলাম ডাঃ রায় বয়স্ক লোকদেরও তুমি বলেন, আমি তো এক ছোকরা।

এরপর খোদ তরুণকান্তি ঘোষের সুপারিশ নেবার জন্য গেলাম শিশির কুঞ্জে।

আমায় এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন তিনি। বললেন, এই বয়সেই, কি বিলেতে যাবি? এই দ্যাখ না অমিতাভ (চৌধুরী) কতদিন কাজ করার পর এখন দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শিশিব কুঞ্জ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এলাম। দরখাস্তটা কি পাঠাবো? না, পাঠাবো না।

একবার ভাবলাম, থাক। ছিঁড়ে ফেলে দেই। তারপরেই ভাবলাম। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই। পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। তা ছাড়া আমাদের মত গরিব ঘরের ছেলেদের, যাদের কোন সহায় সম্পদ নেই, তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত চেষ্টা করে যাও। বার বার চেষ্টা করো। চেষ্টা করেও বহু মানুষ ব্যর্থ হয়। কিন্তু তবু সাফল্যের আশা থেকেই যায়। কিন্তু চেষ্টা না করলে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

তারপর দিনই জিপিও থেকে রেজিস্ট্রি করে আমি দরখাস্তটি কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের দফতরে পাঠিয়ে দিলাম। পাঠিয়ে দেওয়ার পর মনটা হাল্কা হয়ে গেল। আমি আর ওই দরখাস্ত সম্পর্কে কিছু মনেই রাখলাম না। মনে করলাম, ওটা যেন আমি ছিঁড়েই ফেলে দিয়েছি।

ফেব্রুয়ারি মাসের এক দুপুরে অফিসে গিয়ে একগাদা নিউজ নিয়ে বসেছি। এমন সময় দক্ষিণাদার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বরুণ রায় বলল ঃ আপনি বিলেতে যাচ্ছেন। কনগ্রাচুলেশনস।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। মাসখানেক আগে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নে পাঠানো দরখাস্তটার কথা মনে পড়ল। তবে কি—

আমি বললাম ঃ কী ইয়ার্কি করছেন? বরুণ রায় স্বল্পভাষী। সিরিয়াস ধরনের ছেলে। প্রগলভ নয়। আমার সময়বয়সী হলেও আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক নয়। পাশাপাশি কয়েকমাস কাজ করেও একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ভালবাসত। সে বাজে কথা বলার লোক নয়।

বরুণ বলল ঃ হ্যাঁ, দক্ষিণাদার ঘরে ক্রিড এসেছে দেখে এলাম। রয়টারের খবর। দক্ষিণাদা আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

দক্ষিণাদার ঘরে যেতেই তিনি বললেন ঃ তুমি এসেছ? তোমার সেই স্কলারশিপটা হয়ে গেছে। তাহলে আমার রেকমেন্ডেশনে কাজ হয়।

দক্ষিণাদা আমাকে ক্রিডটা এগিয়ে দিলেন। মোট ছজন সাংবাদিককে কমনওয়েলথের ছটি দেশ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাব মধ্যে পার্থ-কে চ্যাটার্জি—ইন্ডিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি।

আমার দেহযন্ত্রের কোথায় ইশ্বর বোধ হয় একটা শক আবজরভার বসিয়ে রেখেছিলেন। আমি সামান্য ব্যাপারে দুঃখ পাই ঠিকই। অভিমান হয়। রাগ হয়। অনুতাপ হয়। কিন্তু তার আয়ু এক রাতের বেশি থাকে না। একটা ঘুমের পর দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত দুঃখের স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছে যায়।

কিন্তু সুখ ও আনন্দেও আমি আবেগে উচ্ছ্বাসে ভেসে যাই না। জীবনে যেমন বহুবার হেরে গেছি, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে বহু খেলায় তো জিতেছিও। পাশার দান আমার পক্ষেই পড়েছে। কিন্তু আমার মনে কখনও হয়নি, সাফল্যের আনন্দ জীবন সমুদ্র মন্থন করা অমৃত। মনে হয়েছে এও যেন আর পাঁচটা ঘটনার মত স্বাভাবিক ঘটনা।

দক্ষিণাদা বললেন ঃ ফ্রম গোবরডাঙ্গা টু লন্ডন। তুমি সত্যিই রেকর্ড করলে একটা। এটি কালকের কাগজে ছেপে দিচ্ছি।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ হাতে করে প্রথম যে আমাকে সম্বর্ধনা জানাতে এল, সে আমার সহপাঠী প্রভাত। প্রভাত বলল ঃ কাগজের খবরটা মামা-মামীকে দেখাতেই তাঁরা বললেন, যে করে হোক ওকে ধরে নিয়ে আয়। সেদিন অতরাতে

গোলমালের মধ্যে ভাল করে কথা বলতে পারলাম না। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি বললাম ঃ এখন কী করে যাই, ইউনিভার্সিটিতে আজ এগারটায় শশীবাবুর ক্লাশ।

প্রভাত বলল ঃ ক্লাশ থাকলে তোকে আসতে বলতাম না। আজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ। আজ যে শনিবার সেটা তুই আনন্দের চোটে ভুলেই বসে আছিস।

অপ্রস্তুত আমি হেসে উঠলাম।

সেদিন দিনের আলোয় সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাড়িটিকে ভাল করে দেখলাম। এসব পাড়ায় সব বাড়িই একই রকমের। দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়ায় জীর্ণ। প্রত্যেক বাড়ির সামনে একটু করে রোয়াক। দোতলা, তিনতলায় রেলিং দেওয়া বারান্দা।

প্রভাত আজ সোজা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় নিয়ে গেল। ঢুকতেই বাঁদিকে বড় ঘর। এক পাশে একটি পালঙ্ক। পালঙ্কে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বসেছিলেন প্রভাতের মামা। পরনে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। টকটকে ফর্সা রঙ। পালঙ্কের সামনে একটি টিপয়ে পিক দান। একটি পানের কৌটা।

আমাকে দেখে প্রভাতের মামা বললেন ঃ আরে এসো এসো, কনগ্রাচুলেসন্স কাগজে খবরটা পড়েই আমি প্রভাতকে বললাম, যা বিলেতে পাড়ি দেবার আগে শিগ্রি ধরে নিয়ে আয়।

আমি বললাম, আপনি ধরে আনতে বললেন ঃ প্রভাত আমায় বেঁধে নিয়ে এল।

সত্যিই তো, তোমার ভীষণ অসুবিধে হল। তোমার কত কাজ। প্রভাতকে বলেছিলাম, তোমার সুবিধামত যে কোন একদিন আসার কথা বলতে। যা অবস্থা ছিল সে রাতে। তা তোমার ফিরতে কোন অসুবিধা হয়নি তো বাবা—

আমি বললাম, না-না। আপনার ভাগ্নে আমাকে গলি দিয়ে ঠিক পৌঁছে দিয়েছে। সত্যি সেই রাতে বড় বেশি জুলুম করেছি আপনাদের ওপর।

ঃ না-না-এসে ভালই করেছ। প্রভাতের সহপাঠী তুমি। তুমি তো আমার আপন ভাগ্নের মত। তোমার দেশ কোথায় বাবা—

ঃ গোবরডাঙ্গা।

ঃ চিনি, খুব চিনি। আমাদের বাড়ি ছিল খুলনা জেলায়। গোবরডাঙ্গার ওপর দিয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে করে কলকাতা আসতাম। প্রভাতের কাছে শুনেছ বোধ হয় আমাদের বেশ বড় রকমের জমিদারি ছিল। স্থানীয় লোকেরা রাজাবাবুই বলত। বিশাল প্রাসাদ। লোক লস্কর। সব ছেড়ে খালি হাতে কলকাতায় চলে এলাম। এই বাড়িটা অনেক আগে থেকেই ভাড়া নেওয়া ছিল। এটা আমাদের গেস্ট হাউসে হিসেবে ব্যবহার হত। আমরা কলকাতায় এলে স্পেনসারে উঠতাম। চাকর বাকররা এই বাড়িতে থাকত। এখন আমাদেরই থাকতে হচ্ছে। বাড়িওয়ালা আজ ত্রিশ বছর ধরে মেরামত করে না। আমি বললাম, বাড়িটা আমায় বিক্রি করো—তাও করবে না।

প্রভাতের মামা গল্প শুরু করে দিলেন। দেওয়ালে তাদের রাজবাড়ির ছবি টাঙানো ছিল। সেদিকে দেখালেন। সত্যিই বিশাল প্রাসাদ।

একটু পরে দেখি প্রভাতের মামীমা গরম লুচি আর মিষ্টি একটা রুপোর রেকাবিতে করে সামনের শ্বেতপাথরের টেবিলে রাখবেন। একটু পরে একটি কিশোরী এসে একটি কাজ করা কাঁচের গ্লাশে করে জল রাখল।

তখন আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ ছিল না। বরং মিষ্টি ভালই বাসতাম। গোবরডাঙ্গা মাখা সন্দেশ বা কাঁচাগোল্লার জন্য বিখ্যাত ছিল। নিশাপতির সন্দেশ আর অমূল্যের দোকানের ছানার গজা আমার ও বাবার দুজনেরই ফেভারিট খাবার।

কিন্তু বেলা নটার সময় এই হেভি ব্রেকফাস্ট দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। প্রভাতের মামীমা বললেন, আজ শুধু দুটো লুচির ব্যবস্থা করেছি। যাওয়ার আগে তোমাকে একদিন দুপুরে খেয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে একগুচ্ছ ফুলের মত কয়েকটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। প্রভাত বলল ঃ এরা সবাই আমার মামাতো বোন। এরা সাত বোন। আর এক ভাই।

সাতভাই চম্পার বদলে সাত বোন চম্পা—আর এক ভাই পারুল।

ঃ হ্যাঁ, তা বলতে পারো। ভাই সব চেয়ে ছোট, চার বছর বয়স। এ হচ্ছে বড়, এর নাম অনু তার পরে এ হচ্ছে মেজ সুতনুকা। প্রভাত আলাপ করিয়ে দিল বোনেদের সঙ্গে। আমি শুধু অনুকে দেখছিলাম। অন্য বোনেরা হাসিখুশি। কিন্তু এ মেয়েটি ত্রস্ত হরিণীর মত। সব সময় যেন শঙ্কিত আর কী করুণ মিনতি মাখা দুটি চোখ। অন্যসব মেয়েরা ফ্রক পরলেও অনু একটি শাড়ি পরেছিল। মেয়েটি ভীষণ রোগা আর দীর্ঘাঙ্গী। তারপরের বোন সুতনুকা শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী। অন্য বোনেরা সকলেই সুশ্রী ও ফর্সা।

একমাত্র সুতনুকার রঙটা একটু চাপা।

ওদের প্রত্যেকের চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। দেখলেই মনে হয় বনেদী ঘরের মেয়ে। যদিও ওদের পোশাক ও চালচলন নিম্ন মধ্যবিত্তদের মতই—বড় ও মেজমেয়ে দুজনেই এক ক্লাশে পড়ে—ক্লাশ নাইন।

একটি মিশনারি স্কুলের ছাত্রী ওরা।

মামীমা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। সংসারে আমার কে আছে। আমি কোথায় থাকি, কতদিন চাকরি করছি। বিলেত থেকে কবে ফিরব।

প্রভাতের মামার বাড়িটি আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। মনে হল এই বাড়ির লোকদের একটা আলাদা চরিত্র আছে। এরা গতানুগতিক মানুষের মিছিলে হারিয়ে যায়নি। প্রত্যেকেরই যেন আলাদা করে কিছু বলার আছে। আমার সাহিত্যিক মন ও সাংবাদিক অনুসন্ধিৎসা আমাকে বেশ কৌতূহলি করে তুলল। প্রভাতের কাছে যেটুকু তার মামার বাড়ির গল্প শুনলাম তা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। মামা কোনদিন চাকরি বাকরি করেননি। জমিদারের ছেলে চাকরি করলে নাকি সম্মান থাকে না। অথচ এতগুলো ছেলেমেয়ের দায় দায়িত্ব। মামাদের পরিবারকে সাহায্য করছে স্কুলের খ্রীস্টান ফাদার। ওদের স্কুলে ক্যান্টিন চালাবার দায়িত্ব দিয়েছে মামাকে। মামীমা আর কাজের লোক মিলে চপ কাটলেট তৈরি করে ক্যান্টিনে সাপ্লাই দেন। কিন্তু মামা নিজে ব্যবসা দেখবেন না

বলে একজন লোক রেখেছেন। লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে যায়। মামার মেয়েরা সবাই ওই ইস্কুলে ফ্রিতে পড়ে।

আমি বললাম, মিশনারিদের ভাল বলতে হবে। একটি বনেদী দুঃস্থ পরিবারকে তাঁরা বেঁচে থাকতে সাহায্য করছেন।

প্রভাত বলল ঃ তলে তলে ওদের যে সবাইকে খ্রীস্টান করার উদ্দেশ্য নেই তা কে বলতে পারে। আমার তো সেই সন্দেহই হয়।

প্রথমটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে সত্যি সত্যিই বিলেত যাচ্ছি। জ্যোতিষীর কথা ছাড়াও আরও এক ড্রামাটিক আয়রনির কথা মনে পড়ল। গোবরডাঙ্গা কলেজে আমার এক বন্ধু মাধু ঘড়ির ব্যবসা করত। আমাদের বাড়িতে কোন ঘড়ি ছিল না। সময় তার নিজের খেয়ালখুশি অনুসারে চলত। প্রয়োজনে আমরা ট্রেনের আওয়াজ শুনে আর সূর্যের আবর্তন থেকে সময় ঠিক করতাম। কলেজে পড়ার সময় কলকাতায় নীলাম থেকে বাইশ টাকা দিয়ে একটি ঘড়ি কিনেছিলাম—দু'মাসের বেশি চলেনি। তাই যুগান্তরে চাকরি পেয়ে একটি ঘড়ি কেনার কথা ভাবতেই মাধু ক্যাটালগ দেখিয়ে বলেছিল ঃ এই ঘড়িটা কেন, রাতের বেলা অন্ধকারেও ডায়াল দেখতে পাবে। বিদেশে তো যাবেই। ধরো শেষ রাতে প্লেন, তখন বিছানায় শুয়ে দেখতে পাবে কটা বেজেছে।

মাধুর কল্পনা শক্তির প্রশংসা করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখন ভাবতে বসলাম, ড্রামাটিক আয়রনি বলে তাহলে কিছু আছে। কত কথা মানুষ মনের অজান্তে বলে, অথবা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় হয়তো, তখন কে জানে সে কথা ভবিষ্যতেরই কোন অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বার্তাবহ কি না।

কিছুদিন রুদ্ধশ্বাসে দিন গুনলাম, রয়টারের ওই খবরের সমর্থনে আমার কাছে চিঠিপত্র আসে কি না। একদিন সত্যিই বিদেশী টিকিট মারা এয়ারমেল খাম এল আমার কাছে। ১ মে আমাকে লন্ডন গিয়ে পৌঁছতে হবে। ২৭ এপ্রিল বিওএসিতে আমার জন্য কলকাতা-লন্ডন ফ্লাইট বুক করা হয়েছে। বিওএসি অফিসে গিয়ে যেন টিকিটটা নিই। আমার যাত্রার সব আয়োজন আমি যেন এর মধ্যে সেরে ফেলি।

চিঠিটা সই করেছেন ব্রিগেডিয়ার ক্রশ বলে এক ব্যক্তি। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের তিনি মহাসচিব।

আমার স্কলারশিপ পাওয়ার সুবাদে পরিচিত মহলে আমি রাতারাতি ভিআইপি বনে গেলাম। আমার রাজনৈতিক দাদা রমেন ঘোষ একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। নাম স্পন্দন। আমাকে তার সম্পাদক করেছিলেন। স্পন্দনের পক্ষ থেকে ভারতসভা ভবনে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। দক্ষিণাদা সেই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও মঞ্জুবৌদি একদিন বাড়িতে খেতে ডাকলেন। মৃত্যুঞ্জয় মাইতি একদিন তাঁর বাড়িতে খাওয়ালেন। তখন তিনি কিছুকাল হল সন্তোষপুরে বাড়ি

তৈরি করে বাস করছেন।

প্রভাতের মামা-মামীমার মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণও এড়াতে পারলাম না।

সেই ভোজের কথা এখনও মনে আছে। সিন্দুক থেকে বার করা রুপোর থালা গেলাস ও বাটিতে করে শ্বেতপাথরের টেবিলে বসে খাওয়া। আক্ষরিক অর্থে পঞ্চ ব্যঞ্জন। একটি বাটিতে বিশাল বিশাল দুটি গলদা চিংড়ি। প্রভাতের মামা দেবলবাবু বললেন ঃ আমি আজ সকালে গিয়ে নিউমার্কেট থেকে বাজার করে নিয়ে এসেছি। আগেকার দিনে যখন নায়েব গোমস্তারা বাজার করত, তখনও গেস্ট এলে আমি হগ সাহেবের বাজারেই যেতাম। নিজে হাতে বাজার না করলে মনে হয় গেস্টের তৃপ্তি হল না।

আমি বললাম ঃ আমি কিন্তু ব্যাড ইটার। আমার জন্য এত আয়োজন বৃথাই করেছেন।

যারা ছোটবেলায় পেটভরে খেতে পায় না তারা বড় হয়ে হয় খুব পেটুক হয় না হয় স্বল্পাহারী হয়। আমি শেষেরটি হয়েছিলাম। একটু আহার করলেই আমার পেট ভরে যায়। কোন রকমে দুটো গলদা চিংড়ি সামলে প্রবলভাবে না-না রব উঠে তুলে পড়লাম। রামলালের প্রিয় দই-যেমন ছিল পড়েই ছিল।

এবার আমি আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সপ্রতিভ সুতনুকা। বেশ স্বচ্ছন্দ। কিন্তু বড় মেয়ে অনু খুব কম কথা বলে। তবে তার চোখের এক নীরব ভাষা আছে যাকে আমরা নন-ভার্বাল এক্সপ্রেসন বলে থাকি।

সে আমাকে ছাঁচি পান আর মশলার সুদৃশ্য বেকারি এগিয়ে দিল। আমি বললাম ঃ তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? সে মৃদু হেসে বলল ভাল।

আমি বললাম, কোন লাইনে যাবে ঠিক করেছ?

সাধারণত সব ছেলেমেয়েই এ প্রশ্ন শুনে চুপ করে থাকে। কেউ বলে এখনও ঠিক করিনি। উচ্চাশার কথা মুখ ফুটে বলতে অনেকে লজ্জা পায়। এটা সম্ভবত আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য। চুপ করে রইল অনুও।

সুতনুকা বলল ঃ দিদি সায়েন্স নিয়ে পড়বে। ও ডাক্তার হবে।

অনু মৃদু ধমক দিয়ে বলল ঃ তোকে পাকামো করতে হবে না।

আমি বললাম, ডাক্তার তো খুব ভাল। আমি বেশ পৃষ্ঠপোষকতার ভঙ্গিতে বললাম, ডাক্তারি করলে মানুষের খুব বেশি উপকার যায়। আমার যদি সুযোগ থাকত আমি সাংবাদিক না হয়ে ডাক্তার হতাম।

আপনার সাংবাদিকতা ভাল লাগে না? কত দেশ বিদেশ দেখার সুযোগ অনু এবার কথা বলল। সে কথা বলায় আমি খুব স্বস্তিবোধ করলাম। তাকে কথা বলাতে পেয়েছি তাহলে।

আমি বললাম ঃ দেশ দেখার চেয়ে মানুষ দেখা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তারের সে সুযোগ আছে।

কথার মাঝখানে মামীমা এসে পড়লেন।

মামীমা বললেন ঃ কবে ফিরবে?

আমি বললাম ঃ ছ'মাসের প্রোগ্রাম। আরও দুমাস তিনমাস ধরে ইওরোপ ঘুরব।

দেখো, যেন থেকে যেও না। মামীমা রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন। এখনকার ছেলেরা যে বিলেতে যায় সে আর ফেরে না।

আমাকে অনেকেই কিন্তু বলেছেন, এই তোমার সুযোগ। পারলে ওখানে থেকে যেও।

এমনকী মঞ্জু বউদি পর্যন্ত বলেছিলেন ঃ পারতো থেকে যেও ইংলন্ডে। আমার কত আত্মীয় বন্ধুরা সবাই থেকে গেছে। ভাল চাকরি বাকরি করছে। এদেশে ফিরে কিন্তু লাভ নেই।

মুখে বললাম ঃ আমাকে ফিরে আসতেই হবে। এটি আমার শর্ত। মামীমাকে দেখে মনে হল তিনি যেন আশ্বস্ত হয়েছেন।

যাত্রার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। পাশপোর্টের জন্য দরখাস্ত করে দিয়েছি। একদিন পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে গেল। তখন এখনকার মত গুচ্চের পাশপোর্টও ইস্যু হত না। মাসে আর পি ও থেকে গোটা পঞ্চাশেক পাশপোর্ট ইস্যু হত। কিন্তু ভীষণ কড়াকড়ি করা হত। ইংলন্ডে যেতে ভিসা লাগত না। পশ্চিম জার্মানী যেতেও ভিসা লাগত না। ব্রিটেনে চাকরি পেতেও কোন অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয়দের দলে দলে বিলেত আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার হিড়িক তখনও শুরু হয়নি।

বিলেতে শুধু গেলেই হল না—সাহেব সাজতে হবে। পোশাক তৈরি করতে হবে। জিনিসপত্র কিনতে হবে। কিন্তু আমার টাকা কোথায়? কিন্তু মুশকিল আসান করে দিলেন রামমোহন রায় রোডের বাড়ির ছোট জামাই আপ্পাদির স্বামী সুশান্ত মুখার্জি।

জামাইবাবু কলকাতা কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিকট ইঞ্জিনিয়র। গোলদিঘির উলটো দিকে কোয়াটার্সে থাকেন। হাসিখুশি ভরা দিলখোলা মানুষ।

আমাকে নিজে থেকে বললেন ঃ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে দত্ত ব্রাদার্স বলে আমার চেনা-জানা দর্জি আছে। ওরা তোমায় স্যুট বানিয়ে দেবে। ফিরে এসে টাকা শোধ দিও। দত্ত ব্রাদার্স থেকে দুটো স্যুট করলাম। চিঠিতে লেখা ছিল, একটি লাউঞ্জ স্যুট বা ডিনার জ্যাকেট সঙ্গে আনতে। আমি তখন কাকে বলে ডিনার জ্যাকেট, কাকে বলে লাউঞ্জ স্যুট তা জানি না। স্যুটই কখনও পরিনি। দর্জিই আমাকে বুঝিয়ে দিল কালো স্যুটকেই বলে লাউঞ্জ স্যুট। ডিনার জ্যাকেট কালো প্যান্টের ওপর সাদা রঙের জ্যাকেট। গলায় ফুলের কলির মত বো টাই।

স্যুট পরা তেমন কঠিন নয়—কিন্তু টাই এর নট বাঁধা আমার কাছে ভীষণ শক্ত কাজ বলে মনে হল। রিহার্স্যাল দেবার জন্য একটা টাইও যোগাড় করতে পারলাম না।

সুশীলদা ডব্লু বি সি এস অফিসার। বুশশার্ট পরে অফিস যান। কিন্তু ছাত্রজীবনে নাকি টাই পরতেন। টাই এর অভাবে তিনি একটি গামছা নিয়ে টাই-এর মত গলায় গলিয়ে নট বাঁধা শেখাবার চেষ্টা করলেন।

অবশেষে আমি দুসেট টাই কিনে ফেললাম। সেই সঙ্গে কমলালয় স্টোর্সে গিয়ে কিনলাম একটি শফট চামড়ার স্যুটকেশ। একটি স্লিপিং গাউন, উলের মোজা দুজোড়া আর একটি বাটার অ্যামবাসাডার জুতো। তখন বাটার অ্যামব্যাসাডর সবচেয়ে অভিজাত জুতো। ৫৭ টাকা দাম।

কাঁটা চামচ কীভাবে ধরতে হয় জানি না। দিশি সাহেবদের কাছে জিজ্ঞাসা করে কিছু টেবল ম্যানার্স শেখা গেল। যেমন ডান হাতে ছুরি। বাঁ হাতে কাঁটা ধরতে হয়। শব্দ করে চা বা স্যুপ খেতে নেই। খাওয়ার আগে কোলে ভাল করে ন্যাপকিন পেতে নিতে হয় যাতে ঝোল পড়ে কাপড় চোপড় না নষ্ট হয়ে যায়।

যাত্রার সব আয়োজন যখন প্রস্তুত তখন একদিন মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেসে হীরেন বসুর সঙ্গে দেখা হল। মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস থেকে দর্পণ ছাপা হত।

হীরেন দা বললেন ঃ শুনলাম তোমার বিলেত যাওয়া নিয়ে যুগান্তরের অমুক বাবু বিলেতে চিঠি পাঠিয়েছে।

আমাকে নিয়ে? কেন?

হীরেনদা বললেন ঃ আমি শুনলাম ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এই ব্যাপারটায় একসেপশন নিয়েছে। এখনও যার পাকা চাকরিই হয়নি এমন একজনকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হল কেন? তারা লিখেছে অ্যাসোসিয়েশন অবিলম্বে এই নমিনেশন খারিজ করে দেওয়া দাবি জানাচ্ছে।

শুনে সারা দেহটা ঝিমঝিম করে উঠল। হীরেনদা খবর রাখেন। অ্যাসোসিয়েশনের ওই নেতাকে আমি দাদা দাদা বলি। তিনি বাইরের ব্যবহারে খুব ভদ্র। তিনি যুগান্তর রিপোর্টিং বিভাগেই চাকরি করেন। আমাকে তিনি ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি।

অল্প বয়সে সেই আঘাতটা খুব লেগেছিল। এখন আর ব্যথা পাই না। সেই প্রথম নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছিলাম। খবরের কাগজে যোগ দেবার প্রথম দিনই রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব বর্জন করেছিলাম, কিন্তু রাজনীতি সারাজীবন ধরেই আমার পিছু নিয়েছে। আমার গোটা কর্মজীবন ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। আমার প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। উৎখাত করেছে আমাকে আমার স্বরাজ্য থেকে।

কিন্তু বহুক্ষেত্রেই আমি জয়ী হয়েছি শুধু ধৈর্য ও সহ্যশক্তি দিয়ে। ঠিক এইভাবেই আরও বার দুয়েক আমার বিদেশ যাত্রা বানচাল করার চেষ্টা হয়েছে। তখন আমি আনন্দবাজার পত্রিকায়। কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যায় সঙ্গে।

একবার দেশে জরুরি অবস্থার সময় ইংলন্ডে মাসকম্যুনিকেশন রিসার্চ কনফারেন্সে যাবার আমন্ত্রণ এল। আমার যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত। মায় আমার টিকা নেওয়া পর্যন্ত হয়ে গেছে।

যাবার মাত্র দুদিন আগে একটি ছোট্ট চিঠি পেলাম দিল্লির ডেপুটি হোম মিনিস্টারের কাছ থেকে—আমি আইন মোতাবেক অনুমতি চেয়েছিলাম, বিদেশ যাত্রার। অনুমতি দেওয়া হয়নি। শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণকারীদের টিকিট ফিরিয়ে দিতে হল কারণ জরুরী অবস্থায় সরকারে বিনা অনুমতিতে বিদেশে আমন্ত্রণে বিদেশ যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এ

ব্যাপারে কলকাঠি নেড়েছিল আমারই এক সহকর্মী।

আর একবার কনফারেন্সে যাচ্ছিলাম পোলান্ড। কলকাতার পোলিশ কনসাল জেনারেল আমাকে ভিসা দেবার সময় বললেন ঃ তুমি তোমার অফিসের অমুককে চেন?

আমি বললাম, চিনব না কেন? তিনি আমার সহকর্মী, এমনকি এক পাড়ায় থাকি।

কনসাল বললেন, তিনি এসে আমাকে বলে গেছেন, পার্থ চ্যাটার্জি সি আইএ-র লোক। তাকে যেন ভিসা না হয়। অবশ্য কনসাল জেনারেল এই স্বেচ্ছাহিতৈষী সাজা সহকর্মীর বারণ শোনেননি। আমায় ভিসা দিয়েছিলেন।

আর একবার খোদ ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দফতর আমাকে বিদেশে যাবার জন্য স্পনসর করলেন। গান্ধীজীর উপর একটি সেমিনারে যোগ দিতে যাব আমেরিকার সেন্ট লুইসে। সেই খবরটি তাঁরা টেলিফোনে আমাকে জানান। আমি ছিলাম না বলে যে কলিগ ফোন ধরেছিলেন তাঁকে খবরটা দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে বলেন।

যা হবার তা হল। মুহূর্তের মধ্যে দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের নেতা চলে গেল কলকাতায় পররাষ্ট্র দফতরের সেই মুখপাত্রের কাছে। আমাকে বিদেশ যাবার স্পনসর করে ভারত সরকার খুব অন্যায় করেছেন। তিনি দেখে নেবেন।

পাশপোর্ট অফিসারই আমায় রিপোর্টটা দিয়ে বলেছিলেন ঃ মশায়, সব জায়গাতেই পলিটিক্স আছে। কিন্তু আপনাদের লাইনে যা পলিটিক্স তার কাছে সে সব শিশু।

এক এক সময় মনে হয়েছে আমি একাই বোধ হয় এই পলিটিক্সের শিকার। তা নাহলে এত ছেলেমেয়ে এ লাইনে পটাপট উন্নতি করছে কি করে। কেউ তো তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে না। কিন্তু পরে জেনেছি, তারাও অমন কুচক্রের আক্রমণে পড়েছে। কিন্তু শঠের সঙ্গে শঠের মত আচরণের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তারা শিখে ফেলেছে বলে তাদের সঙ্গে শত্রুরা পেরে ওঠেনি। পলিটিক্স থেকে এ লাইন বাঁচার একমাত্র উপায় পালটা পলিটিক্স করা। সাপুড়ে যেমন জানে কীভাবে বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করতে হয়।

আমার মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দিয়ে এই সব আক্রমণকে বার বার প্রতিহত করা যায় না। এ কলকাতা শহরে বিদ্যাসাগরের মত মানুষও দেহরক্ষী নিয়ে চলতেন। তাঁকেও শক্তিশালী গ্রুপ করতে হয়েছিল। যূথভ্রষ্ট হলেই মার খেতে হয়। মার খেতে খেতে শেষ জীবনে নির্বাসিত হতে হয়। তবে আমি যে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি তা কখনও হতাশ হইনি বলেই।

না, হতাশ হবার কোন কারণে নেই। পাল্টা পলিটিক্স না করেও বেঁচে থাকা যায়। জীবনকে উপভোগ করা যায় যদি আপনি জীবনবাদী হন। যদি জীবনকে একটি সুখপাঠ্য উপন্যাসের মত মনে করেন। উপন্যাসের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত, কমেডি-ট্র্যাজেডি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবই থাকে। সব কিছু মিলিয়েই জীবনকে গ্রহণ করতে হয়। ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে। আমি তাই বলি, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকো। জীবন

প্রতি অঙ্কে, প্রতি দৃশ্যে যা তোমাকে উপহার দিচ্ছে তা গ্রহণ করো। গ্রহণ করো, অমৃত, গ্রহণ করো হলাহল।

সাংবাদিক নেতার অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে আমার বিলেত যাত্রার দিন এসে গেল। যাত্রার দিনটাও বেশ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শুরু হল।

বিওএসি বলেছিল, চৌরঙ্গীর সিটি অফিসে এলে তাঁরাই আমাকে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কারণ প্লেন রাত তিনটেয়। অত রাতে আমি কী করে এয়ারপোর্ট যাবো।

তাই রাত ন'টা নাগাদ আমি স্যুটকেশ নিয়ে একটি বাসে চেপে চৌরঙ্গী রোডে বিওএসি অফিসে পৌঁছলাম। আমার দুই বন্ধু ভবানী ও চিত্তমোহন চ্যাটার্জি বিওএসি অফিসে সে রাত্তিরে আমাকে সি-অফ করার জন্য বসেছিল।

আমি গিয়ে শুনলাম, প্লেন লেট হবে। আমরা তিনবন্ধু মিলে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম।

রাত দশটা নাগাদ শুনলাম, আজ আর প্লেন আসবে না। প্লেন আসছে নিউজিল্যান্ড থেকে। সিঙ্গাপুরে এসে কী এক ট্রাবল দেখা দিয়েছে। আমার ফোন নম্বর রেখে আমি যেন চলে যাই। সিঙ্গাপুর থেকে প্লেন ছাড়লে ওঁরা আমাকে খবর দেবেন।

একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর অত রাতে সে বাড়িতে ফিরতে মন চাইল না। চিত্ত তখন এন্টালি কর্পোরেশন ওয়ার্কশপে চাকরি করে। তার নাইট ডিউটি ছিল। সে প্রস্তাব দিল তার অফিসে যেতে। সবাই মিলে সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

বাসে করে রাত এগারটা নাগাদ মৌলালি এসে পৌঁছলাম।

সারারাত আড্ডা দিয়ে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল বেলা আটটা নাগাদ। তারপর দুই বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রামমোহন রায় রোডের বাড়িতে কড়া নাড়লাম।

তারা তো ভূত দেখার মত অবাক। আমি সব কথা খুলে বললাম। তারপর থেকে সারাক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছি কখন খবর আসবে। আমাদের বাড়ি ফোন নেই। সামনের এক ছাপাখানার ফোন নম্বর দিয়েছি। ওই ছাপাখানায় ফোন করে জানাল প্লেন আসছে বেলা তিনটেয়। আবার বিওএসি রওয়ানা দিলাম। খবর পেয়ে বিওএসি অফিসে ওই দুই বন্ধু ছাড়াও উষাপ্রসন্নর ছোট ভাই সবিতৃপ্রসন্ন এসেছিল। সবিতৃ তখন বেনারসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। অল্প বয়সে সে মারা যায়।

আমার সেই প্রথম বিমানে ওঠা। ততদিন বাঙালি লেখকদের বিমানযাত্রার বর্ণনা পড়ে শরীর রোমাঞ্চিত হত। বিশেষ করে বিমান বালিকারা বাঙালি লেখকদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাত। তাদের সঙ্গে লেখকদের বন্ধুত্ব হয়ে যেত। তাদের পাশের যাত্রিনী অপূর্ব সুন্দরী হত। এবং তাদের সমস্ত যাত্রাপথ মধুর হত।

আমার পক্ষে সে সব কিছুই হল না। শুধু নিউজিল্যান্ড থেকে আসা কমনওয়েলথ

প্রেস ইউনিয়ন ফেলো সহযাত্রী টেড ফর্স্টের সঙ্গে আলাপ হল। আমি তার ইংরাজি কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম সে আমাকে দেখে খুব প্রীত হয়েছে।

আমাদের প্লেন করাচি, কায়রো বেইরুট ও জুরিখে থামল। প্রতিবারই প্লেন থেকে নেমে ট্রানজিট লাউঞ্জে গিয়ে বসতে হত। সেখানে কোল্ড ড্রিঙ্ক পান করে আবার দীর্ঘ যাত্রা শুরু। অবশেষে একুশ ঘণ্টা পরে লন্ডন গিয়ে পৌঁছলাম। সেদিন ১ মে সকাল।

॥ আঠারো ॥

প্রথম প্রবাস

লন্ডন হিথরো বিমান বন্দরে নেমে প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারলাম আমি স্বপ্ন দেখছি না সত্যি বিলেতের মাটিতে পা দিয়েছি। এতদিন ধরে যে দেশের গল্প শুধু বইতে পড়েছি। আজ সত্যি সত্যি যে সে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি তা ভাবতে পারছিলাম না।

টেডের সঙ্গে ট্যাক্সি শেয়ার করে আমরা ওয়েস্টওয়ে হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম। চিঠিতে হোটেলের নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল। বলা ছিল আমাদের জন্য সেখানে ঘর রিজার্ভ করা আছে। আমি এসেছিলাম পকেটে মাত্র ছ পাউন্ড সম্বল করে। ট্যাক্সি ভাড়াতেই চার পাউন্ডের মত বেরিয়ে গেল। তবে হোটেলে পৌঁছেই আমি রিসেপশন থেকে একটি খাম পেলাম। তাতে লন্ডন সম্পর্কিত কাগজপত্র। আমাদের প্রোগ্রাম এবং একটি খামের ভেতর কুড়ি পাউন্ড। মিসেস ফ্রিগার্ড বলে এক ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছেন ঃ তিনি সেক্রেটারির ব্যক্তিগত সচিব। আজ ছুটির দিন, তাই কেউ আসতে পারলেন না। আগামী কাল ফ্লিট স্ট্রিটে আমাদের গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে, আমরা যেন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

টেড ছেলেটি নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে একটি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। বয়স পঁয়ত্রিশের মত। লম্বা ঋজু চেহারা। সে কপি বয় হিসাবে জীবন শুরু করেছিল। কপি বয় মানে আমরা যাকে বেয়ারা বলি। যার কাজ এক ডেস্ক থেকে আর এক ডেস্কে কপি নিয়ে যাওয়া।

আলাপ হল আরও কয়েকজনের সঙ্গে, যারা অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, ব্রিটিশ গায়ানা ও পাকিস্তান থেকে এসেছে। এদের মধ্যে পাকিস্তানের ওমর ফারুকির সঙ্গে আমার ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ফারুকি করাচির উর্দু কাগজ আঞ্জামের সম্পাদক। তার বয়স চল্লিশ। মাথায় টাক বলে আরও বয়স্ক দেখায়। কিন্তু শিশুর মত সরল। সে নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করল। আমি উর্দু ভাষা আগে কখনও শুনিনি। ফারুকির মুখে উর্দু শুনে বুঝলাম কতগুলি শব্দ ছাড়া উর্দু আর হিন্দি প্রায় একই। ফারুকি ইংরাজির চেয়ে উর্দুতে কথা বলাই বেশি পছন্দ করত। আমি এই দুটো ভাষা মিশিয়ে কথা বলতাম।

ফারুকি বলল ঃ আমি আগে সামান্য কয়েকদিনের জন্য লন্ডন এসেছিলাম। তবে

এত বড় শহর ৭০০ বর্গমাইল এর এরিয়া। সারাজীবন বাস করলেও এর থই পাওয়া ভার। ফারুকি প্রস্তাব দিল আজ বিকেলে তুমি যদি চাও আমরা দুজন একটু ঘুরে আসতে পারি। তুমি ওয়াটার প্রুফ সঙ্গে এনেছ তো?

আমি ওয়াটার প্রুফ সঙ্গে আনিনি। তবু শীতের কথা ভেবেই শঙ্কিত ছিলাম। যদিও আমি সামারে যাচ্ছি বলে রক্ষা। কিন্তু ওদের সামার মানে আমাদের বর্ষা, একথা জানা ছিল না।

সকালে যখন এয়ারপোর্ট থেকে আসি, তখন আকাশের মুখ ভার ছিল। হোটেলে উঠে দেখলাম বেশ ঝির ঝির বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তখনই ভাবলাম একটা ওয়াটার প্রুফ কিনে নিতেই হবে।

আমরা ছিলাম টুস্টার হোটেলে। কিন্তু এর আগে আমি কোন হোটেলেই থাকিনি। ছাত্রজীবনে দিল্লি গিয়ে একটি ধর্মশালায় ছিলাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় বিন্ধ্য প্রদেশের ছতরপুরে এক সামার ক্যাম্পে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ভিনরাজ্যের তিন বন্ধু মিলে ঝাঁসি, গোয়ালিয়র আর আগ্রা ভ্রমণ করি। ঝাঁসিতে আমরা ছিলাম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, গোয়ালিয়ারে এক পার্কে খোলা আকাশের নীচে আর আগ্রাতে একটি ধর্মশালা পেয়েছিলাম। দুই তারার এই হোটেল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সারা ঘরে কার্পেট। বাথরুম দেখলে ব্যবহার করতেই সঙ্কোচ হয়। দেওয়ালে বাহারি রঙ। বাহারি আলো, ওয়ারড্রোব, রাইটিং টেবল, আর দুধের ফেনার মত বিছানা। বিছানায় বসতেই ইঞ্চি দুয়েক বসে গেল।

সারারাতের ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিছানায় শুতে গিয়ে অস্বস্তি লাগল। নরম বিছানায় ঘুমোবার জন্যও স্পেশ্যাল ট্রেনিং-এর দরকার।

বিকেল বেলা ফারুকি আমায় নিয়ে বেরুল। মেট্রোয় চেপে আমরা বেজওয়াটার স্টেশনে নেমে ভুস করে ভেসে উঠলাম। পাতাল রেলের কথা বইতে পড়েছি। কিন্তু ওপরে রাস্তা, এমনকী টেমস নদী বহে চলেছে তার নীচে দিয়ে রেল লাইন আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। একটি মেট্রোরেলের ম্যাপ নিলাম স্টেশনের কাউন্টার থেকে। সাতটা লাইন রয়েছে মেট্রোর। ঠিক মাকড়শার জালের মত গোটা শহরে পাতাল রেলের লাইন বিছানা।

বেজওয়াটার রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা হাইড পার্কে পৌঁছলাম। লণ্ডন শহর সম্পর্কে বাংলায় অনেক বই লেখা হয়েছে। প্রায় সব কটি বই আমি পড়েছিলাম। এর মধ্যে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অন্য নগর ও হিমানীশ গোস্বামীর লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় আমার প্রিয় বই ছিল। তাই চোখে না দেখলেও লন্ডন আমার প্রিয় শহর হয়ে উঠেছিল।

হাইড পার্কটি বিশাল। কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকের মতই আয়তন। চওড়ায় তার চেয়েও বড়। এই মুহূর্তে আমার কাছে তুলনামূলক কোন তথ্য নেই। পার্কের এক প্রান্তে বিখ্যাত স্পিকার্স কর্নার দেখলাম। আসলে এটা একটা মজা। যে যা খুশি বিষয় নিয়ে সেখানে একটি সাবানের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারে আর বক্তৃতার

মাঝে দর্শকেরা নানাবিধ টিকা-টিপ্পনী কাটতে পারে।

দেখলাম পয়লা মে মে দিবস উপলক্ষে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি একটি বিরাট মিছিল বার করেছে। দল যদিও পার্লামেন্টে একটা আসনও পায়নি তবু কম্যুনিস্ট পার্টির অনুগামীর অভাব নেই। আমাদের ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের অনেকেরই দীক্ষা তাদের কাছে।

প্রথম দিনেই লন্ডন শহরের দুটো দৃশ্য আমার অনভ্যস্ত চোখে একটু লাগল। এক রাস্তায় ধুলোবালি কাদা নেই। কাগজ বা নোংরা পড়ে নেই। দু নম্বর হল প্রেমিক প্রেমিকারা রাস্তার মধ্যেই পরস্পরকে জুড়িয়ে ধরে হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকাদের মত পথ হাঁটছে আর মাঝে মাঝেই একবার করে চুমু খাচ্ছে। আর সেকী দীর্ঘ চুম্বন-কচ্ছপের কামড়ের মত। মেঘ না ডাকলে ছাড়াছাড়ি নেই।

রাতে বিছানায় শুতে গিয়ে দেখলাম কম্বলের দুই প্রান্ত বিছানার দুই দিকে সাঁটা। আমার জানা ছিল না, যেমন কম্বল তেমনি রেখে সন্তর্পণে নিজেকে তার গহ্বরে চালান করে দেওয়াই রীতি। এটি জেনেছিলাম, আরও কিছুদিন পরে। আর একটি মুশকিল হল হাফ বয়েল্ড ডিম খাওয়া নিয়ে। আমি দেখি একটি ছোট পেতলের কাপের ভেতরে ডিমের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে আমাকে ব্রেকফাস্টে দেওয়া হয়েছে। আমি খুব চালাক ছেলের মত ডিমটা ভেঙে তার ভেতরের সব অংশ কাপের ভেতর ঢেলে দিলাম। তারপর চামচ দিয়ে তুলে তুলে খেতে লাগলাম।

দেখি পাশের টেবলের কয়েকজন সাহেব মেম আমার এই ডিম ভোজন প্রক্রিয়া দেখছে। আমি বুঝতে পারলাম না টেবল ম্যানার্সের কোন রীতি লঙ্ঘন করেছি কি না।

আমার বিলাত যাত্রার কিছুদিন আগে লন্ডনের যুগান্তর প্রতিনিধি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে আমি বলেছিলাম। আমাকে একটু টেবল ম্যানার্স শিখিয়ে দিন তো।

তিনি সানন্দে রাজি হয়েছিলেন। বলেছিলেন খুব ভাল কথা। ফিরপো' কিংবা গ্র্যান্ডে আমায় একটা ডিনারে নিয়ে চলুন।

কিন্তু আমার পকেটের কথা ভেবে আমি আর প্র্যাকটিক্যাল ডেমনসট্রেশনের মহামূল্য পাঠটি নিতে পারিনি।

এসবই শিখেছিলাম দেখে ও ঠেকে।

পরদিন ফ্লিট স্ট্রিটে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের অফিসে গিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম বুঝে নিলাম।

আমাদের এই মাসটা সেন্ট্রাল অফিস অফ ইনফরমেশন লন্ডন শহরের বিভিন্ন জায়গা দেখাবে। শেষের মাস ব্রিটেন ও নর্দার্ন আয়ার্ল্যান্ড ট্যুর।

দ্বিতীয় মাস থেকে শুরু হবে সংবাদপত্রে হাতে কলমে কাজ। চলবে চার মাস পর্যন্ত।

ফেরার সময় ফ্লিট স্ট্রিটটা ভাল করে ঘুরলাম। চওড়ায় আমাদের কলেজ স্ট্রিটের

মত। দু পাশে বড় বড় বাড়ি। অধিকাংশই খবরের কাগজের অফিস। যেমন কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের পাশের দুটো বাড়ির পরেই টেলিগ্রাফ পত্রিকার অফিস। আর একটু দূরে বিখ্যাত ডেইলিমেল, ডেইলি মিরর। খুব বেশি দূরে নয় দ্য টাইমস। আমরা যাকে লন্ডন টাইমস বলে জানি। সম্ভবত নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক টাইমের সঙ্গে তফাতটা বোঝানোর জন্যই।

দ্য টাইমস ইংলন্ডের সবচেয়ে ধনেদী, সবচেয়ে অভিজাত কাগজ। প্রথম পাতায় খবর থাকে না। শুধু শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। কেন?

না, খবরের কাগজ যখন প্রথম বার হয় তখন এটাই ছিল দস্তুর। দ্য টাইমস এত কনজারভেটিভ যে সেই ঐতিহ্য থেকে সরে আসেনি। তখন ২৪ পাতার কাগজ প্রকাশিত হত লাইনোটাইপে। যাকে বলা হয় হটমেটাল বা ধাতু গরম করে ছাপা। এরাই প্রথম লাইনোটাইপ ও হাইস্পিড রোটারি প্রেস শুরু করেছিল।

ব্যাঙ্ক অথবা টেম্পল টিউব স্টেশন থেকে মেট্রো ধরা যায়। কাছেই অল্ড উইচ এ বিবিসি অফিস আর ভারতীয় হাই কমিশন অফিস। আরও হেঁটে এগিয়ে এলে শোহোর থিয়েটার পাড়া। পিকাডালি সার্কাস।

ফারুকির সঙ্গে দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত লন্ডনের এইসব পাড়ায় ঘুরলাম।

তারপর ফারুকি বলল ঃ ইয়ার; এইভাবে হোটেলে থাকলে কিছুই জমাতে পারবে না। তার চেয়ে চল দুজনে আমরা একটা ঘর ভাড়া করি। নিজেরই রান্না বান্না করে খাবো।

আমি বললাম, ঘর ভাড়া নিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি ভাই রান্না বান্না করতে পারি না।

ফারুকি বলল ঃ আরে এদেশে রান্না মানে শুধু গ্যাসের উনুন জালাতে শেখা আর টিন খুলতে জানা।

ফারুকির চাপে পড়ে আমরা কুইন্সওয়েতে একটি ঘর নিলাম। বেসমেন্টের ঘরগুলোর একটু ঠাণ্ডা কম আসে। ভাড়াও কম। ছ পাউন্ড সপ্তাহে ভাড়া। লন্ডনে মনে হল অর্ধেক লোক বাড়ি ভাড়া দিয়ে খায়। কারণ এ লাইনে সব এক রকমের বাড়ি। দু বাড়ির মধ্যে কোন ফাঁক নেই। ফুটপাথ ঘেঁসে সারি সারি বাড়ি। আর প্রত্যেক বাড়িতেই ভাড়াটে ভর্তি। দামী কার্পেট পাতা ঘর। বড় ডবল বেড খাট। বিছানার মানও হোটেলের মতই। ঘরের মধ্যে গ্যাসের উনুন আছে। পাইপে করে প্রাকৃতিক গ্যাস আসে। ছ পেন্স শ্লটে ফেলে দিলেই একবেলার রান্নার মত গ্যাস পাওয়া যায়।

বাড়িউলি মেমসাহেবের কাছেই সসপ্যান পাওয়া গেল। দুটো প্লেট আর দুএকটা কনটেনার ফারুকি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এল। আনল ফ্রোজেন চিকেন। মার্গারিনের প্যাকেট। পাটনাই চালের প্যাকেট। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে খানা তৈয়ার।

ফারুকিকে নিয়ে আমি আমার বিলেত দেশটা মাটির বইতে অনেক মজার মজার গল্প লিখেছি। দেশে ফেরার পথে করাচিতে তার বাড়িতেও একরাত কাটিয়ে এসেছি। এই লোকটি এমনিতে খুবই বন্ধু বৎসল ছিল, কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের কথা উঠলেই সে অন্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করত। তাকে আমি কোনদিন নামাজও

পড়তে দেখিনি, আল্লার নাম নিতেও দেখিনি। তার সাবেক বাড়ি ছিল দিল্লীতে। করাচিতে সে উদ্বাস্তু হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তানের জন্য সে জান লড়িয়ে দিতে পারত। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই ভারত পাকিস্তান নিয়ে এমন বিরোধ হত যে মনে হত এই মুহূর্তেই বোধ হয় আল্লা হো আকবর বলে ফারুকি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সে সব কিছুই হত না।

একমাস ধরে আমরা লন্ডনের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা ও প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

যেমন লন্ডনে আমরা টাওয়ার অব লন্ডন, পার্লামেন্ট হাউস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখলাম তেমনি একেবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভেতরে গিয়ে পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। একদিন গেলাম টাকশাল দেখতে—কীভাবে মুদ্রা তৈরি হয়। মেট্রো রেলের অফিসে গিয়ে কীভাবে লন্ডনের মেট্রো চলে তাও দেখলাম। একদিন কাউন্টি কাউন্সিলে গিয়ে মেয়রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। লন্ডনে থাকার সময় আমরা টাইমস পত্রিকার অফিস ও রয়টারের অফিসে একদিন গেলাম।

লন্ডন বাসের সময় আমার জীবনে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল।

তার মধ্যে একটি রানী এলিজাবেথের বোন রাজকুমারী মার্গারেটের বিয়ে দেখা। ইংলন্ডের লোকেরা রাজা-রানী বলতে পাগল। সেই রানীর মায়ের পেটের বোন মার্গারেট। তিনি কাগজে কাগজে সাড়া ফেলেছিলেন রাজপরিবারের বাইরে এক সাধারণ যুবককে বিয়ে করে। যুবকের নাম টনি ভাল নাম আর্মস্ট্রিং জোন্স। তিনি একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফার। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। ভাঙা চোয়াল। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। রাজপুত্র ফেলে রাজকন্যা একজন ফোটোগ্রাফারকে বিয়ে করছে, এটাই ছিল খবর। বাকিংহাম প্যালেসের খবর পাবলিক ভাল খায়। তার জন্য তাবড় তাবড় রিপোর্টারদের রেখে দেওয়া হয়। ডেইলিমেল, ডেইলি মিরর রাজপরিবারে কেচ্ছা বার করার ওস্তাদ। টাইমস এসব দিকে মাড়ায় না। তবে খবব হলে তারা খবর ছাপে। তাও সংযত ভাবে।

মার্গারেটের বিয়ে। একেবারে হই হই কাণ্ড। কদিন ধরে কাগজে কাগজে শুধু খবর বেরুচ্ছে কত টাকা খরচ হচ্ছে বিয়েতে। কত লোক খাচ্ছে। কে কী উপহার দিচ্ছে। কোন কোন রাজারাজড়া আসছে। বিয়ের বাজার কী হচ্ছে।

কে যেন বলেছিল শেষ পর্যন্ত দুজন রাজাই থাকবে ঃ তাসের রাজা আর ইংলন্ডের রাজা। কিন্তু সে ভবিষদ্বাণী খাটেনি। পৃথিবীর বহু দেশেই রাজতন্ত্র নেই, সংসদীয় গণতন্ত্র কিন্তু বহু দেশেই রাজার মহিমা অক্ষুণ্ণ। ব্রিটেন ছাড়াও জাপান, ডেনমার্ক, তাইল্যান্ড, জর্ডন, সৌদি আরব, ইথোপিয়া নেপাল এমন অনেক দেশেই রাজা আছে। সেসব রাজারা বহল তবিয়তে আছেন। প্রেস ইউনিয়ন থেকে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে প্রেস কার্ড দেওয়া হল। এই কার্ড দেখালে আমরা বাকিংহ্যাম প্যালেসের সামনে ভিকটোরিয়া মেরোরিয়ালের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াতে পারব। ওখান থেকে দুশো গজের মত প্যালেস গেট। বরকনে ওই গেট দিয়ে বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে ওয়েস্টমিনিস্টার

অ্যাবেতে যাবে। সেখানে মন্ত্র পড়ে বিয়ে হবে। তারপর বর বউ ফিরে আসবে ওই একই পথ ধরে।

আগের দিন সন্ধ্যার সময় প্যালেসের সামনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই মফঃস্বলের লোক। পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে চলে এসেছে। স্লিপিং ব্যাগ পরে রাতে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকবে ওই ঠাণ্ডার মধ্যে। অনেকেই হয়তো রাতে ঘুমবেই না। গান-বাজনা করে কাটিয়ে দেবে। কেউ এনেছে টেপ রেকর্ডার, কেউ গিটার।

যারা আনন্দ করতে চায় তাদের একটা উপলক্ষ পেলেই হল। তবে একা একা আনন্দ উপভোগ করা যায় না। আনন্দ করতে গেলে সকলের সঙ্গে মিলে আনন্দ করতে হয়। এমনকী ভাল একটা দৃশ্য দেখলে মানুষের ইচ্ছা হয়, আহা যদি প্রিয়জনকে এটা দেখাতে পারতাম। আবার আনন্দের ভাষাও পৃথিবীর সর্বত্র এক। কলকাতায় যারা সারারাত জেগে শম্ভু মিত্রের নাটক দেখার টিকিটের জন্য লাইন দেয় অথবা কোন মেলায় বা কনফারেন্স জমায়েত হয়, তাদের সবার আনন্দের ভাষাই এক। তাই আনন্দ করাকে আমি হুজুগ বা আদিখ্যেতা বলে ভাবিনি। সাধারণ মানুষকে তো কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতর ঢুকে গেলাম। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতার মত কোন বাড়ি নয়, একটি খোলা বাঁধানো জায়গা। ভিক্টোরিয়ার মূর্তি এবং আরও কিছু ভাস্কর্য আছে সেখানে। ভেতরে অনেকটা জায়গা। সেখানে চেয়ার পাতা ছিল। কিন্তু কে আর চেয়ারে বসে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে শোভাযাত্রা দেখার জন্য। প্রচুর টেলি ক্যামেরা ফিট করা। ডেইলি মেল এক অভিনব কাণ্ড করল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে টেলিপ্রিন্টার লাইন বসিয়ে দিল। শোভাযাত্রা বেরুনো মাত্র—রিপোর্টার যেমনটি দেখলেন, তেমনটি টাইপ করতে লাগলেন। প্রিন্টার কেবলের মারফতঅফিসে লাইনো মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করা। এখানে টাইপ করা মাত্র ওখানে কম্পোজ হয়ে যাচ্ছে। বাকিংহাম প্যালেস থেকে দশটার কিছু পরে রাজকীয় শোভাযাত্রা বেরুল। সারি সারি ঘোড় সওয়ার। তারপর অসংখ্য মার্সিডিজ বেঞ্জের লাইন। বর বউ গেল আলাদা আলাদা।

বিয়ের পর শোভাযাত্রা ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগল। এইবার আমরা যখন বাড়ি ফিরছি তখন দেখি ডেইলি মেল বিক্রি হচ্ছে। শোভাযাত্রা ও চার্চের ভেতর বিয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও ছবি রয়েছে তাতে।

লন্ডনে থাকার সময় ব্রিগেডিয়ার ক্রশ একদিন আমায় ডেকে বললেন ঃ চ্যাটার্জি, তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে। তোমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি লিখেছে। তোমাকে সিলেকট করে আমরা যেন গুরুতর অন্যায় করেছি।

মনটা ভীষণ দমে গেল। তাহলে হীরেন বসু যা বলেছিলেন তা সত্যি। আমি বহুলোককে জানি যাঁরা সারা জীবন ধরে শুধু ভাল লোকের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সমস্ত মানুষের সাহায্য পেয়েছেন। তাঁদের জীবনের পথ সব সময় কুসুমাস্তীর্ণ। আমি

তাঁদের দলে নই। আমার জীবনে সব সাফল্যই বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এসেছে। যা করতে গিয়েছি তাতে বাধা পেয়েছি। সব কথাই লিখব। লেখার উদ্দেশ্য হল আমার মত অভাজনদের বলা যে ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অটল রব-কবির এই কথাটিকে জীবনের ধ্রুবতারা করে যে বাঁচা যায় আমার জীবন তার প্রমাণ।

আমাকে ওই চিঠির ভিত্তিতে ওঁরা দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারতেন অথবা আমাকে ভৎসনা করতে পারতেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার বললেন ঃ এ নিয়ে মন খারাপ কোর না। সাংবাদিকতা একটা তপস্যার মত। তপস্যায় যে অনেক বাধা আসে তা তোমরা হিন্দুরা জানো।

আমি বললাম, না স্যর, আমি কিছু মনে করিনি।

ব্রিগেডিয়ার বললেন ঃ তুমি হচ্ছ আমাদের মধ্যে ইয়ংগেস্ট। তোমার একটা সুবিধে, এখানে তুমি যা শিখে গেলে দীর্ঘদিন ধরে তা প্রয়োগ করতে পারবে। তবে তোমায় একটা অনুরোধ করি ইয়ংম্যান। সাংবাদিকতা তুমি ছেড় না।

ব্রিগেডিয়ারের এই কথা মনে রেখে আমি ইংলন্ডে চাকরি নিয়ে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। সে সময় চাকরি যথেষ্ট সহজলভ্য ছিল। আমার কাছ থেকে টিপস নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বন্ধু বিলেত গেছে। তারা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এন আর আই। বিদেশে প্রচুর সম্পত্তির মালিক। কারও বা মেমসাহেব বউ। আমি কিন্তু সব সময় মনে রেখেছি আমায় ফিরে যেতেই হবে। কারণ আমার ঐ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ভারতে প্রয়োগের জন্য।

লন্ডনে থাকার সময় আমার হবি ছিল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো। মনীষীদের বাড়িগুলি ঘুরে ঘুরে দেখা। এইভাবে কীটস, ডিকেন্স ও শহর থেকে বেশ দূরে বার্নাড শ-এর বাড়িও দেখে এলাম। টেট গ্যালারিতে পিকাসোর আর্ট এগজিবিশন ও ব্রিস্টলের মঞ্চে ইউজেন ইউনেস্কোর বিখ্যাত গণ্ডার নাটকের অভিনয় দেখলাম। একদিন স্যার লরেন্স অলিভারের হ্যামলেট অভিনয় দেখলাম। অনেকটা সময় কাটাতাম বই এর দোকানগুলিতে। বই-এর দোকানগুলি বিরাট বিরাট। দুতিনতলা জুড়ে। সেখানে গিয়ে ইচ্ছেমত বই দেখা যায়। বই পড়া যায়। যতক্ষণ খুশি থাকা যায়। আমি যখন ইংলন্ডে তখন যুগান্তরের প্রতিনিধি বিশ্বনাথবাবু কলকাতায় ছিলেন। আমি এই সুযোগে লন্ডনের চিঠি লিখতে শুরু করলাম। তখন যুগান্তর আনন্দবাজারের চেয়েও বহুপঠিত কাগজ। দেশ থেকে চিঠি পেলাম আমার লেখাগুলো পাঠকের নজরে পড়ছে।

আমার লন্ডনের চিঠির জন্য মাল-মশলার অভাব ছিল না। এই যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশছি সেগুলিই খবর হচ্ছে।

কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের বাড়িতেই যুগান্তরের অফিস ছিল। আমি যুগান্তর অফিসে কখনও যাইনি। একদিন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কি মিঃ চ্যাটার্জি?

হ্যাঁ।

আমার নাম আঁদ্রে। আমি যুগান্তরে কাজ করি। আপনি এসেছেন তা শুনেছি।

আপনার লেখাও যুগান্তরে বার হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন? আপনি বাংলা পড়েন?

না, কলকাতা থেকে চ্যানেল সুইমার আরতি সাহা এসেছেন। গতকাল তিনি আমাদের অফিসে এসে আপনার খোঁজ করছিলেন। তিনি আপনার লেখা পড়েছেন। আমি বললাম, আমি তো ওকে জানি না। অফিস থেকে আমায় কেউ কিছু বলেওনি। খবর করবো'খন। আরতি আবার আজ আসবেন।

আঁদ্রের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ভদ্রলোক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এক সময় কলকাতা থাকতেন। লন্ডনে বহুবছর আছেন। তিনি আমার উপকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রয়াত আরতি সাহার নাম সবাই জানেন। তিনি চ্যানেল বিজয়িনী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি ও পূর্ব পাকিস্তানের চ্যানেল সাঁতারু ব্রজেন দাস দুজনে এলেন। আরতি বললেন ঃ আপনি লন্ডনের চিঠি লিখছেন। খুব ভাল হচ্ছে। আমার একটা উপকার করতে হবে। এবার আমি আবার চ্যানেল ক্রশ করার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু সি এত রাফ ছিল যে ক্রশ করতে পারিনি। দেশে এ নিয়ে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আপনাকে লিখতে হবে চ্যানেলের অবস্থা এবার এত খারাপ ছিল যে এবার কোন সুইমারই সফল হতে পারেননি।

সাফল্যের একটা দায় আছে সফলকে বার বার সফল হতে হয়। একবারের ব্যর্থতা আগের সব রেকর্ড ম্লান করে দেয়। আমি শুনেছি এজন্য একবার রেকর্ড করার পর অনেকে নাকি আর প্রতিযোগিতায় নামতে ভয় পান। নিজের রেকর্ডকে নিজে যদি অতিক্রম করতে না পারেন। এমন হয় একজন লেখকের একটি বই বেস্ট সেলার হল। পরের বই ফ্লপ করল। অনেক অভিনেতার জীবনেও এমন নজির। অ্যাথলেট থামতে পারেন। কিন্তু লেখক শিল্পীদের কাছে থেমে থাকা মানেই মৃত্যু। আর চলা মানেই এগিয়ে চলা। প্রতিনিয়ত পিছনের পথকে অতিক্রম করে যাওয়া। বিশ্রাম নেওয়া মানেই মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়া। আরতি সাহার সমস্যাটা আমি ভালই বুঝতে পারলাম। শুধু তাঁকে নিয়েই পরের বারের লন্ডনের চিঠি লিখলাম।

নেহরুর সঙ্গে আলাপ

আঁদ্রে আমাকে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সেটি আমার লন্ডন প্রবাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কমনওয়েলথ কনফারেন্স উপলক্ষে নেহরু লন্ডন এসেছিলেন। সে সময় হাইকমিশনার বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নেহরু সম্মানে একটি পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতে ভারতীয় সাংবাদিকরা সবাই আমন্ত্রিত। আমি তো আর লন্ডন সংবাদদাতা নই। কিন্তু আঁদ্রে কী করে আমন্ত্রিতদের তালিকায় আমার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছিল তা কে জানে। কলকাতা থেকে যে গলাবন্ধ কোটটি নিয়ে এসেছিলাম সেটি কাজে লেগে গেল। এই কোট পরেই আমি নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমার গলাবন্ধ কোটটার খরচ সেদিন রাতেই উঠে গেল।

রিসেপশনে গিয়ে দেখি একজন কর্মী প্রত্যেক অতিথির কার্ড হাতে নিয়ে তাঁর নাম ঘোষণা করছেন। যাঁকে শোনানোর জন্য এই ঘোষণা, তাকিয়ে দেখি তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নেহরু।

আমি নেহরুকে অনেক দিন পরে আবার দেখলাম। তিনি একটি কালো শেরোয়ানি পরে ছিলেন। মাথায় ধবধবে শাদা টুপি। পরনে শাদা চোস্ত। পায়ে নাগরা। আঁদ্রে স্মার্ট সাংবাদিকের মত এগিয়ে গেল।

নেহরু তাকে চিনতে পেরে মৃদু হাসলেন।

ভাল আছেন পণ্ডিতজী।

হ্যাঁ, তোমার সব খবর ভাল তো? নেহেরু হাসলেন।

হ্যাঁ।

আঁদ্রে এবার আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন নেহেরুর।

পণ্ডিতজী। এই ছেলেটি আমাদের কাগজের সাংবাদিক। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে সদ্য এদেশে এসেছে।

নেহরু হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের করস্পর্শে আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

নেহরু বললেন ঃ তোমার নাম কী?

নাম বললাম।

তোমার বয়স কত? দেখে মনে হচ্ছে খুব ইয়ং।

আমি বললাম ঃ বাইশ বছর।

নেহরু বললেন ঃ ভাল করে কাজ শেখো। ইন্ডিয়া নিডস ট্রেইন্ড জার্নালিস্ট লাইক ইয়্যু। দে হ্যাভ গ্রেট রোল টু প্লে।

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় বিজয়লক্ষ্মী এক্সকিউজ মি বলে আমাদের কথার মাঝখানে নেহরুকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঘানার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করাতে।

সেই পার্টিতে ব্রিটেনের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। সকলের হাতে গ্লাস। প্রায় হাজার খানেক লোক জড় হয়েছে। একদিকে ব্যান্ড বাজছে। ব্যস্ত ওয়েটাররা পানীয় আর খাদ্যের থালা নিয়ে ছুটোছুটি করছে। লন্ডনে এসে প্রায়ই এমন পার্টিতে নেমন্তন্ন হচ্ছে। আমি ততদিনে ককটেল কালচারে রপ্ত হয়ে গেছি। শুধু তাই নয় ছোট পানপাত্রে ভরা শেরির গেলাসে চুমুক দিতেও শিখে গেছি। হুইস্কি রাম পর্যন্ত উঠতে সাহস হয়নি। শেরিতে শুনেছিলাম অ্যালকহলের পরিমাণ কম। খেতে যদিও সুস্বাদু লাগল না। আরও একটি কারণে আমি শেরি ও ব্র্যান্ডি পানে আপত্তি জানাতাম না। আমাকে কে যেন বলেছিল এই দুটি ড্রিঙ্কস পরিমিত মাত্রায় পান করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আমি তখনও পর্যন্ত খুব রোগা।

আমার প্রথম প্রবাস আমাকে আর কিছু না দিক নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করছিল। অপুষ্টিজনিত কৃশতা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে ওজন বাড়তে শুরু করেছিল।

সেটি হয়তো নিয়মিত ব্র্যান্ডি ও শেরি সেবনের ফলে।

ওই ককটেল পার্টিতে নিউ স্টেটসম্যানের সম্পাদক কিংসলে মার্টিনের সঙ্গে আঁদ্রে পরিচয় করিয়ে দিল। মার্টিন একজন ভারত দরদী। তিনি বললেন ঃ ইন্ডিয়ায় উন্নতির স্টামবলিং ব্লক হল তোমাদের জাতপাত।

কিংসলে মার্টিন ঠিক কথাই বলেছিলেন।

একেই বলে খোদা যব দেতা ছপ্পড় ফুড়কে দেতা। একজন সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা আর আমিতো গত এক মাসে লন্ডনের নাড়ী-নক্ষত্র শুধু নয় এতসব কিছু দেখলাম যা অনেক প্রভাবশালী ইংরেজের পক্ষেও দেখা সম্ভব নয়।

পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে এম পিদের সঙ্গে একদিন লাঞ্চ খাওয়া হল। সেইদিনই পার্লামেন্ট অধিবেশনে দর্শকের গ্যালারি থেকে কিংবদন্তীর নায়ক স্যর উইনস্টিন চার্চিলকে দেখলাম এম পির আসনে বসে ঝিমোচ্ছেন। বয়সের ভারে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে সাধারণ এম পি হিসেবেই পার্লামেন্টে আসছেন, যাচ্ছেন, ভাতা পাচ্ছেন।

তাঁর এই অবস্থা দেখে মনে হল একজন রাজনীতিক যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকেন ততক্ষণই তাঁর কদর। ক্ষমতা চলে গেলে স্ট্যাচু হয়ে থাকাই সবচেয়ে সম্মানের। বেঁচে থাকাটা অসম্মানের। ঠিক সময় মত মৃত্যুটাও সাফল্যেরই একটা অংশ। অবশ্য চার্চিল যে অবহেলিত তা নয়। কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁকে নিয়ে আর কেউ আলোচনা করে না। তিনি মিউজিয়ম পিস হয়ে পার্লামেন্টের শোভা বর্ধন করছেন এটা কী ভাবা যায়।

লন্ডনে যা যা দেখলাম তা সাধারণ পর্যটক হিসেবে এলে লাখ টাকাতেও দেখা যেত না। একদিন কভেন্ট গার্ডেনে রয়্যাল অপেরা হাউসে গিয়ে ব্যালে দেখা হল। আমার সেই প্রথম ব্যালে দেখা। এই ব্যালেটি মস্কোর বলসই থিয়েটারে ১৮৭৭ সালে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। ১৯৩২ সাল থেকে এটি লন্ডনে হচ্ছে। ব্যালেতে নৃত্যশিল্পীদের মত সমান গুরুত্ব অর্কেস্ট্রার। এই ব্যালেতে মোট ১০১ জন অর্কেস্ট্রা বাদক ছিল।

এই অপেরা হলের মাধ্যমে ইওরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। গোটা ইওরোপই অপেরা পাগল। আর অপেরা হাউসগুলি সুন্দরভাবে সাজানো। আগাগোড়া লাল কার্পেটে মোড়া।

বিখ্যাত মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবে (এম সি সি) গিয়ে দেখলাম সেই বিখ্যাত মৃত চড়ুই পাখিটাকে। ১৯৩৬ সালে কেমব্রিজ বনাম ইংলণ্ডের খেলায় জাহাঙ্গীর খানের ব্যাটে একটি উড়ন্ত চড়ুই নিহত হয়। সেই নিহত ক্রৌঞ্চটি (?) সুন্দরভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেখাটা শুধু দেখা নয় আলোচনা, জিজ্ঞাসাবাদেরও প্রচুর সুযোগ ছিল। যাদের সঙ্গে কথা বলছি তাঁরা হয়তো কেউ লেবর বা কনজারভেটিভ দলের নেতা, কেউ ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের পদস্থ অফিসার। কেউ ওপরের দিকের সরকারি আমলা। কেউ বিচারক। কেউ বুদ্ধিজীবী।

এই সব দেশভক্ত ইংরেজদের মধ্যে একটা সাধারণ মিল হল তাঁদের অনেকেই মনে করেন, ব্রিটিশ ভারত অধিকার করে ঠিকই করেছিল। আবার গান্ধী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করে ভারতীয় হিসেবে ঠিকই করেছেন। আর ইংরেজরাও ঠিক সময়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে আসায় ঠিক কাজই হয়েছে।

ইংরেজদের নীতিবোধ খুব প্রখর। তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা বিচার করে। যেমন ল সোসাইটির এক ককটেলে আমাকে এক আইনজ্ঞ বললেন : যদি ব্রিটিশরা ভারত অধিকার না করতো তাহলে আর কেউ করত।

একথাটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইংরেজরা একাই তো ভারত দখল করেনি— ফরাসিরা, পর্তুগিজরা, দিনেমাররাও করেছে। তফাটা হল, তাদের ইংরেজদের মত ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল না। তাই বুদ্ধির খেলায় ইংরেজরা জিতেছে। বাকীদের হঠিয়ে ইংরেজরা ভারতকে কবজা করেছে।

তবে এত লোকের সঙ্গে প্রতিদিন বকর বকর করা আমার একঘেয়ে লাগত। তার চেয়ে আমার ভাল লাগত লন্ডনের পথে পথে একা একা ঘুরতে। নির্জনে নয়, জনারণ্যে একা। আমি এজন্য পিকাডালি পাঁচ মাথার মোড়ে ডায়না দেবীর মূর্তির নীচে বসে থাকতাম। তীর-ধনক ছোঁড়ার ভংগিমায় পরী মূর্তি। তার নিচে মাছের মুখ দিয়ে পড়ছে ফোয়ারার জল।

একদিকে মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক, অন্যদিকে লন্ডন প্যাভেলিয়ন, আর একদিকে ক্রিটেরিয়ান থিয়েটার, প্লাজা সিনেমা, এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস। পাগড়ি বাঁধা মহারাজা মাথা নাড়ছেন। কখনও গিয়ে বসতাম ট্রাফলগার স্কোয়ারে। সেখানে বিশাল সান-বাঁধানো চত্বরে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রারা বেড়াচ্ছে।

কখনও হেঁটে যেতাম রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে। বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স ঢুকে দেখতাম কোন জিনিসের কত দাম। কখনও এসে বসতাম টেমস নদীর ধারে। ওয়েস্ট মিনিস্টারের পাশে পার্লামেন্ট স্কোয়ার। সেখানে অসংখ্য ফোটা ফুলের পাশ দিয়ে হাঁটছি। হোয়াইটহল ধরে সেন্ট জেমস পার্কের দিকে যাচ্ছি কখনও। যাবার পথে চোখে পড় ১০, ডাউনিং স্ট্রিট। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি। বাড়ির সামনে কোন ব্যস্ততা নেই। শুধু গেটে দুজন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে।

ইংলন্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ ধারণা চোখে পড়ল না। অনেকের ধারণা ভারতীয়রা 'ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' বলে কোন ভাষায় কথা বলে অথবা সকলের ভাষাই হিন্দি।

এর মধ্যে একজন বাংলা জানা ইংরাজের সঙ্গে আলাপ হল কমনওয়েলথ রিলেশনস বিভাগের পার্টিতে।

ভদ্রলোকের নাম টমসন। জন্ম কলকাতায়। থাকতেন আলিপুরে। বই-এর ব্যবসা ছিল। স্বাধীনতার পরেও কিছুকাল ভারতে ছিলেন। তবে কলকাতায় থাকলেই যে বাংলা শিখতে হবে তার কি মানে আছে? তিনি বললেন, তিনি বাংলা শেখার প্রয়োজন অনুভব করেন এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে।

একবার কলকাতা থেকে মোটরে করে যাচ্ছিলেন হাজারিবাগ। বৈদ্যবাটিতে গিয়ে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। গভীর রাত। এমন সময় কিছু বাঙালি ছাত্রের সন্ধান মিলল। কিন্তু তারা ইংরাজি বোঝে না। টমসনও তখন বাংলা শেখেননি।

অবশেষে আকারে ইঙ্গিতে বোঝালেন তিনি বিপদে পড়েছেন, আশ্রয় চান।

ছাত্ররা তাঁকে আশ্রয় দিল তাদের বাড়িতে। খাওয়াল দাওয়াল, শুতে দিল। শুয়ে শুয়ে টমসন প্রতিজ্ঞা করলেন, কাল থেকেই তিনি বাংলা শিখতে শুরু করবেন।

টমসন আমাকে যে কার্ড দিয়েছিলেন তাতে তাঁর পরিচয় ছিল আণ্ডার সেক্রেটারি। আমি জানলাম। পদমর্যাদায় তিনি এখন একজন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী।

লন্ডনে থাকতে মিসেস ফ্রিগার্ড একদিন আমাদের তাঁর দেশের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। লন্ডন থেকে ২৫ মাইল দূরে এক ছায়া ঘেরা গ্রামে তাঁব বাড়ি।

প্যাডিংটন স্টেশন থেকে আমরা লোক্যাল ট্রেনে উঠলাম। রবিবার ট্রেন ভাড়া শস্তা। রিটার্ন টিকিট কাটলে আরও শস্তা।

মিসেস ফ্রিগার্ডের গ্রামের নাম হর্সলে। ইংলন্ডে গ্রাম বলতে বোঝায় সবুজ আর সবুজ। তাছাড়া শহরের সব স্বাচ্ছন্দ্যই আছে। টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, দোকান পাট, বাজার। যেটা নেই সেটা পানাপুকুর, মশা, ধুলো কাদা আর অবিন্যস্ত জঙ্গল। গ্রামে বেওয়ারিশ বড় হয়ে ওঠা ঝোপঝাড় নেই। খালি জমি যেখানে যা আছে সেখানে যে গাছপালা তা সুন্দরভাবে ছাঁটা। আগাছা বলে কোন পদার্থ নেই। আর সবুজ ঘাস এমনভাবে বিছনো যে মনে হবে কে কার্পেট পেতে রেখেছে সারা গ্রাম জুড়ে।

মিসেস ফ্রিগার্ড বললেন : আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?

আমরা সমস্বরে বললাম : একদম না। আজ রবিবার ট্রেন ফাঁকাই ছিল।

আমি বললাম : আপনি কি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন?

মিসেস ফ্রিগার্ড বললেন :না, আমার লন্ডনে বাড়ি আছে। আমরা উইক এণ্ডে আসি। এখানে বাগান করি। ইউরোপের মানুষের প্রবণতা হল, শহরে একটা বাড়ি আর গ্রামে একটা বাড়ি। গ্রামের বাড়ি মানে প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীর টান অনুভব করে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাওয়া।

ফ্রিগার্ড দেখালেন, তাঁর আপেল গাছ। থরে থরে আপেল হয়ে রয়েছে। আর অজস্র ফুল গাছ। ফুল ফোটাবার টানে এই দম্পতি চলে আসেন। যখন চাকরি থেকে অবসর নেবেন, তখন নাতি নাতনি তো আর থাকবে না, এরাই হবে তাঁদের অবলম্বন, বার্ধক্যের বারাণসী।

ফ্রিগার্ড বললেন : দেখতে দেখতে তোমাদের একমাস কেটে গেল তাই-না?

হঠাৎ খেয়াল হল। হ্যাঁ সত্যিই তো একমাস কোথা থেকে কেটে গেছে। এই তো আগামী কালই আমার কার্ডিফ যাওয়ার কথা।

পেনিলাল প্লেস

লন্ডনের পোগ্রাম শেষ হবার পর আমাদের ট্রেনিং পোগ্রাম শুরু হল। দু মাস

করে এক একটি কাগজে থেকে কাজ শিখতে হবে।

এসে পৌঁছলাম ওয়েলসের কার্ডিফ শহরে।

আমার ভাগ্যে পড়ল ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ। সেখানে ওয়েস্টার্ন মেল ও সাউথ ওয়েলস ইকো কাগজে আমাকে কাজ করতে হবে। এই দুটো কাগজই টমসন গ্রুপের।

এবার আমি একা। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলাম। ট্রেন বেশ আরামপ্রদ। আমাদের ফার্স্টক্লাসের মতই ওদের সেকেন্ড ক্লাস। টিকিট ওরাই কেটে দিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে কার্ডিফ ছ' ঘণ্টার মত পথ।

কার্ডিফ স্টেশনে এক মহিলা আমায় নিতে এসেছিলেন। তিনি আমায় শহরের এক প্রান্তে ১৫ নং পেনিলান প্লেসে এক পোলিশ দম্পতির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পোলিশ ল্যান্ডলেডি মিসেস কিমনিস্কির পেইং গেস্ট হয়ে আমি দু মাস থাকব। ভদ্রমহিলা বলে গেলেন, কাল থেকে আমি যেন কাগজের অফিসে জয়েন করি।

মিঃ কিমনিস্কি পেশায় ড্রাইভার। তাঁর বউ সংসার সামলাতেন। আমি ছাড়া বাড়িতে আরও দুজন গেস্ট ছিল। একজন ভারতীর ছাত্র আর একজন মিশরি যুবক। মিশরি যুবকের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সে নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দিত। মিসেস কিমনিস্কি আমায় বললেন, তুমিও জার্নালিস্ট নাকি? তাহলে আর একজন লায়ার এল। অল জার্নালিস্টস আর লায়ার। আমি ইজিপ্সিয়ান ছোকরাকে লায়ার বলে ডাকি।

আরব ছেলেটিকে আমি রাগিয়ে দিতাম ইস্রায়েলের কথা তুলে। আমি ইস্রায়েলের খুব প্রশংসা করতাম আর সে ভীষণভাবে রেগে যেত। পারলে ইহুদিদের খেয়ে ফেলে। পাকিস্তানের সঙ্গে এত ঝগড়া সত্ত্বেও আমি ও ফারুকি এক ঘরে একমাস কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আরব ও ইহুদিদের কাছে এটি অসম্ভব ঘটনা। দুজনের একজনই বাঁচবে।

পেনিলান প্লেসের বাড়িটি ছিল নিরিবিলি। বাড়ির পাশ দিয়ে রেল লাইন সেখান দিয়ে মাঝে মাঝে মালগাড়ি যেত।

বাড়ির সামনে একটা বিরাট খেলার মাঠ। মাঠের কোনা থেকে বাসে চাপতে হত। মিনিট দশেকের মধ্যেই অফিস পৌঁছন যেত। কুইনস স্টিটে ওয়েস্টার্ন মেলের বিরাট অফিস। সান্ধ্য দৈনিক সাউথ ওয়েলস ইকোও ওই অফিস থেকে বেরোয়। ওয়েস্টার্ন মেল কাগজে আমাকে বিট রিপোর্টারদের সঙ্গে কভারেজে পাঠানো হত। ট্রেভর কার্টিজ বলে আমারই বয়সী এক রিপোর্টারের সঙ্গে আমি বিভিন্ন জায়গায় যেতে শুরু করলাম। আঞ্চলিক কাগজে সবচেয়ে বড় বিট সিটি হল। অর্থাৎ পুরসভা। একদিন মেয়র সাহেবার সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এক মহিলা। ইংলন্ডে মেয়রকে লর্ড মেয়র বলা হয়। শহরের মধ্যে তাঁর গভর্নরের মতই খাতির।

ওয়েস্টার্ন মেল অফিসে টমসন স্কুল অব জার্নালিজম নামে সাংবাদিকতার একটি স্কুল ছিল। এটি নিজস্ব সংবাদদাতাদের ট্রেনিং দেবার জন্য। আমাকে হাতে-কলমে কাজের সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কুলে ক্লাস করতে হত। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক ক্লাস

নিতেন। প্রথম দিনই বলেছিলেন ঃ মানি, ফুড আর উওমেন এই ত্রিশক্তি নিয়েই খবরের কাগজের যাবতীয় খবর। সুতরাং যেখানে যা কিছু দেখবে যদি এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে বুঝবে উপাদেয় খবর একেই বলে।

তাঁর এই প্রথম পাঠ আমি আজীবন মনে রেখেছি।

কার্ডিফে থাকার সময় প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানে একদিন কার্ডিফে এলেন। আমি ও ট্রেভর কার্টিজ সিটি হলে তাঁর অনুষ্ঠান কভার করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ওয়েলশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি পলিড কিমরুর পঁচিশ ত্রিশ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রীকে বিক্ষোভ দেখাতে বলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে—প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা ঃ গো-ব্যাক ম্যাকমিলন। ওয়েলস ইজ নট ইওর কলোনি।

ট্রেভর আমায় বলল ঃ তুমি বাইরে থাকো ভেতরে প্রাইম মিনিস্টারের বক্তৃতা আছে। আমি সেটা কভার করবো।

ম্যাকমিলান একটু পরে এলেন। বিক্ষোভকারীদের পুলিশ দিয়ে ব্যারিকেড করে রাখা হল। তারা মুখে একটি কথাও বলল না ঃ শুধু পোস্টারগুলি দোলাতে লাগল।

লন্ডনে যে কদিন ছিলাম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কেটে যেত। কার্ডিফে পেনিলান প্লেসের বাড়িতে সন্ধ্যার পর বেশ একা একা লাগত। তখন চিঠি নিয়ে বসতাম। লণ্ডনের চিঠি লেখাটা বহাল রেখেছিলাম। ব্যক্তিগত চিঠিও প্রচুব লিখতাম। চিঠি লেখার অভ্যাস স্কুল জীবন থেকে ছিল। ক্লাস সিক্স সেভেন থেকেই আমার নামে চিঠি আসত। চিঠি পেতে আমি খুব ভালবাসতাম। আর এটা বুঝতাম যে চিঠি না লিখলে চিঠি পাওয়া যায় না। যেমন ভাল না বাসলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। ঊষাপ্রসন্ন, ভবানী, সবিতৃ, কলকাতার ছোট বউদি সবাইকে চিঠি লিখতাম। সে সময় সবুজসাথী রমেন দাস, কবি মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার সখ্যতা ছিল। তাঁরা আমায় চিঠি লিখতেন। আমিও পত্রপাঠ উত্তর দিতাম।

মোনালিসাকে চিঠি লেখার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর থেকে আমি তাকে আর চিঠি লিখিনি। এমনকী চিঠি লেখার মত কোন বান্ধবী বা প্রেমিকা আমার ছিল না।

কার্ডিফে দুমাস থাকার ফলে অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে ভারতীয় ও পাকিস্তানি ছাত্রদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। এর মধ্যে একজন ছিল মিঃ দাস। সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে এসেছিল। কুইন স্ট্রিটে ওয়েস্টার্ন মেলের অফিসের কাছেই ছিল ব্রিটিশ কাউন্সিল। আমি গিয়েই মেম্বর হয়ে গিয়েছিলাম। লাইব্রেরি থেকে বইপত্তর নিতাম। তাছাড়া সব বিদেশী ছাত্রছাত্রী ওখানে বিকেলে আসত। ওখানেই আলাপ হয় মিঃ দাসের সঙ্গে। আমার প্রথম উপন্যাস দূরের আকাশ কার্ডিফের এই ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে লেখা।

দাসকে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা বলতেই সে বলত, তাহলে আমার গার্লটাকে নিয়ে আসি। সে কথাটা এমনভাবে বলত যে মনে হত যেন বলছে আমার ছাতাটা বা ছড়িটা নিয়ে আসি। আসলে বিলেতে একজন তরুণ বা তরুণী উইক এন্ডে একা

একা বেড়াতে যাচ্ছে দেখলে সবাই ভাবতে বসত এর নিশ্চয় কিছুটা গোলমাল আছে।

আমি, দাস ও দাসের গার্ল বা গার্ল ফ্রেন্ড অনেক উইক এন্ড কাছের সমুদ্র সৈকত সোয়ানসিতে কাটিয়েছি। দাস বলতো চ্যাটার্জি, এটা খুব ব্যাড, তোমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই।

আমি বলতাম, কী আর করা যাবে। এটা আমার দুর্ভাগ্য।

দাস আমাকে একদিন সিটি হলে এক নাচের আসরে নিয়ে গেল। বলল ঃ এইসব নাচেব আসরেই—ছেলে-মেয়েরা বন্ধু খুঁজে নেয়। এখানেও সপ্তপদী। সাত পা এক সঙ্গে নাচলেই বন্ধু হয়।

কিন্তু আমি যে নাচতে জানি না। আমি দাসের উৎসাহে জল ঢেলে দিলাম।

দাস আমাকে উৎসাহিত করার জন্য বলল ঃ তুমি ইন্ডিয়া থেকে নাচ শিখে আসোনি? আমি তো আসার আগে তিনমাস নাচের তালিম নিয়েছি।

আমি বললাম ঃ আসার আগে টাইপ রাইটিং শর্টহ্যান্ড শিখবো বলে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেটিই শিখতে পারলাম না, তা নাচ।

একটি সুন্দরী জার্মান মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাস তাকে চেনে। তাকে বলল ঃ আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে একটু নাচবে ফ্রাউলিন। মেয়েটি বলল ঃ কই উনি তো কিছু বলছেন না। নাচের নিয়ম নাকি ছেলেই মেয়েকে অনুরোধ করে বলবে আমি কি আপনাব সঙ্গে নাচতে পারি ম্যাডাম। প্রটোকল ভঙ্গ করায় ফ্রাউলিন রেগে গেল। অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে আমাব বলতে হল ঃ মে আই হ্যাভ ইওর ড্যান্স প্লিজ। মেয়েটি আমার হাত ধরে নিয়ে গেল ফ্লোরে।

ব্যান্ড বেজে উঠলেই সে তার ডানহাতটা এগিয়ে দিল। ফ্রক স্টার্ট নাচ হবে। তারই বাজনা বাজবে। আমি ডানহাত দিয়ে তার কোমর ধরলাম কিন্তু নাচের আসল হল স্টেপ। অর্থাৎ কোন পা এগুবে কোন পা পিছবে। আমার অনবরত তালভঙ্গ হল। ইন্দ্রসভা হলে আমায় অভিশাপে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হত। বিলেত দেশটিও স্বর্গ। মাটির স্বর্গ। আমি অচিরেই স্বর্গ অর্থাৎ ড্যান্সিং ফ্লোর থেকে নির্বাসন নিলাম।

জার্মান-তনয়া তখন হাসি চাপতে পারছে না।

ব্রিটিশ কাউন্সিলে আমার একটি গ্রিক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। নাম ঃ পেনিলপি। কার্ডিফে আমার বড় প্রাপ্তি পেনিলপির সঙ্গে বন্ধুত্ব। যা আজ ৪০ বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, আমি সবশুদ্ধ তিনবার এথেন্সে গিয়েছি। এর মধ্যে দুবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। মেয়েটি যে এত দুঃখী তা সে সময় বুঝতে পারিনি। তখন তার বয়স কুড়ি-একুশ। কার্ডিফে এসেছে ইংরাজি শিখতে। ভীষণ হাসিখুশি। তখন সে প্রেম করছে এক ইংরেজ যুবকের সঙ্গে। সে পরে তাকে বিয়ে করে এবং বছরখানেকের মধ্যেই ডিভোর্স হয়।

পৃথিবীর সব মেয়ে যেমন হয়, সেও কখনও কঠোর বাস্তববাদী, কখনও খেয়ালি। কখনও উদার, কখনও সংকীর্ণমনা। এককথায় নানা বৈপিরীত্য নিয়েই তৈরি হয় মেয়েরা।

পেনিলপির সঙ্গে কার্ডিফে আমার খুব বেশি কথা হয়নি। একান্তে তো একবারেই নয়। আমি শুধু বলেছিলাম, এদেশ থেকে ফেরার পথে একবার এথেন্সে যাবার ইচ্ছা আছে।

পেনিলপি বলেছিল ঃ কবে যাবে?

আমি বলেছিলাম ঃ ডিসেম্বরে।

পেনিলপি বলেছিল, আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোর। এই আমার ঠিকানা। এই আমার ফোন নম্বর।

লন্ডনে থাকতে বেশিরভাগ দিনই দুপুরে লাঞ্চ থাকত আর রাতের খাবারটা ফারুকিই করে দিত। কার্ডিফে আমি ব্রেকফাস্ট করে বেরুতাম। রাতে ফিরে ডিনার খেতাম। এক একদিন ল্যান্ডলেডি মিসেস কিমিনিস্কি সারাদিনের খাটাখাটনির শেষে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

একটু আগে বাড়ি ফিরলে দেখতাম মিসেস কিমিনিস্কি ঘুমোচ্ছেন। একটু চা পেলে ভাল লাগত ওই সময়টা। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে জাগাতে ইচ্ছা হত না।

অতবড় একটা বাড়ি ফিটফাট রেখে, তিন তিনজন ভিনদেশি গেস্টকে খাইয়ে, দুটি স্কুলে পড়া ছেলে আর স্বামীকে ম্যানেজ করে ভদ্রমহিলা বেশ হাঁফিয়ে যেতেন। এমন দেশ যে ঝি-চাকর পাওয়া যায় না আবার পেলেও এমন দাম হাঁকবে যে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। দুপুরের লাঞ্চটা কুইনস স্ট্রিটে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাড়ায় এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টে সেরে নিতাম। দুপুরে এখানে তেমন ভিড় হত না। কাজেই নিরিবিলি ছিল জায়গাটা। আর ওয়েটার রহমানের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ইংলন্ডে ভারতীয় রেস্টুরেন্টগুলি অধিকাংশই সিলেটি মুসলমানদের। সিলেটি মুসলমানেরা ভীষণ উদ্যোগী পুরুষ সিংহ। এরা একটা সময় জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এক একটা পছন্দসই শহর বেছে নিয়ে সেটল করে যায়। সেখানে তারা সিলেটিদের রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের চাকরি নেয়। তারপর কঠোর পরিশ্রম করে টাকা জমিয়ে নিজেরাই এক একটা রেস্টুরেন্ট খুলে বসে। দেশ থেকে ভাই-বেরাদরদের নিয়ে আসে।

ইংরেজদের ভারতীয় খাবারের প্রতি একটা ঝোঁক আছে। আমাদের যেমন চীনা খাবারের প্রতি আকর্ষণ।

রহমানের সঙ্গে আমার নানা বিষয়ে গল্প হত। আমরা বাংলায় কথাবার্তা বলতাম। রহমানের সিলেটি বাংলা আমার বুঝতে একটু অসুবিধে হত। তবু ইংরাজির চেয়ে তো সোজা। সিলটে ছেলেরা একটা বয়সে সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান শুনতে পায়। সমুদ্র তাদের হাতছানি দেয়। কী যে হয়, প্রতি বছর দলে দলে তারা বিদেশে পাড়ি দেয়। অনেকে বিয়ে থা করে। বউ এর ওপর সিলেটের ভূ সম্পত্তি দেখার ভার দিয়ে ইংলন্ডে চলে যায়। সেখানে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা মেমসাহেব বিয়ে করে বা তার সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেয়। এক বছর দুবছর

অন্তর দামী স্যুট পরে হাতে টেপ ডেক, রেডিও, ইলেকট্রনিক্সের নানা সরঞ্জাম নিয়ে সিলেটের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। দু -একমাস থাকে। বউকে আর একটি সন্তান উপহার দেয়। ভূসম্পত্তি বাড়িয়ে, বাড়ি-ঘর তৈরি করে আবার ফিরে যায়।

রহমান এই কিছুদিন আগে দেশ থেকে ফিরেছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ওয়াছেল মোল্লার কয়েক প্যাকেট বিড়ি। আর আটটি হিন্দি গানের রেকর্ড।

যখন মন খারাপ হয়, দেশের কথা বার বার মনে পড়ে তখন একটা বিড়ি ধরিয়ে রেকর্ড শোনে রহমান। তার বাড়ি করিমগঞ্জ মহকুমায়। (এখন সেটা ভারতে পড়েছে) ছেড়ে আসা সবুজ গ্রামের কথা ভুলতে পারে না রহমান।

যখন ও গান বাজাত সে সময় একটি ওয়েলস মেয়ে এসে শুনত গান। মেয়েটির নাকি খুব ভাল লাগে হিন্দি গান শুনতে।

মেয়েটির নাম ডরোথি। তার সঙ্গে গানের সূত্র ধরেই রহমানের পরিচয় আর পরিচয় থেকে প্রেম।

রহমান আমাকে তার গল্প শোনাত। সেটি রহমানের ভাষাতেই বলি।

ডরোথি আমারে একদিন কইল, তুমি আমারে ভালা পাওনি?

আমি ঠিক আশা করছিলাম না সিদা এই কথাডা সে আমারে জিগাইবে।

আমি কইলাম মাদাম, অয়াছেল মাদাম, তুমি আমার খরিদ্দার— তোমারে ভালা পাইতাম না কেনে?

ডিরোথি কসল, না। কথা অ্যাড়াইতে পারবা না। আমারে তুমি ভাল পাও কিনা কও। আমিতো কোন মতে ওরে ভাগাইলাম। আসলে আমি ডরাই ছাহেব ক্যানে কইঞাই?

আমি বললাম ঃ কেন, কোন শাদা মেয়ে যদি প্রেম নিবেদন করে তোমার ক্ষতি কী? এই রকম বেরসিক কেন তুমি?

রহমান আমার স্যুপের প্লেটটা নিয়ে গিয়ে বলল ঃ আইল্যাম।

কিছুক্ষণ পরে আমার প্রিয় ডিস রোস্টেড ল্যাম্ব আর আলুভাজা নিয়ে এসে বলল ঃ এ রেস্টুরেন্ট তো আমার লায় (নয়)। আমার চাচার। চাচা আবার খরিদ্দারের লগে প্রেম উম ভালা পাইল না। কইল বহুত মাইয়া আইব। তারার লগে প্রেম করতায় পারতায় নায়। রেস্টুরেন্টের বদনাম অইব।

চাচা এক ম্যাম সাহেবের লগে থাকইন। দ্যাখছইননি।

হ্যাঁ, এক মোটা মত মেম সাহেব।

অয়, অয়। ঠিকই দেখছইন। আমি তারে সব কইলাম। হে আবার চাচারে কয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে চাচার ওয়ার্নিং ঃ যা মানা করছিলাম ওটাই করালাই। ডুবিয়া ডুবিয়া পানি খাও ছোকরা।

আমি একেবারে বেকুব হই গেলাম গিয়া।

তারপরেও ডরোথি একদিন আইছে। আইয়া চাচার মাইয়ালোকের সামনে পড়ছে।

ডরোথি জিগাইল রহমান আছেনি?

তারে দিয়া তুমি কিটা করতা?

আবার আর একদিন মেমসাহেবের বেটি দ্যাখলে পাও ভাঙ্গি দিমু।

ডরোথি কোন কথা না মাতিয়া গেল গিয়া। তারপর একদিন আইল দুপুর বেলায়। আমার হাত ধরিয়া কইল আমারে নাও তুমি। তুমি ছাড়া আমি বাঁচতাম নায়।

আমি মনে করলাম মেয়েডা ভালাপায়। কিন্তু আমি কোন সময়ও ভরসা পাইতাম না। টাকা না জমাইয়া, নিজের রেস্টুরেন্ট আরম্ভ না করিয়া আমি আর কারও লগে জড়াইতাম না।

আমি বললাম ঃ ডরোথি এখন কোথায়?

রহমান বলল ঃ এই ঘটনার পর আর আইছেন না।

কার্ডিফে যতদিন ছিলাম ডরোথি আর রহমানের কাছে আসেনি।

সত্যি কথা বলতে কী, কার্ডিফের মত এত সুন্দর শহর আমি গোটা ব্রিটেনে আর দেখিনি।

শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটেনের সবচেয়ে সুন্দর শহর কারডিফ। অথচ ১৪০ বছর আগে এই ওয়েলস ছিল দুর্গম এবং অনুন্নত। ওয়েলসের কয়লাখনি থেকে কয়লা তুলে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ইংলন্ডে চালান দেওয়া হত। চার ঘোড়ার গাড়ি করে যেত লোহা। ১৭৯৮ সালে এই কয়লা ও লোহা পরিবহনের জন্য খাল কাটা হয়। ১৮৪১ সালে তৈরি হয় রেলপথ।

ওয়েলসের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তা শুধু বিক্ষোভ দেখে নয়, ওয়েলসের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেই বোঝা যায়।

সেদিন ল্যান্ডাট টেকনিক্যাল কলেজে একটি মিটিঙ কভার করতে গিয়ে একজন ওয়েলস সাংবাদিক অ্যালান টিপসারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বিবিসির কার্ডিফ সংবাদদাতা।

আমায় বললে : আপনি ওয়েস্টার্ন মেল এ আছেন। এই দেখুন, আপনাদের কাগজ লিখছে, ওয়েলসের ন্যাশনাল ডেইলি। অথচ মাত্র শতকরা দুজন এখন ওয়েলস ভাষায় কথা বলে। ভাষার মধ্য দিয়েই তো জাত বেঁচে থাকে। তাহলে ওয়েলস জাত এখন কোথায়?

আমি বললাম : আমি এখানে যাকেই জিজ্ঞাসা করি সে বলে ওয়েলস জানি না। লিখতে তো পারেই না, বলতেও নয়। অথচ দু পুরুষ আগে সবাই ওয়েলস বলত। ইংরাজি এসে ওয়েলসকে হটিয়ে দিয়েছে। হয়তো ইন্ডিয়াতেও এমন দিন আসবে।

টিপলার বললেন : এর সমাধান হল সেলফ গভর্মেন্ট। তবেই আমাদের ভাষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে।

ওয়েলস ভাষার প্রভাব এখনও উত্তরে গেলে তবু কিছুটা দেখতে পাবেন। কিন্তু দক্ষিণে এর ছিটেফোঁটাও নেই। এমনকী অনেকে উচ্চারণও ইংরেজদের মত নিখুঁত করে নিয়েছেন।

এটা হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু তবু তা সত্ত্বেও ইংরেজ আর ওয়েলসদের মধ্যে একটা চাপা রেষারেষি কেন আছে? এথনিক বৈরীতা একটা ভীষণ জিনিস। তা সহজে মুছতে চায় না।

কার্ডিফ টমসন স্কুল অব জার্নালিজমে সংবাদের থিয়োরিটা শিখতে পারলাম। আমার গুরু ম্যানসফিল্ড বেশ যত্ন করে শেখাতেন। ছাত্র আমরা ছিলাম ওয়েস্টার্ন মেল ও সাউথ ওয়েলস ইকোর চার-পাঁচজন স্টাফ। ট্রেভর তাদের মধ্যে একজন।

ম্যানসফিল্ড আমাদের বলতেন, খবর হল, সঠিক তথ্য যা বেশির ভাগ জনসাধারণের কাছে ইন্টারেস্টিং বলে গ্রাহ্য হবে।

গুরু বলতেন : সাংবাদিকতায় সফল হতে গেলে চারটে প্রশ্ন নিজেকে করবে : এ কাজটা মন দিয়ে করার জন্য আমি কী প্রস্তুত? মন ও শরীর স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমি কী একাজ করার পক্ষে উপযুক্ত? আমি কী খাটতে পারব? আমি কি বেশ কিছুকাল ধরে এই কাজের কলাকৌশল শিখতে রাজি?

আমি এই চারটি প্রশ্ন নিজেকে করেই তবে এই পেশায় এসেছি। শপথ করে বলতে পারি ছাত্রজীবনে যথেষ্ট ফাঁকি দিলেও কর্মজীবনে ফাঁকি দিইনি। কিন্তু তবু পেশায় পরিপূর্ণ সাফল্য পাইনি। কারণ কোন পেশাতেই পূর্ণ সাফল্যের কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না। পূর্ণ সাফল্য, নাম খ্যাতি প্রতিপত্তি মালিকের চোখের মণি হয়ে থাকা তা নির্ভর করে এমন কিছু গুণের ওপর : সাংবাদিকতার ক্লাসে যা শেখানো হয় না।

আভানডোল রোড

কার্ডিফের পর আমার দ্বিতীয় অ্যাটাচমেন্ট ছিল ইংলন্ডের উলভার হ্যাম্পটন শহরে। এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টার খবরের কাগজের সঙ্গে।

বার্মিংহ্যাম হয়ে উলভারহ্যাম্পটন স্টেশন। এখানে এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টার কর্তৃপক্ষ আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন আভানডল রোডে এক ইংরাজ পরিবারে। ইংলন্ডে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। শ্রমজীবী মানুষের কোন অসম্মান কেউ করে না। দেশের অধিকাংশ লোকেরই লেখাপড়া ম্যাট্রিক পর্যন্ত। তারপরই তারা কাজে ঢুকে যায়। হাতে কলমে কাজ শিখে বড় হয়। ডিগ্রির মর্যাদা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মর্যাদা পেতে ডিগ্রির দরকার হয় না। অধিকাংশ মানুষ মধ্য শিক্ষিত বলে মধ্য শিক্ষিতদের মধ্যে কোন হীনম্মন্যতা নেই। আমার ল্যান্ড লর্ড মিঃ ডাটন এঞ্জিনিয়ার। কারখানায় কাজ করেন। পত্নী গৃহবধূ। ছেলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বিয়ের পর প্রথামত বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। ওঁর বাড়িতে আমি একমাত্র গেস্ট। দোতলার একটি ঘরে আমার থাকার জায়গা হল। বাড়ির ঠিকানা, ১৩, আভানডোন রোড।

উলভার হ্যাম্পটন শিল্প নগরী। তবে আমি যে এলাকায় থাকি ওটা আবাসিক এলাকা। কাছেই বিশাল পার্ক। সব শহরেই রাস্তার দুপাশে প্রচুর গাছ।

কাছেই পাব। পাব আসলে শুঁড়িখানা। আমাদের কফি হাউসের মত আড্ডার জায়গা। বিয়ার খেতে খেতে আড্ডা। গাল-গল্প। পরচর্চা। যারা ইংরেজদের আড্ডা

দিতে দেখেনি তারা পাবগুলো দেখেনি।

এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টার ট্যাবলয়েড সান্ধ্য দৈনিক। এরা আমায় অনেক কাজ দিতে শুরু করল। যেমন সাপ্লিমেন্টের জন্য লেখা। শিখধর্মের ওপর একটা বই এর রিভিউ করে দিলাম। আমি একদিন ওদের ক্লিপিং লাইব্রেরি দেখে বললাম, আমায় কাজটা শিখিয়ে দিন। দেশে গিয়ে চালু করবো।

আমি শিখলাম কেমন করে পেপার ক্লিপিং মেনটেন করতে হয়। দেশে ফিরে অনেক দিন এ বিদ্যা কাজে লাগেনি। ১৯৬৬ সালে আনন্দবাজারের বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী একদিন হঠাৎ বললেন ঃ তুমি ক্লিপিং লাইব্রেরি কীভাবে করতে হয় শিখে এসেছিলে না?

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ।

আমরা ভাবছি আনন্দবাজারে ক্লিপিং লাইব্রেরি চালু করবো তুমি পার্ট টাইম এই কাজটা করো। এর জন্য একশ টাকা করে পাবে। আনন্দবাজারে ক্লিপিং লাইব্রেরির পত্তন এইভাবে। তারপর পাঁচ-ছ বছর আমিই ওটা একা চালাতাম।

এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টারে কাজ করতে করতে একদিন জন বলে একটি ইংরাজ ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। জন সাংবাদিক নয়, রিসার্চ স্কলার। এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। কোথা থেকে আমার কথা শুনে একদিন নিজে থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল।

এরপর তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জন তখন হিস্ট্রিতে এমএ করে রিসার্চ করছে। ভারত সম্পর্কে তার আগ্রহ ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে।

একদিন সে আমায় নিয়ে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। পৃথিবীতে সব মায়েদেরই চরিত্র এক। স্নেহশীলা। ছেলেমেয়েদের বন্ধুদের তারা পুত্র -কন্যার মতই দেখে থাকেন।

জনের বাড়ি গেলে তার মা আমাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। বলতেন, তোমার ল্যান্ড লেডিকে ফোন করে বলে দাও আজ এখানেই খেয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে লাউঞ্জে আমি ও জন গল্প করছি। তখন এক গেলাস ঠাণ্ডা দুধ এনে জনের মা বলতেন ঃ দুধটুকু খেয়ে নাও বাবা।

আমি বলতাম ঃ কাকীমা প্লিজ, আমার দুধ একদম ভাল লাগে না।

জনের মা বলতেন ঃ যা বলছি তাই করো। রাতে ডিনারের পর ঠাণ্ডা দুধ খেয়ে ঘুমলে দেখবে ভাল ঘুম হচ্ছে।

আমি বললাম ঃ তাহলে জনের জন্য আর এক গেলাস দিচ্ছেন না কেন?

কাকীমা বললেন, জন কি আমার কথা শুনবে। ওকে শোনাতে পারলাম না বলেই তোমাকে বলছি। তোমার দেখাদেখি যদি ও বাধ্য হয়। জন হাসতে লাগল।

জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে লং ড্রাইভে যেতাম। ও একদিন একটা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নিয়ে গেল। অনেক রাতে সেদিন ফিরলাম।

জন আমাকে বলল ঃ ওর গার্ল ফ্রেন্ড মেরি এখন এখানে নেই। মেরি প্যারিস

গেছে। ও যখন ফিরবে আমি তখন থাকব না। আগামী বছরেই তারা বিয়ে করবে ততদিনে জনের পি-এইচডি-টাও কমপ্লিট হয়ে যাবে।

আমার বাড়িওয়ালা মিঃ ডাটন ও মিসেস ডাটন পার্থ কথাটা উচ্চারণ করতে পারতেন না।

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে আপনারা আমাকে পি বলে ডাকবেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে দেখি ড্রইংরুমে সোফায় বসে মিসেস ডাটন দুটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। একটি মেয়ে একটু ঢ্যাঙা। বয়স সাতাশ-আটাশ। আর একটি মেয়ের বয়স উনিশ-কুড়ি। দুই বোনের মুখের আদলে কোন মিল নেই। বড়জনের চুল ছোট ছোট করে কাটা তাতে তাকে আরও পুরুষালি দেখায়। ছোট মেয়েটির হর্সটেল করে চুল বাঁধা।

মিসেস ডাটন বললেন ঃ পি, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি, এ হল এলিজাবেথ (বড়) আর এর নাম অ্যাঞ্জেলা। এরা আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। তোমার কথা এদের বলছিলাম।

আমি ইংরাজি প্রথা অনুসারে গ্ল্যাড টু মিট ইয়্যু বলে করমর্দন করলাম।

তারপর বললাম ঃ আমি দিন কুড়ি হল এসেছি। পাশের বাড়িতে থাকেন। অথচ এতদিন দেখা হয়নি।

এলিজা বলল ঃ আপনাকে আমরা দেখেছি। আসলে আলাপের কোন অকেশন তো হয়নি। একদিন আপনাকে বাসেও দেখলাম। আপনি বোধ হয় অফিস যাচ্ছিলেন।

বললাম ঃ তা হবে হয়তো।

এলিজাবেথ একটি কম্পানিতে সেক্রেটারির চাকরি করে। অ্যাঞ্জেলা তখনও কলেজে পড়ছে। সে জার্মান জানে। স্কুলে জার্মান ছিল, তারপর আরও রপ্ত করেছে।

অ্যাঞ্জেলার কাছ থেকে আমি স্পোকেন জার্মানের দু চারটে কথা রপ্ত করে নিয়ে ছিলাম।

এলিজা ও অ্যাঞ্জেলা এরপর প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। এক সঙ্গে টিভি দেখতাম। গল্পগুজব করতাম। নিছকই আড্ডা।

একদিন মিসেস ডাটন বললেন ঃ জানো। এলিজাবেথ বেচারা খুব লোনলি; ওর কোন বয়ফ্রেন্ড নেই।

আমাদের দেশের চেয়েও ওদেশে সাধারণ দেখতে মেয়েদের সমস্যা অনেক। প্রধান সমস্যা তারা উপযুক্ত বয়ফ্রেন্ড পায়না। বয়ফ্রেন্ড মানে হবু স্বামী। যার সঙ্গে মেয়েরা স্ত্রীর মতই আচরণ করে। তবে বয়ফ্রেন্ড স্টেজটা প্রবেশন স্টেজ। অবস্থাটা স্টেডি গেলে তবেই বিয়ে। মেয়েদের পক্ষে এসময়টা খুব টেনশনে কাটে। যদি বিয়ে না হয়। এসময় অনেক মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। যদিও গর্ভ নিরোধক পিল অনেক মেয়েই খায় কিন্তু অনেকে আবার সতর্ক থাকে না। কাজেই গোটা পশ্চিম দেশে কুমারী মায়েদের সংখ্যা বাড়ছে। ইংলন্ডে আনম্যারেড মাদারদের সোসাইটি রয়েছে। জারজ

সন্তানদের মানুষ করার জন অসংখ্য অরফানেজ হচ্ছে।

সুন্দরী মেয়েদের পক্ষে বয়ফ্রেন্ড যোগাড় করা ও বিয়ে করা কঠিন নয়—অসুন্দরীদের পক্ষেই মুশকিল। যৌবন চলে যাচ্ছে অথচ বর যোগাড় করতে পারছে না সে এক দুঃসহ টেনসন।

আমাদের দেশে মেয়েরা সে তুলনায় অনেক ভাল আছে। যারা স্বয়ংবরা হতে পারছে, তাদের তো সমস্যাই নেই। যারা হতে পারছে না অথবা ততখানি উদ্যোগ নেই তাদের বাবা-মা বিয়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন। যাদের চেহারা তত ভাল নয়, তাদেরও দিব্যি ভাল ভাল বিয়ে হয়ে যাচ্ছে স্রেফ টাকার জোরে।

মিসেস ডাটন বললেন ঃ দাও-না ওর একটা বয় ফ্রেন্ড জুটিয়ে—

আমি হেসে বললাম ঃ একমাত্র আমি ছাড়া আমার চেনা-জানা কাউকে দেখছি না আন্টি। কিন্তু আমি তো দুদিনের পায়রা। আর দেড়মাস পরেই ফুস করে উড়ে যাবো।

মিসেস ডাটন হো হো করে হেসে উঠলেন।

মিসেস ডাটন বললেন : তোমার সঙ্গে লিজের প্রেম হলে দুই বোনের মধ্যে চুলোচুলি বেধে যাবে, সেটা কি ভাল হবে?

মিসেস ডাটন লিজকে নিয়ে আমায় খেপাতেন। আমার সঙ্গে লিজের একটা সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তিনি যে সচেষ্ট সেটা বুঝতে পারতাম। তবে সেটা হয়তো নিছক মজা করার জন্য। বিশেষ করে ওদেশে দুই এলিজিবল ব্যাচেলরের মধ্যে ফ্লার্ট করাটা আদৌ দোষের নয়।

কিন্তু আমি খুব সিরিয়াস ধরনের। খুব বেশি তারল্য এবং নিছক হাল্কা কৌতুক আমার পছন্দ নয়। একারণে মেয়েরা আমার কাছে বেশিক্ষণ ঘেঁসতে পারে না—নিছক নাছোড়বান্দা না হলে। আমি এসেছি দু দিনের জন্য। কাজ ফুরলে চলে যাবো। মন দেয়া-নেওয়া করে হাজার মরণে মরতে রাজি নই।

একদিন রাত্তিরবেলা এলিজা এসেছে, মিসেস ডাটন আমাদের দুজনকে বসিয়ে রেখে বরকে নিয়ে চলে গেলেন। বললেন : পি, আমরা একটু বারে গিয়ে গলা ভিজিয়ে আসি। এলিজা রইল। তোমরা বসে গল্প করো। তারপর চোখ টিপে বললেন : বি নাইস—উইল ইউ।

আমি বললাম : ইয়েস ম্যাম— সেন্ট পার্সেন্ট গ্যারান্টিড।

খট করে ল্যাচ কি বন্ধ করার শব্দ হল। বৈঠকখানায় আমি ও লিজ বসে। সারা বাড়িতে আর কেউ নেই। আমরা দুজনেই প্রথম দিকে একটু অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লাম।

পরিস্থিতি লঘু করার জন্য বললাম : লিজ, তুমি কি বরাবরই অফিসে কাজ করছ?

না আগে একটা ইস্কুলে পড়াতাম। ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিলে কেন? ইস্কুলের চাকরিতে বেশ ভাল চাকরি।

এলিজা মুখ টিপে হেসে বলল : আমি একটা ইস্কুলে পড়াতাম—টেরিবল স্কুল। ওই স্কুল টেডি গার্লে ভর্তি।

টেডি গার্ল? টেডি বয় জানি। টেডি গার্ল আবার কী বস্তু?

টেডি বয়দেরই কাউন্টার পার্ট। একটা পনের বছরের মেয়ে পড়া পারেনি বলে ধমকে ছিলাম বলে আমায় ছুরি নিয়ে তাড়া করে। ওই মেয়েটি তিন বছর বেশ্যাবৃত্তি করেছিল। ওই সব মেয়েদের ট্যাকল করা আমার পোষাল না। আমি পালিয়ে এলাম। আপনি আবার এসব লিখবেন না যেন।

বেশ নানা ধরনের গল্প সময় কেটে গেল। ছেলেমেয়ের মধ্যে সেক্স আর প্রেম ছাড়া কি কিছু আলোচনার নেই নাকি! এ দেশের মেয়েরা মন খুলে কারও সঙ্গে তো কথাও বলতে পায় না। প্রেমিকেরও কি এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনার আছে যা তাদের দুজনের সমস্যা নয়, অথবা সময় কাটাবার জন্য শুধু অগড়ুম বাগড়ুম কথা হয়।

আমার মনে হল এদেশে মেয়েরা বড় নিঃসঙ্গ। আমাদের দেশে বাবা মা বোন ছোট ভাই বন্ধু হতে পারে। এদেশে প্রাপ্তেষু ষোড়শ বর্ষ মানে তুমি আর তোমার প্রেমিক। আর কেউ চারপাশে নেই। আর যার প্রেমিক নেই, সে একেবারে একা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডাটন দম্পতি ফিরলেন। দেখি চোখ চক চক করছে। ইষৎ পা টলছে। ঝটপট ভালই চড়িয়ে এসেছেন। মিসেস ডাটন বললেন : ঠিকঠাক ছিলে তো? আমি বললাম পরীক্ষা প্রার্থনীয়। শুনে এলিজা ব্লাশ করল। এরপর ডাটন দম্পতি লাউঞ্জে আমার সামনে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন।

মিঃ ডাটন বললেন, পি, তোমরা কী এখনও মনে করো ব্রিটিশরা কলোনিয়ালিস্ট?

আমি বললাম : যদি উপনিবেশ গড়ার অর্থ ঔপনিবেশিকতাবাদ হয় তাহলে নিশ্চয়ই। তোমাদের হাতে এখনও কলোনি আছে।

কিন্তু আমরা কি যোগ্য হলে স্বাধীনতা দিচ্ছি না?

তারা যোগ্য কী অযোগ্য সেটা তাদের ব্যাপার। তোমাদের ফয়সালা করতে কে ডেকেছে?

আমরা তো কলোনিগুলিকে অর্থ সাহায্য করছি।

সে তো বাইরে থেকেও করতে পারতে।

ভারত বিচ্ছিন্ন ছিল। আমরা তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছি।

এটা বাজে কথা। ভারত কোনদিন অনৈক্যবদ্ধ ছিল না। স্বশাসন ছিল। কিন্তু ভারত জুড়ে ভাবগত ঐক্য ছিল। তোমরাই বরং এসে সেটাকে নষ্ট করেছ।

ইংরেজদের সঙ্গে তর্ক করার একটা সুবিধা তাদের সামনা সামনি গালাগাল দিলেও তারা চটে না। এটা বোধ হয় আর কোন জাতির সঙ্গে সম্ভব নয়। তাদের জাত তুলে কথা বললে তারা গুলি করে দেবে। কিন্তু ইংরেজদের আপনি যত গালাগাল দেবেন তারা তত বেশি যুক্তি তর্ক দিয়ে তাদের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করবে।

এলিজা সে রাতে যখন বিদায় নিল, তখন রাত এগারটা। ইংরেজরা পার্টি ফার্টি না হলে বেশি রাত জাগে না।

উলভার হ্যাম্পটনে থাকতে একদিন আমাদের নিউজ এডিটর মিঃ ব্রুক বললেন ঃ গুডইয়ার রাবার কম্পানি থেকে তোমার একটা ইনভিটেশন এসেছে। ওরা

তোমাকে ফ্যাক্টরি দেখাবে। ফলোড বাই লাঞ্চ। তোমাকে আগামী সোমবার ওদের ফ্যাকটরিতে গিয়ে পিআরওর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। ওদের জানিয়ে দিন আমি যাচ্ছি।

গুডইয়ার যে টায়ার তৈরি করে সেটা জানতাম কিন্তু তাদের প্রধান কারখানা যে উলভার হ্যাম্পটনে তা জানা ছিল না। বার্মিহাম, কভেন্ট্রি, উলভার হ্যাম্পটন এক কথায় গোটা মিড্ল্যান্ডে ব্রিটেনের বড় বড় শিল্প রয়েছে। উলভার হ্যাম্পটন থেকে আরও উত্তরে বার্মিংহাম হয়ে লিডস চলে যান শুধু কারখানার পর কারখানা দেখবেন।

গুডইয়ারের পিআর ওর নামও গুডইয়ার। তিনি খুব খাতির করে সব দেখালেন। এক সঙ্গে আর একজন ভারতীয় অতিথিকে তাঁর ডেকেছিলেন মিঃ মিত্তাল তিনি লখনৌর বাসিন্দা। একজন বড় ইঞ্জিনিয়র। আমি বুঝলাম আমাকে ওঁরা ডেকেছেন ভারতীয় সাংবাদিক বলেই। কারণ ভারতে ওঁরা গুডইয়ারের ভাবভূর্তিকে উজ্জ্বল করতে চান।

দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে আমি ও মিত্তাল বাস ধরব বলে এগিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটি গাড়ি আমাদের পাশে এসে আচমকা ব্রেক কষল। গাড়ির ভেতরে এক ভারতীয় তরুণ বসে।

সে দরজা খুলে বলল ঃ আপনাদের নাম মিঃ মিত্তাল আর মিঃ চ্যাটার্জি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তাহলে উঠে আসুন এই গাড়িতে। আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য পিআরও এই গাড়িটা পাঠিয়েছেন। আমি গুডইয়ারে কাজ করি। ড্রাইভারকে পিআরও বলে দিয়েছেন দুজন ইন্ডিয়ান এসেছিলেন। তাঁরা এখনও বেশি দূর যেতে পারেননি। তুমি তাদের তুলে নাও। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এসো। তা হয়েছে কি, আমাকে ভারতীয় দেখে ড্রাইভার ভেবেছে আমিই সেই। আমাকে গাড়িতে উঠতে বলায় আমি গাড়িতে উঠে বসেছি। ভাবলাম বোধ হয় লিফট দেবে বলে তুলে নিয়েছে। অনেক সময় ড্রাইভাররা এমন দয়া দেখায়। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভারের বোধ হয় খটকা লাগল। সে বলল ঃ আচ্ছা আপনার আর এক জন সঙ্গী কোথায় গেল?

আর একজন মানে?

আপনারা তো দুজন মিঃ মিত্তাল ও মিঃ চ্যাটার্জি।

তখন আমি বুঝলাম ড্রাইভারের ভ্রান্তি বিলাস ঘটেছে। এসময় দেখি আপনারা। আন্দাজে বুঝলাম আপনাদের জন্যই গাড়ি। এইবার আপনারা বসুন। আমি নেমে যাই।

ভদ্রলোক নামতে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনার নামটা জানতে পারি কী?

ঃ বিমান মুখার্জি?

ঃ বাঙালি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই বলে বিমান মুখার্জি নামবার উদ্যোগ করল।

আমি বললাম ঃ না-না। আপনি নামবেন না। আমি আভানডোল রোডে থাকি।

আমার বাড়িতে চলুন। তারপর একটু আড্ডা দিয়ে আপনি আপনার বাড়ি চলে যাবেন।

এক বাঙালি যুবকের স্বপ্ন

বিমান মুখার্জির সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ দুদিনের মধ্যে বন্ধুত্বে পৌঁছে গেল।

বিমান মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাবা নেই। দাদা ও ভাই বোনেরা আছে। বিধবা মা আছেন দেশে। তারা কল্যাণীতে একটি বাড়ি কিনেছে। সেই বাড়ি কেনার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করেছে বিমান। বোনের বিয়ে বাকি। ছোট ভাই বিনয়ের ফোটোগ্রাফার হবার শখ। তাকে একটি ক্যামেরা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে বিমান। বিনয় প্রেস ফোটোগ্রাফার হবার চেষ্টা করছে কলকাতার কোন কাগজে। বিমানের নিজেরও দামী লাইকা ক্যামেরা আছে।

যাবার সময় বিমান বার বার করে তার বাড়ি যেতে বলে গেল।

একদিন ওর বাড়ি গিয়ে দেখি বাড়ির ভেতর ল্যাব তৈরি করেছে বিমান। ছোটখাটো স্টুডিও বানিয়ে ফেলেছে। দেওয়ালে কত ছবি যে সেঁটে রেখেছে।

ঃ আপনার তো দেখছি ছবি তোলায় দারুণ আগ্রহ।

ঃ এখানে বাড়ি ফিরে কাজকর্ম তো কিছু নেই। হপ্তায় দুদিন ছুটি পাই। ক্যামেরা নিয়ে এদিক ওদিক চলে যাই।

ঃ এতদিন আছেন, আপনার কোন মেম সাহেব বান্ধবী টান্ধবী হয়নি?

বিমান বলল ঃ না, মশায় সে সব কিছু জোটাতে পারিনি।

ঃ তাহলে যান দেশে গিয়ে বিয়ে করে একটা রাঙা টুকটুকে বউ নিয়ে আসুন।

বিমান বলল ঃ আর বিয়ের বয়স নেই। ত্রিশের ওপর বয়স হয়ে গেছে।

আমি বললাম ঃ কার্ডিফে এক আইরিশ ম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার বত্রিশ বছর বয়স, তখনও বিয়ে করেনি। আমি বললাম, তোমাদের ছেলেরা তো আজকাল বিশ বাইশ বছরেই বিয়ে করে, তুমি এতদিন আইবুড়ো আছ কী করে? তা সে কী জবাব দিলে জানেন? ইংরেজরা অল্প বয়সে বিয়ে করতে শুরু করে। কারণ তারা অনেকগুলো বিয়ে করে ও ডিভোর্স করে বলে।

বিমান শুনে হো হো করে হেসে উঠল। গুড জোক।

না মশায়, জোক নয়। একেবারে সত্যি। আই মেট দ্য আইরিশ ম্যান।

বিমানের বাড়ির মালিক ভারতীয়। তার ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলাম সব কিছু আগোছাল। এক দিকে উঁই করা একরাশ কাগজপত্র। পাশের ঘরে মেঝেয় কার্পেটের ওপর জামা কাপড় খবরের কাগজ চাপা দেওয়া। বিমান বলল ঃ আপনাকে কতগুলি ছবি দেখাই। একটা বাক্স থেকে একটা ছবির প্যাকেট বার করল বিমান। একটি নুডিস্ট ক্যাম্পের ছবি। সমুদ্রের ধারে জন্মদিনের পোশাক পরা নরনারী দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের অনাবৃত দেহ বল্লবীর ছবি নানা পোজে তোলা। বেশ বোঝা যায় মেয়েটি স্বেচ্ছায় ছবিগুলি তুলতে দিয়েছে।

বিমান বলল ঃ এই ন্যুডিস্ট ক্যাম্পে আমি গিয়েছিলাম। এরা বলে ন্যাচারালিস্ট

ক্লাব। যারা প্রকৃতিকে ভালবাসে এমন নরনারীদের জন্য এমন শিবির হয় কোন নির্জন সৈকতে। যাকে বলে প্রাইভেট বিচ। তার লাগোয়া অনেকখানি জায়গা নিয়ে গোটা হোটেল বুক করে তারা। সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবাই নাগা সন্ন্যাসী হয়ে বেরোয়। উদ্দেশ্য মহৎ; প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া আদিম মানব মানবীর মত। এরা পারেও বটে। সব কিছুর মধ্যে একটা ফিলজফি আছে। যে কোন নতুনত্ব অভিনবত্ব বা বিপরীত স্রোত প্রবাহে ভাসার মত দুঃসাহসিকতা আছে এদের। বিমানও এখানে নগ্ন হয়ে ঢুকেছিল। এই নগ্নতার সঙ্গে সেক্সের কোন সম্পর্ক নেই। সোহোর যে মেয়েগুলি পটাপট দেহের সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে খদ্দেরদের খুশি করার জন্য তার সঙ্গে এই ন্যুডদের অনেক তফাত। শিল্পী যেমন ন্যুড মডেলের ছবির মধ্যে শুধু শৈল্পিক সৌন্দর্য খোঁজেন, সেক্স খোঁজেন না, এটাও ঠিক তাই।

মনে মনে ভাবলাম এলিজাবেথ ও বিমানের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে দেই। তারপর সেটা যে পথে যায় যাক। যেই ভাবা সেই কাজ। একদিন এলিজাবেথকে বললাম ঃ লিজ, আগামী রবিবার আমার এক ফোটোগ্রাফার ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সেদিন আমরা সারাদিন ধরে ঘুরব। বাইরে কোথাও খাবো। তোমার বোনকে বলে রাখো। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে।

এলিজাবেথ ও অ্যাঞ্জেলা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। তারপর বিমানকে নিয়ে আলাপ করিয়ে দিলাম ওদের সঙ্গে। সারাদিন আমরা লেকের জলে নৌকা বাইলাম। বিভিন্ন পোজে অসংখ্য ছবি তোলা হল দুই বোনের। তারপর অটো দিয়ে চারজনের গ্রুপ ছবিও তোলা হল।

বাড়ি ফিরতেই মিসেস ডাটন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মেয়ে দুটোকে নিয়ে বেরিয়ে ছিলে শুনলাম।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমার এক ফোটোগ্রাফার বন্ধু ওদের অনেক ছবিটবি তুলল।

ঃ মেয়েটার কিছু হিল্লে হল?

আমি বললাম ঃ আমি তো ঘটক মাত্র। শুধু আলাপটা করিয়ে দিলাম তারপর ওদের ব্যাপার।

উলভার হ্যাম্পটন থেকে চলে আসার পর আর বিমানের খবর পাইনি। দেশে ফিরতেই একটি কুড়ি একুশ বছরের ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বিমানের মুখটা ঠিক বসানো।

আমাকে ছেলেটি বলল ঃ আমার দাদা বিমান মুখার্জি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। প্রেস ফোটোগ্রাফারের কাজের যদি সন্ধান থাকে আমায় জানাবেন।

ছেলেটির নাম বিনয়। সে পরে বসুমতীতে প্রেস ফোটোগ্রাফারের চাকরি পায় এবং প্রেস ফোটোগ্রাফার হিসাবে ভাল নামও করে। আমার সঙ্গে প্রায়ই এখানে ওখানে দেখা হত। ওকে দেখলে আমার বিমানের কথা মনে হত। বিমানের ন্যুডিস্ট কলোনির অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি একটি গল্পও লিখেছিলাম।

অনেককাল পরে সম্ভবত ১৯৯৩ সালে বিনয় একদিন বলল ঃ দাদা মারা গেছে। বিমান নাকি আর দেশে ফেরেনি। বিয়ে থাও করেনি। দেশের কথা, বিয়ে করে ঘর বাঁধার কথা ভাবতে ভাবতে সে একদিন প্রৌঢ় হয়ে গেছে। তারপর একদিন তার নিজের বাড়িতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাসিভ হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর আগে তার বিশাল সম্পত্তি কীভাবে তার উত্তরাধিকারীরা পাবে সে তার নির্দেশ দিয়ে যায়। বিনয় আমায় বলেছিল, পার্থদা, আমি দাদার সম্পত্তির প্রবেট নিতে উলভার হ্যাম্পটন যাবো। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। দাদাকে আপনি ছাড়া এখানে আর কেউ জানত না। আমি বলেছিলাম, যদি দরকার হয় যাবো। কিন্তু তার আর দরকার বোধ হয় হয়নি। কারণ বিনয় আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি।

উলভার হ্যাম্পটনে থাকার সময় কী খেয়াল হল, এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টারে ছোটদের বিভাগে একটি ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দিলাম ঃ ভারতীয় পত্র বন্ধু চান? একজন ভারতীয় সাংবাদিক শিগ্রি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে লিখলে তিনি আপনার পত্র বন্ধু যোগাড় করে দেবেন। নিচে আমার উলভার হ্যাম্পটনের ঠিকানা দিলাম। তার কিছুদিন পরে এক গাদা ছেলেমেয়ের চিঠি এল। তারা ভারতীয় পত্রবন্ধু চায়। তার মধ্যে একটি মেয়ে লিখেছে যার বাংলা করলে দাঁড়ায় ঃ

প্রিয় মিঃ চাটার্জি,

আপনি কী আমাকে একজন বন্ধু যোগাড় করে দিতে পারবেন? আমার বয়স ১৮। আমার চুল কালো ও কোঁকড়ানো। চোখের তারা খুব ধূসর নীল। আমার হবি পপ রেকর্ড শোনা, নাচা ও কুস্তি দেখা। আমি সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি। দু সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলাম। ডাক্তার সন্দেহ করছিল অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আসলে সে সব কিছু না। ওরা আমার একটা অপারেশন করে আর একটা দাঁত তুলে দেয়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি আমার 'ইয়ংম্যানের' কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। তাতে সে লিখেছে সে আর একটি মেয়েকে ভালবাসে। আমি যখন হাসপাতালে পড়েছিলাম, সে দেখতে আসেনি। চিঠিপত্রও দেয়নি। এই চিঠিতে সে কেন আমায় ত্যাগ করল সে কথাও লেখেনি। এই সময় আমি আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। আপনি দয়া করে আমায় একটা ইটালিয়ান ইয়ংম্যান জোগাড় করে দিন। যদি ইটালিয়ান না পান তাহলে অন্য ইয়ংম্যানও চলবে। আমার সব বন্ধুরাই তাদের ইয়ংম্যানের সঙ্গে বেড়াতে বার হয়, আমিই শুধু চুপ করে, বসে থাকি, কারণ আমার কোন ইয়ংম্যান নেই। দয়া করে আমায় একজন কাউকে যোগাড করে দিন ও সাহায্য করুন। আমার হাতের লেখার জন্য ক্ষমা করুন। এখনও পর্যন্ত লিখতে গেলেই আমার হাত কাঁপে। আশা করি পত্রপাঠ উত্তর দেবেন।

ইতি আপনার বিশ্বস্ত লিলিয়ান,
টেলর।

এর আগে এলিজাবেথের করুণ অবস্থার কথা শুনেছি। এবার শুনলাম লিলিয়ান

টেলর নামে এই মেয়েটির কথা। মেয়েটি যে খুব বেশি শিক্ষিত নয় তার প্রমাণ তার ইংরাজি বানানের ভুল। একথা মনে করার কোন যুক্তি নেই যে যেহেতু ইংরাজি মাতৃভাষা সেহেতু সব ইংরেজ এক একজন শেক্সপিয়র। বরং ঠিক তার উলটো। ইংলন্ডের আমজনতা ম্যাট্রিকুলেট হলেও তাদের সাধারণ জ্ঞান কম। কাণ্ডজ্ঞানও সব সময় প্রশংসা করার মত নয়। নির্ভুল ইংরাজি কিংবা, ভাল ইংরাজি লেখার লোক ইংলন্ডেও কম। লিখলে বানান ভুল হয় এমন ইংরেজের সংখ্যাও অজস্র।

তবে সাধারণ মানুষ সরল। তাদের জীবনও জটিল নয়। কিন্তু সামাজিক জীবন থেকে পুরনো মূল্যবোধ বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে সুবিধাবাদী হয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা যে কত অসহায় হয়ে পড়েছে এই লিলিয়ানই তার প্রমাণ।

লিয়িয়ান নির্ঘাৎ পেনফ্রেন্ড ও বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে তফাৎ জানে না। সে ইন্ডিয়ানকে ইতালিয়ান পড়েছে। যেমন আমাদের দেশে সাধারণ মানুষেরা বিদেশ সম্পর্কে তেমন খোঁজ খবর রাখে না। তাদের কাছে সব দেশ সমান।

আমি ঠিক করলাম লিলিয়ানকে আমি দেখা করতে বলব। ওর সমস্যাটা নিজের কানে শুনি। এই সব সাধারণ মেয়েরা কত সরল। কত নির্ভরশীল। আমি লিলিয়ানকে দেখতে চাইলাম। তাকে লিখলাম, আমি কালই উলভার হ্যাম্পটন ছেড়ে যাচ্ছি। এখান থেকে নানা শহর ঘুরে ১৬ নভেম্বর দুদিনের জন্য বার্মিংহাম পৌঁছব। হোটেলের নাম দিয়ে বললাম তুমি কি ওই হোটেলে আমার সঙ্গে অমুক সময় দেখা করতে পারবে?

গ্রেট ব্রিটেন সফরের আগে কদিনের জন্য লন্ডন গেলাম। কারণ লন্ডন থেকেই আমাদের সফর শুরু হবে। লন্ডন শহরে কয়েকবার যাওয়-আসা করতে করতে শহরটা এখন যেন হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। তবে বেজওয়াটার রোড বা কুইন্স ওয়েতেই আমি প্রতিবার উঠতাম। কারণ এই পাড়াটা আমার বেশি চেনাজানা হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন, বিবিসির বাংলা সার্ভিসে দুএকটা টক দিতে পারেন তাহলে বাড়তি কিছু পাউন্ড রোজগার হয়। এক মিনিটে ওরা এক পাউন্ড করে দেয়।

এপর্যন্ত একদম সময় পাইনি বিবিসি যাবার। অল্ডন্ডউইচে বুশ হাউস বলে একটা বিরাট বাড়িতে বিবিসির অফিস। আমি বাংলা সেকসনে গিয়ে মিঃ মিত্রর সঙ্গে দেখা করলাম। মিত্র মশায় বললেন ঃ আপনি তো প্রায় পাঁচ মাস ইংলণ্ডে কাটালেন। এদেশের কী কী আপনার ভাল লাগল?

আমি বললাম, অনেক কিছুই ভাল লেগেছে। লোকে ইংরেজদের কেন কনজারভেটিভ বলে জানি না। কোন কনজারভেটিভ জাত কি বিদেশীদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতে পারে? বিদেশীদের এরা যে কীভাবে আপন করে নেয় তা সামাজিকভাবে এদের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না। আমি যদি ইংরেজ পরিবারের মধ্যে না বাস করতাম, ইংলন্ডকে বুঝতেই পারতাম না।

আর কিছু?

আর হল ডিসিপ্লিন। একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রেই ওরা কোন ডিসিপ্লিন মানে না।

এক্ষেত্রে ওরা বাঁধনহারা। এছাড়া জীবনের সবক্ষেত্রেই ওদের পরিমিতিবোধ আছে। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।

এটা বোধ হয় আপনি ঠিক বলছেন না। এরাও গসিপ করে। পরচর্চা পরনিন্দা করে।

আমি বললাম, তার মধ্যেও পরিমিতিবোধ আছে। মুখরোচক একটা ঘটনা পেলে রসাল আলোচনা হয় কিন্তু কেউ সৌজন্যের সীমা কখনও লংঘন করে না।

মিত্রবাবু বললেন ঃ আপনিতো বিভিন্ন শহর ঘুরতে যাচ্ছেন। ঘুরে আসুন। যাওয়ার আগে আপনার একটা বড় ইন্টারভিউ নেবো।

বুশ হাউসে যখন এসেছি তখন একবার ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের অফিস ঘুরে যাবার মনস্থ করলাম। ওখানে রিডিংরুমে বাংলা কাগজ আসে। দেখি দুতিনজন বসে আনন্দবাজার ও যুগান্তর পড়ছে। আমি আলাপ জমাবার জন্য উৎসুক হলাম।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি বাঙালি?

লোকটি চোখমুখ পাকিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বলল ঃ হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

আমার আর দ্বিতীয়বার কথা বলার ইচ্ছা জাগল না।

লন্ডন ছাড়ার আগে একবার আঁদ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আঁদ্রে বলল ঃ আপনি কেমন আছেন? কোন অসুবিধে হচ্ছেনা তো?

বিন্দুমাত্র না।

তরুণবাবু গত মাসে লন্ডন এসেছিলেন। আপনি জানতেন?

হ্যাঁ, আপনিইতো বলেছিলেন আগের বার।

ও হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম ওই সময় আপনি লণ্ডন এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

আমি একবার ভেবেছিলাম। তারপর ভাবলাম, কাজ কামাই করে আর এত পয়সা খরচ করে শুধু বসের সঙ্গে দেখা করতে আসব? তিনি তো আমাকে ডাকেননি।

আঁদ্রে হেসে বলল, তুমি সবে চাকরি করছ, চাকরি জীবনের কালচারই জানো না। বস এবং ভগবান নিজে থেকে কি কখনও কাউকে ফেভর করেন? তাঁদের নেকনজরে থাকার জন্য সব সময় তাঁদের ডাকতে হয়। প্রার্থনা জানাতে হয়। তুমি এলে ভালই করতে। তিনি হয়তো প্রত্যাশা করেছিলেন।

আমার এবার মনে হল, হয়তো আমার এসে দেখা করাই উচিত ছিল। মালিকরা খুব অভিমানী হয়—কথায় কথায় ভুল বোঝে। আমি কেন তাতে সাহায্য করব?

সিপিইউ অফিসে যেতে ব্রিগেডিয়ার ক্রশ বললেন ঃ তোমার ইংরাজি অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে। যখন এসেছিলে তার চেয়ে অনেক বেটার। আমি এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টারে তোমার লেখাগুলো পড়লাম।

আমি বললাম, আমি চেষ্টা করছি স্যর।

মিসেস ফ্রিগার্ডের কাছে যেতে তিনি বললেন তুমি নাকি এক্সপ্রেস অ্যান্ডস্টারে

পেনফ্রেন্ড খুঁজে দেবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছ?

বিজ্ঞাপন ঠিক নয় ম্যাডাম। ওদের ছোটদের পাতার এডিটরকে কথায় কথায় বলতে তিনি একটা নোটিশ করে দিয়েছেন।

আমি মনে মনে শঙ্কিত হলাম। উলভার হ্যাম্পটনের কাগজের বিজ্ঞাপনের খবর ফ্লিট স্ট্রিট পর্যন্ত এল কী করে? পরে বুঝলাম, ওদের অফিসে তো সব কাগজই আসে। কিন্তু আমি বোধ হয় এই বিজ্ঞাপন দিয়ে কোন নিয়ম নীতি লংঘন করেছি। এ অপরাধের শাস্তি কী? আমাকে কী পত্রপাঠ দেশে ফিরে যেতে হবে?

কিন্তু মিসেস ফ্রিগার্ড আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন ঃ আরে আমার স্টেনো বেটি বায়না ধরেছে তাকে একজন ভারতীয় বন্ধু যোগাড় করে দিতে হবে। দাঁড়াও আমি বেটিকে ডাকছি। এই বলে ইন্টারকমে বেটিকে ডাকলেন মিসেস ফ্রিগার্ড।

একটু পবে খুব রোগা একটি মেয়ে এল। এরই নাম বেটি।

ঃ আমার ডাকছিলেন?

ঃ হ্যাঁ। এঁকে চেন তো?

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। আমাকে আগে কখনও দেখেনি।

আমাদের ফেলো। মিঃ চ্যাটার্জি। ইনিই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন।

বেটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল ঃ ওহ্ আপনি? আমি খুব ইন্টাররেস্টেড পেন ফ্রেন্ডের ব্যাপারে।

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। যাবার আগে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

এরপর আমাদের ঘোরার পালা। প্রথমে লন্ডন থেকে ব্রিস্টল। তারপর কার্ডিফ, তারপরের সফর সূচি বার্মিংহ্যাম।

বার্মিংহ্যামে হোটেলে পৌঁছেই রিসেপশন থেকে বলল, আপনার জন্য একজন ভিজিটর অপেক্ষা করছে। দেখি একটি মেয়ে। রুগ্‌ণ চেহারা। তোবড়ানো মুখ। আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আন্দাজে ধরলাম লিলিয়ান।

আপনি মিঃ চ্যাটার্জি?

হ্যাঁ, তুমি লিলিয়ান?

হ্যাঁ, আপনার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

আমি ও ফারুকি এবং লিলিয়ান তিনজনে লাউঞ্জে বসলাম।

মেয়েটি এক শ্রমিক পরিবারের মেয়ে। কথায় কথায় জানাল তার বয়ফ্রেন্ডের এই ব্যবহারে সে ভেঙে পড়েছে।

আমি বললাম, দেখো লিলিয়ান। ভালবাসাতো জোর জবরদস্তির ব্যাপার নয়। If you love something set it tree. If it comes back it is yours. If it does not it never was.

লিলিয়ান কী বুঝল কে জানে। দেখলাম তার চোখে জল।

আমি আর তাকে বেশি জ্ঞান দিতে চাইলাম না। শুধু বললাম, দ্যাখো লিলিয়ান

আমি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম সেটা পেন-ফ্রেন্ডের জন্য। অর্থাৎ চিঠিতে বন্ধুত্ব। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় কিশোর ও তরুণেরা চিঠিপত্রের মধ্যদিয়ে যাতে ব্রিটেনের তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের কাছাকাছি আসতে পারে। তুমি চাও এমন বন্ধু যে তোমাকে ভালবাসবে। তাই না?

লিলিয়ান বলল ঃ ঠিক তাই।

তাহলে তুমি ফ্রেন্ডশিপ ব্যুরোতে চিঠি লেখো। এরা ব্যক্তিগত বন্ধু ঠিক করে দেয়। এই বলে ওকে ফ্রেন্ডশিপ ব্যুরোর ঠিকানা দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

হোটেলের ঘরে ঢুকে জানালার পর্দা খুলে দিতেই বার্মিংহ্যাম শহরটি মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সন্ধ্যা নামছে মন্দ মন্থরে। শহরের সব আলো জ্বলে উঠেছে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে আজ। এই শীতের সন্ধ্যায় একটি ব্যর্থ হৃদয় তরুণী একা একা ট্রেনে উঠে কত রাতে বাড়ি ফিরে যাবে তা কে জানে? তাকে জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাবার জন্য তাকে এতখানি রাস্তা ডাকার কি সত্যিই দরকার ছিল? তার চিঠি উপেক্ষা করলেই তো হত। সব চিঠির কি উত্তর দেওয়া যায়, না দিতে হয়? এই সব কথা বার্মিংহ্যাম শহরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম।

বার্মিংহাম থেকে শেক্সপিয়রের জন্মস্থান স্ট্যাটফোর্ড অন আভন এ গেলাম পরদিন। সেখানে শেক্সাপয়র নাট্যশালায় দেখলাম টেমিং অফ্ দ্য শ্রু নাটকটি। কভেনট্রি শহরে মোটর কারখানার চেয়ে ভাল লাগল একটি চার্চ। এটি গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান বোমায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কভেন্ট্রি শহরটাই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। যুদ্ধের পর আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে সব কিছু। শুধু চার্চটি সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত ভাস্কর জ্যাকব এপস্টাইন যিশুর একটি মূর্তি তৈরি করেছেন স্টিল দিয়ে। তার নীচে লেখা ঃ প্রভু ওদের ক্ষমা করো।

ব্রিটেনের উত্তরে স্কটল্যাণ্ড, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ওয়েলস। আমরা মোটামুটি ভাবে তিনটি রাজ্যই বৃত্তাকারে ঘুরলাম। লিডস, লিভারপুর, গ্লাসগো, এডিনবরা নিউক্যাসেল ম্যাঞ্চেস্টার শেফিলড হয়ে লন্ডন। এর মধ্যে অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউসে পনের দিনের একটা কোর্স হল। দক্ষিণওয়েলস দেখা ছিল, কিন্তু উত্তর ওয়েলসের অ্যাবারস্মিথ গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। কী অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য। আরও ভাল লাগল ইংলন্ডের লেক ডিস্ট্রিক্ট। কখনও গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলা। কখনও পাহাড়ি রাস্তা। বন্ধুর পর্বত পার হয়ে কখনও সবুজ উপত্যকায় এসে পড়ছি। দুপাশে লেক। যে দিকে তাকাও শুধু জল আর জল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্মস্থান এই লেক ডিস্ট্রিক্ট। এখানেই তিনি থাকতেন। তাঁর বাসস্থানও দেখলাম।

ইয়র্কশহরে এসে একটি ঘটনা ঘটল।

হোটেলে চেক ইন করে ঘরে ঢুকতে যাবো অমনি একজন হোটেল কর্মচারী এসে বলল ঃ স্যর, আপনি দয়া করে এক ঘণ্টা পরে এই ঘর অকুপাই করবেন।

ঃ কেন? ঘরটা তৈরি হয়নি বুঝি?

ঃ না স্যর। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার এই শহরে এসেছেন। তিনি চেঞ্জ করার

জন্য ঘরটা ব্যবহার করবেন। তারপর চলে যাবেন। আপনি একটু লাউঞ্জে বসুন।

আমি অবাক। প্রাইম মিনিস্টার আসছেন এই হোটেলে, তার জন্য কোন সাজো সাজো ভাব দেখলাম না এই হোটেলে। এমনকী বাইরে কোন পুলিশও নেই।

আমি লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি। লাউঞ্জে আরও লোক বসে। যেমন সব হোটেলেই থাকে।

এমন সময় দেখলাম ম্যাকমিলান সাহেব গট গট করে হেঁটে ওপরে উঠে গেলেন। সঙ্গে চারপাঁচজন সঙ্গী। ইউনিফর্মধারী কোন পুলিশ নেই ধারে কাছেও।

আধঘণ্টা পরে আবার গট গট করে নেবে এলেন ওপর থেকে।

আমি দেখলাম লাউঞ্জে যারা বসেছিলেন তাঁরা খুব একটা বিচলিতবোধ করলেন না প্রধানমন্ত্রীকে দেখেও কেউ পাত্তাই দিলেন না।

হোটেলের সেই কর্মচারীটি বললেন ঃ এইবার আপনি ঘরে যেতে পারেন। প্রাইম মিনিস্টার চলে গেছেন।

লণ্ডন ফিরে কয়েকটি চিঠি পেলাম দেশ থেকে। মলয় শংকর লিখেছেন, আসামে বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন শুরু হয়েছে। অনেক বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে। হরষিত ঘোষ লিখেছে, দেশে ফিরে কী করবে। যদি পারতো ওখানে থেকে যাও। এ সুযোগ আর পাবে না। আর একটি চিঠি পেলাম। আমার ছোট পিসীমা লিখেছেন ঃ তুমি বিলেতে বসে আছ এদিকে তোমার বাবা আমার কাছে এসে নিয়মিত টাকা টাকা করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তোমার কি সামান্য দায় দায়িত্ব নেই? যত তাড়াতাড়ি ফিরে সংসারের হাল ধরো।

থেকে যাওয়ার কথা একদম ভাবছিলাম না। স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে এসে দেশে না ফিরলে উদ্যোক্তাদের দারুণ অসম্মান। যদিও আমার কোন বন্ড দেওয়া নেই। তবু নৈতিক দায়িত্ব তো থেকেই যায়। তাছাড়া দেশে ফিরে এবার সংসারের হাল না ধরলে নয়ই। আমি জল মাপার মাসিক ত্রিশ টাকা ভাতার এক পয়সাও খরচ করিনি, পোস্ট অফিসে রেখে দিয়েছিলাম। ভবানীর কাছে পাশ বই আর ত্রিশ টাকা করে ছমাসের ছটি সই করা উইথড্রয়াল স্লিপ রেখে দিয়ে এসেছিলাম। সেই টাকা ভবানী প্রতিমাসে মায়ের হাতে দিয়ে আসছিল, সে খবর পেয়েছিলাম। ভাবলাম, ভাগ্যিস সেভিংস ব্যাঙ্কে এই অ্যাকাউন্টটা ছিল। তা নাহলে পরিবার ভেসে যেত।

যে কোন মানুষের জীবনে শান্তি ও ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের চাবিকাঠি হল সঞ্চয়। যাঁদের সঞ্চয় নেই তাদের ঋণ করতে হয়, আর ঋণী কোনদিন আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সঞ্চয়হীন মানুষই নিঃস্ব রিক্ত মানুষ।

আমি তাই সবাইকে বলি, যদি একটা টাকা জোটে তা দিয়ে ক্ষুধার খাদ্য কিনে খাবেন। যদি দু টাকা জোটে তা থেকে এক টাকা জমিয়ে রাখবেন।

দুর্দিনে, দুঃসময়ে সবাই মুখ ফেরাবে কিন্তু আপনার সঞ্চিত অর্থই তখন আপনার একমাত্র সম্পদ। তাই আমার স্লোগান, অর্থ নয় সঞ্চয়ই সম্পদ। সঞ্চয় বিযুক্ত অর্থ

মানুষকে আরও সংকট ফেলে।

সিপিইউ অফিসে যেতেই মিসেস ফ্রিগার্ড বললেন, কাল তো তুমি চলে যাচ্ছ। শোন, জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক তোমাকে তাদের গেস্ট করে নিচ্ছে। তুমি আর কোথায় কোথায় যাবে?

আমি বললাম ঃ আমরা ইচ্ছে তো গোটা ইওরোপ ভ্রমণ করা। কিন্তু আপাতত তার আশা দেখছি না। আমাকে দু মাসের মধ্যে দেশে ফিরতে হবে। সুতরাং কতগুলো দেশ বেছে নিয়েছি। এখান থেকে প্যারিস। প্যারিস থেকে সুইজারল্যান্ড সেখান থেকে জার্মানি। জার্মানির পর অস্ট্রিয়া যাবো। হাঙ্গেরি যাবো, যুগোস্লাভিয়া হয়ে গ্রিস। গ্রিস হয়ে তুরস্ক আর ইরাক। তারপর ঢুকব লেবাননে। লেবানন থেকে ইরান। ইরান থেকে করাচি হয়ে বোম্বেতে নামব।

বোম্বেতে বিমলদা তখন পোস্টেড। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যাবো। পরামর্শটা আর কিছুর জন্য নয় আনন্দবাজার ঢোকার ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন বলেছিলেন।

এর একটু ছোট্ট পটভূমি আছে।

বিলেত যাবার আগে একদিন সকালে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।

আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিমলদা বললেন ঃ এ হল আমার মামাতো ভাই। যুগান্তরে আছে। স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছে। আর ইনি হলেন বিনোদ বিহারী বসু। আনন্দবাজারের ডেভেলপমেন্ট অফিসার। বিমলদা তখনও কলকাতায় পোস্টেড। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কম্পানি। বিনোদবাবু তাঁকে খাতির করে কথা বলছেন।

বিনোবাবুকে আমি এর আগে দেখিনি। তবে শুনেছিলাম। তিনিই আনন্দবাজারে তখন সর্বেসর্বা।

আমি বললাম ঃ আমার খুব ইচ্ছে আনন্দবাজারে চাকরি করি।

কেন জানি না। আনন্দবাজারকে আমার যুগান্তরের চেয়ে বেশি প্রফেশন্যাল বলে মনে হত। কয়েকটি লেখাও সে সময় বেরিয়েছে আনন্দবাজারে। আনন্দবাজারের ছাপা, লে আউট, তার বাড়ির লোকেশন সব কিছুর মধ্যেই পেশাদারিত্বের ছাপ ছিল। সে তুলনায় যুগান্তরকে মনে হত যেন খুবই সাবেকি। গদাই লস্কর চালে চলা সংস্কৃতি। তাছাড়া বসতবাড়ির মধ্যে অফিস হওয়ায় অফিসটাকেই মনে হত বাড়িরই একটা এক্সটেনশন। আনন্দবাজারে তখন এক ডজন নামী সাহিত্যিক কাজ করছেন।

আমার ধারণা হয়েছিল, আমিও তো একজন সাহিত্যিক। আমি তো লেখক হবোই। লেখকের সঙ্গে সাংবাদিকের তো কোন বিরোধ নেই। বরং দুটো পরস্পরের পরিপূরক। আমরা বাঙালিরা সাংবাদিক লেখার মধ্যেও একটু সাহিত্য রস, একটু ইমোশন পছন্দ করি। কাঠখোট্টা সাংবাদিক গদ্যের কারবারির পক্ষে পাঠক মানস আকৃষ্ট করা মুশকিল। এজন্য রসিক হতে হয়। তাই আমি আনন্দবাজারে কাজ করতে চেয়েছিলাম।

বিনোদবাবু বললেন ঃ তুমি বিলেত থেকে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা কোর।

বিমলদা বললেন, আমি তো বোম্বে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসে তুমি বোস *সাহেবের সঙ্গে দেখা কোর।*

বিমলদার সঙ্গে দেখা করার জন্যই বোম্বে ঢুকে গেল আইটিনারির মধ্যে। আমার দুমাস ব্যাপী একাকী ভ্রমণসূচির সমস্ত আইটিনারি করে দিল টমাস কুক। কলকাতায় কেনা স্যুটকেস আর তার ভেতরে দশ কেজির মত বিলেতের লিটারেচর, পুরনো জামাকাপড় দিয়ে জাহাজে সেটি কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

লন্ডন ছাড়ার আগের দিন রাতে মিসেস ফ্রিগার্ড বললেন ঃ আমার পিএ বেটির কথা মনে আছে তো। দেশে ফিরে ওকে একটি পত্রবন্ধু যোগাড় করে দিতে হবে।

আমি বললাম ঃ ওকে বলুন, আজ রাতে ওকে আমি ডিনার খাওয়াব। তখন এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবো।

আমি বলে দিয়েছিলাম সন্ধ্যা ছ'টায় বেজওয়াটার টিউব স্টেশনের সামনে দাঁড়াতে। বেটি ঠিক সময় এল।

ওকে নিয়ে এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে বসলাম। অন্যদিন সন্ধ্যায় সব অবিবাহিতা মেয়েরাই ডেটিং করে। অর্থাৎ বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দুতিন ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ি ফেরে।

বেটি বলল ঃ তার বয়কে বলে দিয়েছে আজ তার অন্য কাজ আছে।

বেটি খুব ধীর স্বভাবের মেয়ে। খুব বেশি গভীরতা নেই। অধিকাংশ মেয়ের মত জীবনের মানে খুঁজতে যায় না। যেমন চলছে তেমনি ভাবে চলতে চায়। একটা চাকরি আর একটা স্টেডি বয়ফ্রেন্ড থাকলেই খুশি।

আমি বললাম ঃ তুমি কেমন ফ্রেন্ড চাও?

একজন স্মার্ট গাই। যে আমায় নিয়মিত চিঠি লিখবে। যার সঙ্গে আমার রুচির মিল আছে। এই ধরো মিউজিক ভালবাসে এমন কেউ।

তোমার বাবা-মা আছেন?

বাবা মা দুজনেই আছেন। তবে দুজনেই ডিভোর্স করে আলাদা আলাদা বিয়ে করেছেন। আমি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি।

বেটি আমাকে এবার বলল ঃ তুমি খুব লাকি চ্যাটার্জি। এই বয়সে কত দেশ ঘুরতে পারছ। কত মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমার খুব দেশ দেখার ইচ্ছে। ইন্ডিয়ায় খুব যেতে ইচ্ছে করে। শুনেছি বড্ড গরম।

গরমকালে গরম। শীতকালে এসো।

কী কী কিনে নিয়ে যাচ্ছ তোমার গার্লফ্রেন্ডের জন্য?

আমি বললাম ঃ আমার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই বেটি।

বেটি আকাশ থেকে পড়ল যেন।

বলল ঃ তুমি বড় লোনলি চ্যাটার্জি। তোমার মত ইয়ংম্যান একলা কীভাবে এখানে কাটালে? তুমি নাচ জানো? চল আজ নেচে আসি।

আমি বললাম ঃ আমি নাচ জানি না বেটি।

শোন তোমাকে একটা গল্প বলি, অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউসের হস্টেলে

আমরা আছি। এক সন্ধ্যায় সবাই ঠিক করল। আজ বটল পার্টি হবে। বটল পার্টি মানে যে যার মদের বোতল সঙ্গে আনবে। আমাদের মধ্যে কালো ছেলেগুলো মেয়ে পটাতে খুব ওস্তাদ। তারা দশ বারো দিনেই অনেক বান্ধবী জুটিয়ে ফেলেছে।

আমি পার্টিতে গেলাম। নাচ শুরু হল। একটি স্প্যানিশ মেয়েকে দেখে আমার খুব ভাল লাগল। আমি তাকে আমার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ করলাম।

কিন্তু নাচ তো জানি না। আমি শুধু তাকে কাছে টানার চেষ্টা করছি। সে সরে যাচ্ছে। তারপর আমাকে আনাড়ি ঠাউরে সে বলে বসল ঃ ডু ইয়ু ডান্স সো ক্লোজ ইন ইন্ডিয়া?

সেই লজ্জায় পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বেটি হো হো করে হেসে উঠল।

পরদিন সকালে ইংল্যান্ডকে বিদায় জানিয়ে প্যারিসের পথে রওয়ানা হলাম। শেষ হল আমার ব্রিটেনে প্রথম প্রবাস। এই ছ'মাসে ব্রিটেন আমার কাছে শুধু একটা পর্যটন কেন্দ্র হয়ে ছিল না—ছিল এক সমগ্র মানবসত্তা। ইংলন্ড আমার সামনে গোটা দুনিয়াটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এল। এনে দিল গভীর আত্মবিশ্বাস।

॥ সতের ॥

ইউরোপা

আমার ইওরোপ সফরে রোমাঞ্চকর কিছু ঘটল না। তবে এত অল্পবাজেটে এই রকমের একটা ট্যুর ম্যানেজ করা ছিল অবিশ্বাস্য। তদুপরি আমার ভ্রমণসূচি বিস্তৃত। প্রথমে ফ্রান্সে, তারপর জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, আস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, গ্রিস, ইরাক, লেবানন, ইরান ও পাকিস্তান হয়ে ভারতে ফেরা।

প্রথমে চেষ্টা করলাম, কিছু লেখার বিনিময়ে সে দেশের সরকারের আতিথ্য পাওয়া যায় কিনা।

এজন্য বিভিন্ন এমব্যসিতে ঘুরে প্রেস অ্যাটাচেদের সঙ্গে কথা বললাম।

অতিরিক্ত ভাড়া না দিয়ে আমার যাত্রাপথের মধ্যে ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য দেখার এই সুযোগ। আমার নীতি হল কোন সুযোগ হাত ছাড়া না করা। কারণ ভাল সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। সবাই যে সাহায্য করবে তার মানে নেই। পঃ জার্মানি ও হাঙ্গেরি দুটি দেশ আমাকে আতিথ্য দিতে রাজি হল।

আমার যাত্রাপথের মধ্যে প্রাগ, আঙ্কারা ও বাগদাদ পড়েছিল। কিন্তু এই তিন দেশেরই ভিসা পেলাম না। সরকারি স্পনসরশিপ চেয়েছিলাম এই কারণে যে সরকারি সহযোগিতা থাকলে আমি দেশের ভেতরে বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরতে পারব যা নিজের পয়সায় যেতে গেলে হাজার হাজার পাউন্ডের ধাক্কা। সে টাকা আমার কোথায়। আমি মদ্যপান সিগারেট ও মেয়েদের পিছনে টাকা ব্যয় না করে আমার অ্যালাউন্সের টাকা থেকে এই ভ্রমণের টাকা জমিয়েছি। কিন্তু খরচ-খরচা চালিয়ে কত আর জমাতে পারি। তাই নিজের পয়সায় যেসব দেশে থাকতে হয়েছে সেসব দেশে খুব সাধারণ

হোটেলে থাকলাম। বুদ্ধি করে ইয়ুথ হোস্টেলের মেম্বর হয়ে গেলাম। ইতালির রোম, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে ইয়ুথ হস্টেলে বিদেশের কত তরুণ-তরুণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ইতালিতে একটি আমেরিকান ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বছর-খানেক পর সে একদিন কলকাতা এসে হাজির। তাকে আমার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলেছিলাম। পরদিন তাকে রামমোহন রায় রোডে দুপুরে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলাম, ওই বাড়িতে কোন খাবার টেবল ছিল না, বউদিরা তাকে পিঁড়ি পেতে খেতে দিয়েছিলেন, সে পা মুড়ে বসতে পারে না। তাই নিয়ে হাসাহাসি হল। পথের পরিচয় সাধারণত পথেই শেষ করে দিতে হয়। আমি দেখেছি অধিকাংশই হারিয়ে যান। পরে ঠিকানাও হারিয়ে যায়। তবে যেহেতু মানুষ সম্পর্কে আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ সেহেতু এমন হয়েছে যে সব জায়গায় গিয়েছি তার আনুপূর্বিক বিবরণ মনে না থাকলেও সেখানে অল্প পরিচয় হওয়া বহু মানুষের কথা আমার মনে আছে।

ভিয়েনাতে আমার একজোড়া আমেরিকান তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমরা একই কনডাক্টেড ট্যুরে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যে এমন আলাপ হয়ে গেল যে পরদিন সকালে মেয়ে দুটি যখন বলল, কাল সকালে আমরা সালজবাগ যাচ্ছি, তুমি যাবে?

সালাজবার্গ অস্ট্রিয়ার আর একটি বড় শহর। যদিও আমার সেখানে যাবার কোন পোগ্রাম ছিল না।

তবু আমি আমার অন্যান্য প্রোগ্রাম বাতিল করে রাজি হয়ে গেলাম।

এ সম্পর্কে ইউরোপের সূর্যে যা লিখেছিলাম তা উদ্ধৃত করছি।

জুডি হ'ল ক্লিভল্যান্ডের মেয়ে। তবে এখন থাকে ১২৫ এর ডব্লু, টুয়েলফথ্ স্ট্রিটে। ঠিকানাটা নিউইয়র্কের। সিবিলের ঠিকানা নিউইয়র্কের ১০০ নম্বর ওয়েণ্ডের টেরাস।

দুজনেই সমবয়সী। একই অফিসের কর্মী। তবে দুজনের চেহারার মাঝে ফারাক যথেষ্ট। জুডি সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী, বেশ সপ্রতিভ। যদি অনর্গল কথাবলার কোন প্রতিযোগিতা হয়, জুডি তাতে প্রথম পুরস্কার পাবেই। সিবিল সুন্দরী নয়—সুশ্রীও নয়। কথাবার্তাও বলে কম।

দুই মেয়ে একলা বেরিয়ে পড়েছে পথে। জুডি বলল ঃ প্রতি বছরই প্ল্যান করি আর কিছুতেই হয়ে ওঠে না। নিউইয়র্কে বসে বিশ্বভ্রমণের পরিকল্পনা আঁটতাম আমরা চারটি মেয়ে। চারজনই সেক্রেটারি। কিন্তু প্রতিবছর একটা না বাধা আসে। এবার ঠিক করলাম, আর না। বেরিয়ে পড়ি পথে।

ঃ আর দুজন কোথায়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ ও তুমি জুন আর মেরির কথা জিজ্ঞেস করছ? জুন তো সত্যি সত্যি যাবার নাম শুনে পিছিয়ে গেল। আর মেরি বেচারার বিয়ে এই মাসে। ও বলল ঃ দেখ তিনবছর অপেক্ষা করেছি। হ্যারিসকে আর ঝুলিয়ে রাখতে পারছি না।

ওরা দুজন উঠেছে ইয়ুথ হোস্টেলে। ভাবতে অবাক লাগে দুটি তরুণী একলা বেরিয়ে পড়েছে পথে। কোন সঙ্কোচ নেই, কোন দ্বিধা নেই। ঘর থেকে স্কুলে যাবার

পথে যে দেশের মেয়েদের সতর্ক প্রহরা দিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেই দেশের লোকের পক্ষে দুটি তরুণীর একাকী বিশ্বভ্রমণ দর্শন বিশ্বরূপ দর্শনেরই শামিল।

আমদের বাস চলল রিঙ্গ স্ট্রাসে ধরে হ্যামসবুরগার স্ট্রাসের ওপর দিয়ে। শুনছি গাইড বলে চলেছে ঃ ওই দেখ আর্ট মিউজিয়ম, ন্যাচারাল হিস্ট্রির মিউজিয়াম, পার্লামেন্ট হাউস, সামনে দেখ গডেস অব পিসের মূর্তি, ওই দেখ সিটি হল, পার্ক থিয়েটার, রোজ গার্ডেন। সেন্ট পিটার চার্চ দেখ, দেখ সেন্ট স্টিফেন ক্যথিড্রাল। ওই দেখ ডানিয়ুব ক্যানেল। দেখ অ্যামিউজমেন্ট পার্ক।

আমাদের বাস এসে থামল শ্যেনব্রুন রাজপ্রাসাদের সামনে। এটি হ'ল সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার গ্রীষ্মাবাস। এই প্রাসাদের একটি ঘরেই মোজার্ট প্রথম কনসার্ট পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর বয়স সেদিন পাঁচ বছর।

শ্যোনব্রুন প্রাসাদ এখন শুধু সংগ্রহশালা। হলের ভেতরে রাজকীয় ব্যবহার্য দ্রব্য ও বিরাট বিরাট তৈলচিত্র সংরক্ষিত।

কোচট্যুরের শেষে আমি জুডি আর সিবিলকে আহ্বান জানালাম লাঞ্চে যোগ দেবার জন্যে। ওরা রাজি হয়ে গেল।

অপেরা রিং-এ মাটির নিচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আর একটি পৃথিবী। মাথার ওপর কর্মব্যস্ত রাজপথ। নিচে একটি বিরাট সাবওয়ে। চারপাশে দোকান আর মাঝখানে একটি কাফে।

ভিয়েনাতে এসে আমি দুবেলা আহার সারতাম এই ভূগর্ভস্থ কাফে থেকে। কারণ এখানে আহার্য সস্তা ছিল। ফরাসীদের পরই অস্ট্রিয়ানদের কফি-প্রীতি। ভিয়েনার কফি হাউসগুলিতে বসান আছে এসপ্রেসো মেশিন। আর আছে খবরের কাগজ। যে-কোন কাফেতে এলেই শহরের সমস্ত কাগজ পড়তে পাওয়া যায়।

জুডি আর সিবিলকে নিয়ে এসে বসলাম কফি হাউসে। অর্ডার করলাম ল্যাম্ব চপ আর চিকেন স্যুপের। জুডিকে বললাম ঃ ক'দিন আগে এক রাতে এই কাফেতে আমি এক বিচিত্র মানুষের দেখা পেয়েছিলাম।

ঃ রিয়েলি? সিবিল অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ঃ হ্যাঁ। সেদিন এক কাপ কফি নিয়ে বসেছিলাম এই টেবিলটাতে এক ভদ্রলোক এসে বিয়ারের পাত্র নিয়ে বসলেন সামনের টেবিলে। আমাকে দেখে বললেন ঃ ফ্রম ইন্ডিয়া? বললাম ঃ হ্যাঁ। ইংরেজী জানা একজন মানুষ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু ভদ্রলোক কি প্রসঙ্গ শুরু করলেন জান? বললেন ঃ তোমাদের ক্যালকাটার রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট শুনেছি খুব চার্মিং, খুব রোমান্টিক। আমি মিলিটারিতে ছিলাম। অনেক শুনেছি তোমাদের কথা।

ভেবেছিলাম ভদ্রলোকের মাথা খারাপ। কিন্তু দেখলাম না। অনেক দিকে তাঁর জ্ঞান টনটনে। বহুকষ্টে আলোচনার মোড় ঘোরালাম। দেখলাম সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো।

ভদ্রলোক আমাকে বিয়ার অফার করলেন। আমি বললাম ঃ নো। তারপর বললেন

ঃ কফি? আমি বললাম ঃ নো-নো। কিন্তু ভদ্রলোক তাতে দুঃখিত হলেন। তখন আমি বললাম ঃ শুধু এক কাপ কফি।

জুডি বলল ঃ পথে বার হয়ে আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার বিচিত্রতর। তার ওপর আমরা মেয়ে। একবার এক বিপত্নীক জার্মান ট্যুরিস্ট আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না কিছুতেই। বলে তোমরা যেখানে যাবে, আমার পথও সেখানে। শেষে তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল, যাত্রার সময় তাকে নিয়ে যাব। পরদিনই পালিয়ে বাঁচলাম।

আমি হেসে বললাম ঃ তোমার মত সহযাত্রিণী পেলে আমিও অবশ্য নরকে যেতে রাজী।

জুডি বলল ঃ কিন্তু সাবধান। সেখানে কিন্তু অ্যামেরিক্যান এক্সপ্রেসের কোচট্যুর নেই।

তিনজনেই হেসে উঠলাম।

লাঞ্চের পর তিনজনে বেড়ালাম কিছুক্ষণ।

জুডি বলল ঃ তোমাদের ইন্ডিয়ান মেয়েদের আমার ভাল লাগে খুব। দে আর অ্যা-ফুলি নাইস।

সিবিল বলল ঃ বিশেষ করে তাদের কালারফুল শাড়ি।

আমি বললাম ঃ পশ্চিমের মেয়েদের চেয়েও ভাল লাগে?

জুডি বলল ঃ হ্যাঁ। আমার মনে হয় তোমাদের মেয়েরা মোর ফেমিনিন। নারীদেহের কমনীয়তা তাদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, হয়ত তার কারণ, আমাদের মেয়েরা এখনও বধূ। তারা এখনও দলে দলে বেরিয়ে আসেনি ঘরের বাইরে। এখনও আমাদের গৃহকোণে জ্বলে সন্ধ্যার প্রদীপ। বাজে মঙ্গলশঙ্খ। কিন্তু পশ্চিমের মেয়েরা আজ প্রতিটি কাজে প্রতিযোগিতায় নেমেছে পুরুষের সঙ্গে। তারা বর্জন করেছে পোশাকের বাহুল্য। পুরুষ হতে গিয়ে তারা কোমলকে হারিয়েছে পরুষ হয়েছে।

জুডি বলল ঃ কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমাদের দেশেও দেখেছি সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা একথা ভাবছেন। নতুন করে চিন্তা করছেন। ভাবছেন নারীর পূর্ণতা শুধু গৃহরচনায় না বহিরঙ্গনের বিচিত্র কর্মযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানের মধ্যে?

মনে পড়ল একদা এ বিষয়টি নিয়ে আমি ইংলন্ডে বহু মহিলার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরাও চান নারীত্বের কুসুমকোরকগুলি ফুল হয়ে ফুটুক গৃহ অঙ্গনে। প্রেম সূর্যকিরণ হয়ে ঝরে পড়ুক তার আপন পরিজনের ওপর। নারীজীবনের পরম লগ্ন আসে সেদিন, যেদিন সে হয় মাতা।

ঃ আপনাদের মতে নারীত্বের পরম আদর্শ কি? ইংলন্ডের কয়েকজন মহিলাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

ঃ ওয়েল। আমরা মনে করি নারীকে সবার ওপরে নারী হতে হবে। নারীত্বই নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। উত্তর দিয়েছিলেন তাঁরা।

লাঞ্চের শেষে জুডি ও সিবিলকে যখন বিদায় দিলাম তখন দিবসের তৃতীয় প্রহর।

ওরা প্রতিশ্রুতি দিল আজকের সন্ধ্যায় অপেরার অনুষ্ঠানে ওরা আমার সঙ্গী হবে।

অপেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যদিও সন্ধ্যা নামিয়া আসিছে মন্দ মন্থরে কিন্তু সব সংগীত থেমে যায়নি। বরং পৃথিবীর সমস্ত সংগীতের কেন্দ্রস্থলেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এইখানে সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে আসার কথা ছিল জুডির আর সিবিলের। কথা ছিল আমরা তিনজনেই আজ মোজার্টের ম্যাজিক ফ্লুট দেখতে যাব। মোজার্টের অপেরা এর আগে দেখি জার্মানির বন শহরে। জার্মানিতে আমাদের এক সপ্তাহের ট্যুর সরকার থেকে স্পনসর করেছিল। আমাদের বলছি একারণে যে আমার সহযাত্রী ছিল ফারুকি। আমি প্যারিস হয়ে জার্মানি যাই। সে সরাসরি জার্মানি চলে আসে। এক সঙ্গে আমরা ট্যুর করি। সে রাজকীয় আয়োজন ছিল। পাঁচতারা হোটেলে ছিলাম বার্লিন, ডাসেলডরফ, ফ্রাঙ্কফুট ও বন শহরে। সাংবাদিক বলে জেনেভার ইউনাইটেড নেশনসের বিভিন্ন এজেন্সির পিআরও-রা আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। ভিয়েনায় গিয়ে পররাষ্ট্র দফতরের কাছে যখন পরিচয় দিলাম তখন তাঁরা বললেন ঃ আপনার পেঁসিয়র খরচ আপনাকে দিতে হবে না। আমরা দিয়ে দেব। তাঁরা আমাকে অপেরার টিকিটও কিনে দিলেন। ভিয়েনায় বসে অপেরা দেখা এক বিরল সৌভাগ্য।

কিন্তু জুডি এবং সিবিল এল না। ওরা নিরাসক্ত পথিক। কোথাও জাড়িয়ে পড়তে চায় না।

দুমাস ইওরোপের সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি ইওরোপের সূর্য লিখেছিলাম। মাসিক বসুমতীতে তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বই হয়ে বার হয়। একারণে এই ভ্রমণের কোন বিস্তারিত কাহিনী এখানে দেব না।

শুধু এই ৬০ দিনের সফরে কয়েকটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা বলব। ভিয়েনায় নেতাজী পত্নী এমিলি শেঙ্কল ও কন্যা অনীতার সঙ্গে আমি দেখা করি। ওরা প্রকাশ্যে আসার পর সম্ভবত আমিই কলকাতার প্রথম সাংবাদিক যে নাকি অনীতার সাক্ষাৎকার নিই ও তার কথা কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশ করি। বলা যেতে পারে এটি আমার জীবনের প্রথম স্কুপ। আমি কাগজে পড়ি নেতাজীর পত্নী ও কন্যা ভিয়েনায় থাকে। ইওরোপ যাত্রার প্রথমেই আমার সফরসূচির মধ্যে ভিয়েনাকে রাখার একটা বড় কারণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করা।

কিন্তু তাঁদের ঠিকানা আমি জানতাম না। সুভাষচন্দ্র বসুর নাম অস্ট্রিয়ায় এখন আর কটা লোক জানে।

তাঁর পত্নী ও কন্যা যে ভিয়েনায় বাস করেন একথাও লোকে জানে না।

আমি ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব এ. কে মিত্রের শরণাপন্ন হলাম।

মিত্র খুব সদাশয় লোক ছিলেন। তবে একটা জিনিস জেনেছিলাম এই সফরে। আমার বয়স কম বলে সবাই আমায় সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত আমি জন্মসূত্রে বিনয়ী। বয়স্কদের সম্মান দিয়ে কথা বলতাম। একারণে বয়স্করা আমাকে সাহায্য করতেন। বয়স হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে সেই সাহায্য আর পাইনি।

মিত্র আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিলেন।

অনীতা আর মিসেস শেঙ্কলের সঙ্গে আমার আলাপের যে বিবরণ পরবর্তীকালে ইওরোপের সূর্য বইতে লিখেছিলাম তা উদ্ধৃত করছি।

অনীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি আমি অমৃতবাজার পত্রিকায় পাঠিয়ে ছিলাম। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন একদিনে আমার জীবনের প্রথম স্কুপ সংবাদটি অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। মিসেস শেঙ্কল ও অনীতা থাকতেন ভিয়েনার বাসতিয়েন গ্রামের ১৮ নম্বর জেলার ১১ এ নম্বর বাড়িতে।

আঠারো নম্বর ডিস্ট্রিক্টে থাকেন ভিয়েনার মধ্যবিত্তরা। বিরাট পুরনো বাড়ি। সংকীর্ণ রাস্তা। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ বিপণি কেন্দ্র। দেখা করার সময় ছিল পাঁচটা। কিছু আগে এসেছিলাম। সময়নিষ্ঠা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার দুর্বার লোভ পেয়ে বসল। উদ্বৃত্ত সময়টা তাই খরচ করলাম সামনের এক চার্চের প্রাঙ্গণে।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা তখন বেল টিপলাম দরজার। একটু পরেই দ্বার খুলে লঘু ছন্দে এসে দাঁড়াল এক তরুণী।

এক নজরে চিনে নিতে অসুবিধা হ'ল না। যাঁরা দর্শন লাভের আশায় আজ ক'দিন ধরে অজয় মিত্রের কাছে ধরনা দিচ্ছি। যোশী ভিয়েনায় ভারতীয় দূতাবাসে তৎকালীন প্রথম সচিব। পরে তিনি রহস্যজনক ভাবে নিহত হন এবং অবশেষে মিস যোশীর চেষ্টায় যাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ঘটেছে, ইনিই সেই।

তবু বললাম ঃ আপনিই অনীতা?

স্কার্ট পরিহিতা অষ্টাদশী একটু হেসে বললেন ঃ হ্যাঁ। আপনি তো মিঃ চ্যাটার্জি। উপরে আসুন। মা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

দোতলাব একটি ঘরে আমাকে নিয়ে গেল অনীতা। সেখানে ডাইনিং টেবিলের পাশে বসে বিশ্রম্ভালাভ করছিলেন এক প্রৌঢ়া ও এক বৃদ্ধা।

অনীতা পরিচয় করিয়ে দিল ঃ আমার মা আর দিদিমা।

ঃ বাইরে এই প্রথম নাকি?

ফিরে তাকালাম। প্রশ্ন করছেন মিসেস এমিলি শেঙ্কল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহধর্মিণী। একহারা নাতিদীর্ঘ চেহারা। সুগৌর ললাটে বয়সের নিষ্ঠুর ছাপ। অনুমান করা যায় এককালে তিনি সুন্দরী ছিলেন।

বললাম ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনীতা চা নিয়ে এল। প্লেটে কেক আর পেস্ট্রি ঢালতে ঢালতে সে বলল ঃ আপনার হাতে এই বস্তুটি কি মিঃ চ্যাটার্জি?

সসঙ্কোচে বললাম ঃ একটি ক্ষুদ্র টেপ রেকর্ডার। মিস অনীতা, তোমার ও শ্রীমতী শেঙ্কলের কণ্ঠস্বরকে আমি ভারতে পৌঁছে দিতে চাই।

আমার প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানালেন শ্রীমতী শেঙ্কল। বিরক্ত হলেন।

বললাম ঃ মাপ করবেন। আপনি কি চান না আপনার কথা ভারতবাসী জানুক?

উনি বললেন ঃ কখনও না। আমাকে নিয়ে আপনারা কাগজওয়ালারা প্রায়ই হৈ-চৈ করেন। কিন্তু কেন? আমি কি ফিল্ম স্টার? আমি চাই শান্তিপূর্ণ জীবন।

শ্রীমতী শেঙ্কল তাঁর উত্তপ্ত আচরণে নিজেই যেন লজ্জিত হলেন।

বললেন ঃ ভাববেন না আপনাদের প্রতি ঔদাসীন্য আছে আমার। আমি এখানে

সরকারি চাকরি করি। আপনারা আমাকে নিয়ে হৈ-চৈ করলে আমার চাকরিরই ক্ষতি হয়।

এবার প্রশ্ন করলাম অনীতাকে ঃ নেতাজীর লেখা কোন বই পড়েছ?

ঃ ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল পড়েছি। আর কিছু নয়। অনীতা বলল।

ঃ বাংলা শিখছ শুনলাম। শিখেছ নাকি কিছু?

ঃ ও কিছু নয়। অনীতা বলল। মাত্র ক'টি শব্দ। এখান থেকে বাংলা চর্চার হাজারো অসুবিধা।

ঃ বড় শক্ত বাপু তোমাদের ভাষা। মিসেস শেঙ্কল বললেন। বিশেষ করে অ্যালফাবেট।

ঃ এমন কিছু নয় মামী। অনীতা মৃদু প্রতিবাদ করল।

ঃ বেশ শক্তই বাছা। মিসেস শেঙ্কল বললেন। এত রকমের অ্যালফাবেট তোমাদের। ভাষারই এত বিভেদ। কি করে যে তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলবে?

বললেন ঃ জান। নেতাজীর স্বপ্ন ছিল রোমান হরফের প্রচলন করা। সমস্ত ভাষার জন্যে এক হরফ। বার্লিনে থাকতে উনি তার এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের কিছু অংশে লিখেছিলেন রোমান হরফে।

বললাম ঃ আপনার বাড়ি নেতাজীর কোন ব্যক্তিগত ছবি নেই?

শ্রীমতী শেঙ্কল বললেন ঃ না। যা ছিল সবই বার্লিন থেকে চলে আসবার সময় নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমতী শেঙ্কলের কথায় কথায় কি যেন মনে পড়ে গেল। উনি অনীতাকে বললেন ঃ চ্যাটার্জিকে সেই চিঠিটা দেখা না একবার।

অনীতা বলল ঃ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। চিঠিটা দেখুন তো মিঃ চ্যাটার্জি।

অনীতা বাংলায় লেখা একখানা চিঠি বার করল। চিঠিটা এসেছে কলকাতা থেকে। অনীতাকে লিখেছে এক বাঙালি মেয়ে। অনীতা কলকাতায় যাচ্ছে, এজন্য তাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে মেয়েটি।

অনীতা বলল ঃ কলকাতা থেকে প্রায়ই এ ধরনের চিঠি পাই। কেউ লেখে বাংলায়। কেউ ইংরেজিতে।

আলাপ গড়াল অনেকক্ষণ ধরে।

শ্রীমতী শেঙ্কল বললেন ঃ অনীতা যাচ্ছে তার বাপের বাড়ি। এটা তার ফ্যামিলি ভিজিট। তাকে নিয়ে হৈ-চৈ হোক আমি পছন্দ করি না।

আমি বললাম ঃ মাপ করবেন মিসেস শেঙ্কল। অনীতাকে বাংলাদেশের লোক নেতাজীরই প্রতিভূ বলে মনে করে। নেতাজী আজ আমাদের মধ্যে নেই। আপনি এখানে বসে অনুমান করতে পারবেন না মিসেস শেঙ্কল—নেতাজীকে আমাদের দেশের মানুষ কতখানি ভালবাসে।

মিসেস শেঙ্কল বললেন ঃ কিন্তু আমি মনে করি অনীতার ভারত সফর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

অনেকক্ষণ পরে আমি উঠলাম। রাত অনেক হয়ে গেছে। দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল অনীতা। বলল ঃ রাস্তা চিনে যেতে পারবেন তো মিঃ চ্যাটার্জি?

বললাম ঃ চিনে যখন আসতে পেরেছি, তখন যাবার সময় কোন ভুলই হবে না।

ট্রামে যেতে যেতে ভাবছিলাম দিনগুলির কথা। আমি দিনলিপি রাখি না। দিনলিপির পাতা খুলে সংসারীর মত হিসাব মেলাতে বসি না দিনের শেষে। যখন আমি পথিক তখন সন্ন্যাসীর মত আমি নিরাসক্ত। আমি জানি পথের সঞ্চয় আপনিই এসে জমা হবে মনের মণিকোঠায়। পথের দেবতা যিনি তিনি তাকেই বেশি দেন, যে চায় না কিছুই।

ভিয়েনায় এসেছিলাম প্যারিস, জুরিখ জেনিভা আর জার্মানির পাঁচটি শহর ঘুরে ভিয়েনা থেকে গেলাম বুদাপেস্ত। বুদাপেস্ত সরকারি আতিথ্য জুটে গেল। হাঙ্গেরি থেকে গেলাম যুগোস্লাভিয়া। সেখানে থেকে গ্রিসের এথেন্স।

এথেন্স গিয়ে আবার পেনিলপির সঙ্গে দেখা হল। আমি তাকে চিঠি লিখে আমার সফর জানিয়েছিলাম। সে কনস্টিউশন স্কোয়ারে বিমান কোম্পানির সিটি অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারই পছন্দমত একটি কমদামী হোটেলে আমি উঠলাম।

এথেন্সের দ্রষ্টব্য বস্তু পার্থিনন আর অ্যাক্রোপলিস দেখাতে নিয়ে গেল সে। পরদিন বাসে করে ডেলফি গেলাম অ্যাপলোদেবের মন্দির দেখতে। মন্দির আর এখন নেই, আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ। আমি ইন্টারমিডিয়েটে গ্রিক ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম বলেই প্রাচীন গ্রিসকে আমার আরও ভাল লাগল।

পরদিন পেনিলপি আমায় ডেলফি নিয়ে গেল। এথেন্স থেকে চারঘন্টার মত পথ বাসে যেতে হয়। ডেলফির পথে পড়ল থেবস, যেখানকার রাজা ছিলেন ইডিপাস বা অউদিপাউস। ডেলফির মন্দির বিখ্যাত ছিল দৈববাণী বা ওরাকলের জন্য। ওই অলিম্পিয়াসের শিখর চূড়ায় উঠে সূর্যের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের হাতের মশালটি ধরিয়ে নিয়েছিলেন প্রমিথিউস। সেই মশালের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে মানুষ পেল প্রথম আলো। সেই প্রমিথিউসকে বন্দী করল জুপিটার। ককেশাস পর্বতের এক নিঃসঙ্গ শিখর চূড়ায় আলোর বার্তাবহ প্রমিথিউসের যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল শকুনেরা। সে বড় নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাহিনী লেখা আছে গ্রিক উপকথায়।

এত অল্প সময়ের মধ্যে গোটা ইওরোপ যে আমাব কাছে এতখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তা আমি ভাবিনি। সাধারণ পর্যটকের মত বুড়ি ছোঁয়া গোছের ট্যুরও আমার ছিল না। আমার নোটবই ভরে উঠেছিল অসংখ্য মানুষের কথায়। ছবি তুলেছিলাম অজস্র ; দেশে ফিরে একজন প্রেস ফোটোগ্রাফার আমার অনেক দুর্মূল্য নেগেটিভ নষ্ট করে দেয়। শুধু পর্যটকের মত বুড়ি ছোঁয়া ভাবে দেশ দেখলে আমি ভ্রমণের কোন আনন্দ পেতাম না। প্যারির ল্যুভর, সাঁজালিজে, আইফেল টাওয়ার, সুইজারল্যান্ডের লেক লাজার্ন, অথবা ইতালির কলোসিয়ম, উফিজি গ্যালারি, ভেনিসের গন্ডেলা, গ্রিসের অ্যাক্রোপলিস, মিশরের পিরামিড সব কিছুই দেখেছি কিন্তু একমাত্র এগুলি দেখার জন্য আমি ইওরোপ যাইনি। আমি গিয়েছিলাম মানুষের সঙ্গলাভ করতে। মানুষকে জানতে। সে সব দেশের ইতিহাস সংস্কৃতি ও রাজনীতির পরিচয় নিতে। সেদিক থেকে আমার ভ্রমণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। এখন বসে বসে ভাবলে কীরকম অবিশ্বাস্য মনে হয়। ২৩ বছরের একটি ছেলে যার সহায় সম্বল নেই, চেনা-জানা কোন সুপারিশ

নেই সে একা একা গোটা ইওরোপ মধ্য প্রাচ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে পথের বন্ধুদের ওপর নির্ভর করে।

পেনিলোপির সঙ্গে গ্রিসে এসে আমার বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হল। আজ চল্লিশ বছরেও যা ম্লান হয়নি। আমরা এখনও চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখি।

মেয়েটি ভীষণ চাপা। আমি যখন গ্রিসে যাই তখন সে কার্ডিফের একটি ইংরাজ ছেলের বাগদত্তা। এদসব কথা তখন সে আমায় বলেনি। বলেছে আরও পরে যখন সে তাকে বিয়ে করেছে তারপর। পেনিলপি তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। ও দিদিমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার মা ডিভোর্স ক'রে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঘর করছিলেন। পেনিলপিকে তিনি মেয়ের মতই দেখতেন। পেনিলপির আর ভাইবোন হয়নি।

এই গ্রিক পরিবারটি আমাকে সারাজীবন ধরে মনে রেখেছেন। ১৯৯৫ সালে যখন আমি তৃতীয়বার এথেন্স গিয়েছিলাম তখন পেনিলপির কাছেই উঠেছিলাম। তার মা ও বৃদ্ধা দিদিমা আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, রেস্টুরেন্টে খাইয়েছিলেন। এতবছর ধরে তাঁরা আমায় মনে রেখেছেন, আমি তো অবাক।

বসুধৈব কুটম্বকম বলে সংস্কৃতে যে একটি কথা আছে, আমার জীবনে তা ভীষণভাবে ফলেছিল। আমি যতবার বিদেশ গিয়েছি ও বিভিন্ন ভিনদেশী মানুষের সংস্পর্শে এসেছি ততবার একথা মনে হয়েছে। তবে বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র পেনিলপির সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ এখনও অটুট।

এথেন্স থেকে লেবানন হয়ে আমি কায়রোয় এলাম। লেবাননে আমি এক রাত্তিরের বেশি থাকিনি। কিন্তু কায়রোয় চার পাঁচ দিন ছিলাম। আরও বেশি দিন থাকতাম, যদি না সেখানে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটত। কায়রোয় লোকে যায় পিরামিড ও স্ফিঙ্কস দেখতে। আমি গিয়েছিলাম মুখ্যত কর্নেল আব্দুল গামাল নাসেরকে দেখতে। এটা হয়তো একটু বেশী রকমের আশাবাদী চিন্তা। ১৯৫৬ থেকে তিনি একটি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আর আমি একজন হাফ সাংবাদিক। গাছে উঠতেই এক কাঁদি সংগ্রহের স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু নাসেরকে আমার কামাল আতাতুর্কের উত্তরসূরী বলে মনে হত। কামাল যেমন তুরস্ককে আধুনিক করেছেন নাসেরও তেমনি করতে চান। তাছাড়া তিনি আরব জাতীয়তাবাদের প্রতীক। আমি ইজ্রায়েলের সমর্থক কিন্তু তা বলে প্রগতিশীল আরব জাগরণের বিপক্ষে নই। নাসের যেভাবে ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলেন, কাজ শেষ করলেন, আসোয়ান বাঁধের, তাতে মনে মনে আমি তাঁর প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতাম। কায়রোয় এসে আমি একটি সাধারণ হোটেলে উঠলাম। তারপর পররাষ্ট্র দফতরে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি নাসেরের ইন্টারভিউ চাই।

পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে বিদেশ প্রচার দফতর থাকে। বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁরাই কথাবার্তা বলেন। তাঁরা বললেন ঃ ব্যাপারটা এক রকম অসম্ভব। কারণ প্রেসিডেন্ট এখন শহরে নেই। তিনি দুদিন পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাচ্ছেন এক অনুষ্ঠানে। সেখানে আমরা একটা প্রেস পার্টি নিয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম ঃ আমায় আপনারা ওই প্রেস পার্টিতে নিন না। আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে দেখি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হয় কিনা।

ওঁরা বললেন, একটা অ্যাপ্লিকেশন দিন। প্রসেস করে দেখি, কী করা যায়, তবে কথা দিতে পারছি না।

আমি ইতিমধ্যে পিরামিড দেখে নিলাম। পিরামিড কায়রো থেকে বেশি দূরে নয়। নিয়মিত বাস আছে। নীলনদের সেতু পেরিয়ে একটু গ্রামের দিকে যেতে হয়। ঘণ্টাখানেক লাগে।

পিরামিডের ভেতরে গুহা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে গেলে দেখা যায় তার মধ্যে প্রশস্ত ঘর রয়েছে। সেখানে মৃতদেহ মমি করে রাখা হত। তার সঙ্গে দেওয়া হত প্রচুর ধনরত্ন। ধনরত্ন এখন নেই তবে অনেকগুলি মমি দেখলাম।

মমি দেখতে গিয়ে আমার এক জোক মনে পড়ে। কোথায় যেন পড়েছিলাম। মনে পড়লেই হাসি পায়। পরপর দুটি মমির কফিন। একটি মমি বড় আর একটি ছোট। পর্যটক জিজ্ঞাসা করছে, আচ্ছা এই দুটো মমি কার কার? গাইড ঝটপট উত্তর দেয়। দুটোই ফারাওর। একটা হল তিনি যখন ছোট ছিলেন, আর একটা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের।

গাইডরা মুখস্থ বিদ্যা গড়গড় করে বলে যায়। আমার মনে হয় তারা যা বলছে সব বানানো মনগড়া। তার চেয়ে পুস্তিকা কেনা অনেক ভাল। ওতে একটা দায়বদ্ধতা আছে।

পরদিনই সেই দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটল। তখন বিকেল। কায়রোর চৌরঙ্গী সোলেমান পাশা স্কোয়ার। অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছি। এমন সময় বেদুইনের পোশাক পরা একটি লোক এসে আমার বুক পকেট থেকে জার্মানি থেকে কেনা দামী মন্ত ব্ল্যাঙ্ক কলমটি তুলে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল।

আমি হতভম্ভ। এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে একটা পাউন্ডও খোয়া যায়নি। কেউ আমায় প্রতারণা করেনি। এমনকী সবাই বলেছিল, ইতালিতে পকেটমার ভর্তি। সাবধান। কিন্তু আমি ইতালিতে ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। কিছুই খোয়া যায়নি।

সবশেষে ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র মিশরে এসে যত গণ্ডগোল। এই ঘটনার কথা আমি কায়রোর রহস্য বইতে উল্লেখ করেছি। বইটি ছোটদের জন্য লেখা এক থ্রিলার। কায়রোর পটভূমিকায় লেখা।

সামনের ট্রাফিক কনস্টেবলকে বললাম ঃ দ্যাখো ওই লোকটি আমার কলম নিয়ে পালাচ্ছে। পুলিশ আমায় বলল ঃ চোরধরা আমার ডিউটি নয়। আমার চেঁচামেচি দেখে একটি আরব ছেলে আমার সাহায্যে এগিয়ে এল। সে ইংরাজিতে বলল ঃ আমার সঙ্গে থানায় চলুন।

ছেলেটি আমায় থানায় নিয়ে গেল। তারপর দেখি থানার বড়বাবু ছেলেটিকে আরবি ভাষায় ধমকাচ্ছেন।

আমি বললাম, আপনাকে ওসি কী বলছে?

ছেলেটি বলল ঃ কেন আমি একজন ফরেনারকে নিয়ে এসে উটকো ঝামেলা বাধিয়ে তুলেছি। এঁড়ে বেটাকে বাদ দিয়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর। এখানে কিস্যু হবে

না। আপনি হেড অফিসে চলুন। ওদের লালবাজার বলতে যা বোঝায় সেখানে গেলাম। অতিকষ্টে গোয়েন্দা অফিসারের দেখা মিলল। আমি ঘটনার বিবরণ দিতে তিনি একটি বড় অ্যালবাম এনে আমায় দেখালেন। তাতে সারি সারি পকেটমারদের ছবি।

বললেন ঃ এবার বলুন এর মধ্যে কাউকে চিনতে পারেন কিনা।

আমি দেখলাম বেদুইনের পোশাক পরা অন্তত ত্রিশ চল্লিশটা পকেটমারের ফটো। আমি এদের মধ্য থেকে আমার পকেটমারকে আলাদা করে চিনতে পারলাম না।

যে শ্রদ্ধা নিয়ে মিশর দর্শনে এসেছিলাম সেই শ্রদ্ধা একেবারে উবে গিয়েছে। আরে এতো কলকাতারই আর এক সংস্করণ। তাহলে নাসেরের ডিক্টেটরশিপে কি আর পরিবর্তন হল।

ইওরোপ আর এশিয়া—আফ্রিকার মধ্যে যে কতখানি ফারাক তা ইওরোপ ছেড়ে বুঝতে পারলাম। যুগোস্লাভিয়া। হাঙ্গেরি, ইতালি, গ্রিস পশ্চিম ইওরোপের মত অত উন্নতি করতে পারেনি কিন্তু ওই সব দেশে আপাতদৃষ্টে দারিদ্র্য চোখে পরেনা তা ছাড়া পথে ঘাটে ভিখারিও দেখা যায় না। জার্মানিতে তো সব কিছু ঝকঝক তকতক করছে। সে তুলনায় বেইরুট, কায়রো দারিদ্র্য ও অপুষ্টিতে ভর্তি। কয়েকটি ছাড়া বাকি রাস্তা ওল্ড দিল্লির মত। রাস্তায় রাস্তায় সন্দেহজনক লোকের ভিড়। বড়লোক সব দেশেই আছে। পাঁচতারা জীবনও রয়েছে। সমৃদ্ধ নাইট লাইফও আছে কিন্তু সাধারণ ভাবে জীবন যাত্রারমান যথেষ্ট নীচু।

কায়রোর অপরাধ জগৎ দেখলাম কলকাতার মতই। এখানেও পুলিশের চোর ধরতে তত আগ্রহ নেই।

অপরাধীদের অ্যালবাম দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এদের সংখ্যা এত! আর সবাইকেই দেখতে একরকম। আমি এক লহমায় যাকে দেখেছিলাম তাকে আইডেন্টিফাই করা অসম্ভব।

আমি বললাম ঃ পারলাম না। দুঃখিত। মনে মনে ঠিক করলাম। এ শহরে আর এক মুহূর্ত নয়। নিজের বলতে কিনেছিলাম ওই দামী পেনটি। এছাড়া একটি আগফা অপ্টিমা ক্যামেরা আর একটি টেপ রেকর্ডার।

টেপ ও ক্যামেরা এখনও অক্ষত। কিন্তু বেছে বেছে ওই কলমটি চলে গেল। মন তাই ভীষণ খারাপ।

রাতে হোটেলে ফিরতেই রিসেপশন থেকে বলল ঃ ফরেন অফিস থেকে একটা ফোন এসেছিল। আপনার আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়া মঞ্জুর হয়েছে। কাল অফিস খুললে আপনি পররাষ্ট্র দফতরে দেখা করবেন।

কিন্তু পরদিন আমি তেহরানে যাবার টিকিট বুক করে ফেলেছি।

শেষ শাহ

কায়রো থেকে ইরানে এসে পৌঁছলাম ২৩ ডিসেম্বর সকালে। এর আগে নানা রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ইরান একটু থিতু হয়েছে। খবরের কাগজে পড়তাম শাহ মহম্মদ রেজা পল্লবী দেশটিকে পাশ্চাত্ত্যের মত প্রগতিশীল করে তুলেছেন। মুসলিম দেশকে যারাই আধুনিক করতে গিয়েছে তাদের মধ্যে কামাল আতাতুর্ক ছাড়া কেউ

সফল হননি। শাহ চেষ্টা করছেন। তার পিছনে আমেরিকার সমর্থন আছে। শুনেছিলাম, বোরখা ছেড়ে ইরানি মেয়েরা তখন স্কার্ট পরছে। দলে দলে বাইরে চাকরি করতে যাচ্ছে।

তেহরানে দিন কয়েকের প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি। ইচ্ছা ছিল যে সিরাজ ও ইস্পাহান দেখব। শেখ সাদী, ফেরদৌসি আর ওমর খৈয়াম পড়ে আমার মনে হয়েছিল ইরানের রাস্তায় রাস্তায় সাকীরা সুরা ও পানপাত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে।

এয়ারপোর্ট থেকে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যেতেই অফিসার একটি টাইপ করা কাগজ দিলেন। তাতে লেখা ভিজিটিং জার্নালিস্টরা যে কোন সাহায্যের জন্য পররাষ্ট্র ইনফর্মেশন দফতরের অমুক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আমি হোটেলে গিয়ে পরিচয় দিয়ে ওই নম্বরে ফোন করতেই একজন জুনিয়র অফিসার চলে এলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে আপনার গাইড হিসাবে পাঠিয়েছে। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য।

আমি বললাম, আমি সিরাজ যেতে চাই। আমাকে জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার অভিপ্রায় যথাস্থানে জানাবো।

শাহ সেসময় এক বিদেশিনী তরুণীকে বিয়ে করেছেন। তার নাম ফারা দিবা। সুন্দরী বলে সারা পৃথিবীর কাগজে তখন প্রচুর পাবলিসিটি বেরুচ্ছে।

বার্লিনে গিয়ে একদিন একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছি। আমি ফারুকি আর আমাদের সুন্দরী দোভাষিনী। আমার গায়ে গলাবন্ধ কোট। ফারুকির মাথায় ফেজ টুপি। দেখি রেস্তারাঁ শুদ্ধ লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পরে শুনলাম, রটে গেছে শাহ দিবা এই রেস্তোরাঁয় এসেছে। দোভাষিনীকে সবাই ভেবেছে দিবা আর আমাদের দুজনকে ইরানিয়ান রাজকর্মচারী।

সাধারণ মানুষ একটু গোলাই হয়।

চারিদিকে নির্মাণকাজ চলছে। শাহ ইরানকে আধুনিক করে তুলতে চাইছেন। মেয়েরা সবাই চুল ছেঁটে মেমসাহেবের মত স্কার্ট পরতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে সেই মধ্যযুগীয় জীবন দিব্যি বহাল আছে। গরিব মানুষের অভাব নেই। বস্তি বাড়ি যথেষ্ট। তার পাশাপাশি নতুন বহুতল বাড়ির নির্মাণ কাজ চলছে। শাহ তেহরানকে দ্বিতীয় আঙ্কারা করে তুলতে চান।

আমি মধ্যযুগীয় বাজারে বাজারে ঘুরলাম। গেলাম প্রাচীন মসজিদ দেখতে। যে কোন দেশে গিয়ে প্রথমে তাদের গ্রাম দেখতে ইচ্ছা করে। শহরে জীবনের ধারা সর্বত্র এক। নিউইয়র্কের মধ্যবিত্ত ও কলকাতার মধ্যবিত্তের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কোন তফাত নেই। দুদেশই উচ্চবিত্তে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা চলছে নিয়মিত। ইরানেও সে চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু মৌলবাদীরা শাহকে পছন্দ করছে না। শাহর সাভক বা গুপ্ত পুলিশও খুব সক্রিয়।

আমার তো মনে হচ্ছে এই যে লোকটিকে আমার গাইড হিসাবে পাঠানো হয়েছে তা আমার ওপর নজর রাখার জন্য।

দ্বিতীয় দিন আমার দোভাষী জানাল ঃ স্যর। আপনার সিরাজ যাবার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। আপনি চাইলে আমরা রওয়ানা হতে পারি।

আমি হিসাব করে দেখলাম আজ ২৪ ডিসেম্বর। আর মাত্র এক হপ্তা সময় আছে, নতুন বছর পড়ার। নতুন বছরের গোড়ায় আমার কাজে যোগ দেওয়া উচিত। তা নাহলে বেশ অর্থকষ্টে পড়ে যাবো। এখনও আমার ভ্রমণ তালিকায় করাচী আছে। অবশ্য করাচীতে থাকব ৭২ ঘণ্টা। বিনা ভিসায় এতটুকুই আমার যাবার মেয়াদ।

আমি সিরাজ যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। বড়দিনের দিনই আমায় করাচী পৌঁছতে হবে।

করাচী নামতেই ইমিগ্রেশন থেকে আমায় বিশেষ খাতির করল। ইয়্যু আর ইন্ডিয়ান। ওয়েলকাম টু পাকিস্তান।

পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের কাছে ভারতীয়রা এখনও খাতির পায়। সে সময় পাকিস্তান এক রকম নিষিদ্ধ দেশ ভারতীয়দের কাছে। আমি ভারতীয় হয়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ট্যাক্সিওয়ালা যখন শুনল আমি কলকাতার সে তার পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে জানাল, এক সময় সে কলকাতার রাস্তায়ও গাড়ি চালিয়েছে। দুএকটা জায়গার নাম করল শ্যামবাজার, খিদিরপুর।

ভারতীয় ফিল্মি মিউজিক তখন করাচীতে খুব চালু। চওড়া টেপের পুলে বন্দী হয়ে সেসব গান আকছার চলে আসে।

ফারুকির বাড়িতে ছিলাম দুরাত। তার বউ ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তার মেয়েরা কখনও ভারতীয় দেখেনি। ভারতীয়রা তাদের মতই দেখতে দেখে সে হতাশ হল।

ফারুকি নিয়ে গেল এক ভদ্রলোকের কাছে। তিনি পদস্থ সরকারি অফিসার। তাঁর এক বন্ধু আছেন দিল্লিতে। কিন্তু তিনি তাকে চিঠি লিখতে পারেন না। কোন ভারতীয়কে চিঠি দেওয়া মানে ভারতের স্পাই বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করা। ভদ্রলোক একটা অনুরোধ করলেন ঃ বললেন, একটা ঠিকানা লিখে নিন। দেশে ফিরে ভদ্রলোককে একটা চিঠিতে লিখবেন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি ভাল আছি।

আমি তাঁর অনুরোধ পালন করেছিলাম।

বোম্বেতে নেমেছিলাম এক রাতের জন্য। টেলিফোন করে বিমলদার বাড়ির কাউকে পেলাম না। করাচী থেকে বিওএসি মারফত একটি খবরও পাঠিয়ে ছিলাম এয়ার পোর্টে কাউকে পাঠাবার জন্য কিন্তু এয়ারপোর্টে কাউকে দেখলাম না।

আমার কাছে ঠিকানা আছে। কিন্তু শুনলাম সে অনেক দূর। যেতে প্রচুর ট্যাক্সি ভাড়া লাগবে। তাছাড়া রাত হয়ে গেছে। অজানা অচেনা জায়গায় কোথা থেকে কোথায় যাবো।

প্রায় আটমাস ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করে একদিনের জন্যও মনে আশংকা জাগেনি। সব কিছু চলেছে ঘড়ির কাঁটার মত প্ল্যান মাফিক। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দিয়ে এক রাতের জন্যও সান্তাক্রুজ থেকে বান্দ্রা পাড়ি দিতে সাহস পেলাম না।

সারারাত এয়ারপোর্টে কাটিয়ে ভোরের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরলাম। সেদিন ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬০।

॥ কুড়ি ॥
বিলেত ফেরত

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা জ্বালিয়ে দিয়ে ইওরোপে এই আটটি মাস আমাকে আট বছরের অভিজ্ঞতা এনে দিল। ফিরে এলাম সম্পূর্ণ নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে। মনে হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় পাশ্চাত্ত্যকে আমরা যতই নস্যাৎ করে দিই না কেন, পাশ্চাত্ত্যের কাছ থেকে আমরা কোন পাঠই নিতে পারিনি। দুশো বছরের ইংরাজ শাসনে যে সব ইংরেজরা এদেশে ছিল তারা যেন নকল ইংরেজ। আসল ইংরেজরা জীবনে কতগুলি মূল্যবোধ মেনে চলে। কথা দিয়ে কথা রাখে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আপনার করে নিয়ে আন্তর্জাতিক মানুষ হতে জানে। তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা, শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম, ন্যূনতম সততা, প্রশংসা করার মত। তাদের মেয়েরা নারী বলে আলাদা সুবিধা দাবি করে না। পুরুষের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে গিয়ে স্বাধিকার প্রমত্তা হতে জানে। মেয়েরা যখন ভালবাসে তখন উজাড় করে দেয়, আবার ভালবাসা মরে গেলে ভিক্ষুকের মত প্রার্থী হয়ে থাকে না, নিঃশব্দে সরে যায়।

বিলেত ফেরৎ হয়ে আমি সাহেব হতে পারলাম না। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক আশাক আচার-আচরণে আমি গাঁয়ের ছেলেই রয়ে গেলাম। কিন্তু মনের দিক থেকে খাঁটি ইংরেজ হবার সাধনাই আমার জীবন সাধনা হয়ে রইল। যেমন নিয়মানুবর্তিতা, অন্যের সম্পর্কে অন্যায় কৌতূহল প্রকাশ না করা, অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে কঠোর দৃষ্টি দেওয়া, গায়ে পড়া ভাব না দেখান, আত্মকেন্দ্রিক না হয়েও আত্মস্থ থাকা, আর সংযতবাক হওয়া। কারণ সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

এর ফলে আমার ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেল, আমি এক অহঙ্কারি ব্যক্তিত্ব। বেশী কথাবার্তা বলি না। সদালাপী নই, এটি আমার বিলেত ফেরত হবার ফলে প্রচারিত হতে লাগল। কিন্তু আমি স্বধর্মে নিধনংশ্রেয় গণ্য করে আমার স্বভাব পরিবর্তন করলাম না। এককথায় আমি আমার নিজের অনমনীয় কাঠিন্যের মধ্যে নিজেই বন্দী হয়ে পড়লাম। ফিরে দেখলাম আমার তরুণ সহকর্মীদের অনেকে আমার সঙ্গে আর কথা বলছে না। বিলেতে গিয়ে আমার আর একটি কথা মনে হল ঃ আমার কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। তাকে সংবাদপত্রের ডেস্কের স্বল্প পরিসরে বন্দী করে রাখা যাবে না। আমার কর্মক্ষেত্র হবে শ্রমিকের বস্তি, চাষীর কুটির। উৎসবে, ব্যসনে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে আমি মানুষের সান্নিধ্যে আপ্লুত হবো, শঙ্কিত মানুষ যখন শহর ছাড়ার চেষ্টা করবে আমি তখন সেই শহরে ঢুকব। সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে আমি এক জায়গায় মেলাব। যেমন করে গান ও বাজনা একই সুরে এসে মেশে।

সে ছিল আমার স্বপ্ন। মানুষের সব স্বপ্ন সফল হয় না, সত্য হয় না। কিন্তু সাফল্যের জন্য স্বপ্ন দেখতে হয়।

কলকাতায় ফিরে অফিসে যোগ দিয়ে আমি দক্ষিণাদাকে বললাম ঃ আমাকে আপনি ডেস্ক থেকে সরিয়ে দিন দক্ষিণাদা। আমাকে রিপোর্টার করে দিন।

দক্ষিণাদা বললেন ঃ তুমি অনিলকে বলো। সে যদি চায় তাহলেই হবে।

অনিল ভট্টাচার্য যুগান্তরের চিফ রিপোর্টার। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। বিধান রায়ও তাকে স্নেহ করেন। পুলিশে তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব। অপরাধীরা ভয় করে পুলিশকে। পুলিশ ভয় করে অনিল ভট্টাচার্যকে। তাঁর কোপে পড়ে কলকাতা পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর বদলি হয়ে যান কোচবিহারে। এমন ঘটনা নাকি অভূতপূর্ব।

মানুষটি এমনিতে খোলামেলা। মুখে আদিরসের ফোয়ারা ছোটান। সে অর্থে কোন সফিস্টিকেশনের ধার ধারেন না। কোন প্রচলিত এটিকেট মানেন না। মুখে যা আসে বলেন। এমনকী নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাধারাও গোপন করেন না। অত্যধিক খোলামেলা লোকদের একটা সুবিধা আছে তাঁরা সিরিয়াস কথাও হাল্কাভাবে বলতে পারেন। তাঁরা ঘা দিয়ে কথা বললেও লোকে তা রসিকতা মনে করে উড়িয়ে দেয়। এমনকী আহত লোককেও হেসে জবাব দিতে হয়।

অনিল ভট্টাচার্য বাংলা সাংবাদিকতার ক্রান্তিকালের এক প্রবাদপুরুষ। বহু সাংবাদিককে তিনি সাহায্য করতেন। এমন মানুষটিকে আমি জয় করতে পারলাম না। এ তো আমারই অক্ষমতা। আমি এইভাবেই জীবনকে দেখি। যেটা আমি পাই না, আমি মনে করি না এর পিছনে কোন মতলব আছে। মতলব যদিও থাকে, বুদ্ধির নিদর্শন হল সেই মতলবকে তরলীকৃত করে দেওয়া। জীবন হল যুদ্ধের মত। দুই দলের বাণযুদ্ধ। কেউ যদি অগ্নিবাণ মারে অন্যকে সাগরবাণ ছুঁড়ে জলের তোড়ে সে আগুন নেভাতে হবে। বসে বসে কাঁদলে চলবে না। বড় হয়ে আমি দুবার মাত্র কেঁদেছি— একবার ব্রজেনবাবুর মৃত্যুর সময়। আর একবার বাবার মৃত্যুতে। এছাড়া আমার চোখে কখনও কোন দুঃখে জলের ছিটেফোঁটাও দেখা দেয়নি।

অনিলদা আমাকে রিপোর্টার করলেন না।

তরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম শিশির কুঞ্জে।

কবে এলি?

এইতো ঊনত্রিশ তারিখে।

তরুণদা। আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর করে দেবেন? নিদেনপক্ষে রিপোর্টার? ডেস্কে নাইট ডিউটি দিলে আমার খুব কষ্ট হয়।

কথাটা বোকার মত বললাম। একথার উত্তরে কেউ যদি বলে, চাকরি ছেড়ে দাও তাহলে বলার কিছু নেই। তরুণদা বললেন ঃ তোকে বিলেত পাঠানোয় অনেকের হিংসে হয়েছে। এখন তোকে কিছু করা যাবে না।

হিংসা যে হয়েছে সে কথা বুঝতেই পারলাম। কেউ কেউ ভেবেছিল চিঠি লিখলে আমার ফেলোশিপ বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন ইনজাংশন করে মামলাবাজরা যে কোন ভাল উদ্যোগ বানচাল করে দেয়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হল না। আমি কোর্স শেষ করে সার্টিফিকেট নিয়ে, ইওরোপ মধ্য প্রাচ্য চষে তবে দেশে ফিরলাম। গিয়েছিলাম চোখ না ফোটা বিড়াল শাবকের মত। অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে। ফিরলাম অভিজ্ঞ ভূপর্যটকের মত। গোটা ইওরোপ ও আর মধ্য এশিয়ার মানচিত্র আমার মুখস্থ।

সাব-এডিটর প্রদ্যোৎদা বললেন ঃ তুমি বলেছিলে আনন্দবাজারে তোমার কে যেন সোর্স আছে—

ঃ বিনোদ বসু।

ঃ তাহলে তোমার ভাবনা কী, তুমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আনন্দবাজারে যাবার চেষ্টা করো।

আমি সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে দক্ষিণাদা আমায় জানালেন, আমাকে রিপোর্টার করার আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। আমাকে করা হয়েছে জুনিয়র সাবএডিটর। বেতন ও ভাতা মিলিয়ে তিনশ টাকার মত পাবো।

ইংলন্ড থেকে যে পাউন্ড বাঁচিয়ে ছিলাম তা থেকে ইওরোপ সফরে দুশো পাউন্ডের মত খরচ হয়েছে। আমার কাছে তখনও আরও একশ পাউণ্ড আছে। পনের টাকা এক পাউন্ডের দাম। অর্থাৎ আমি ১৫০০ টাকার মালিক। সেই টাকায় আমার অন্তত এক বছর চলে যাবে। দরকার হলে আমি আরও কিছু টাকা জমিয়ে আবার ইংলণ্ড পাড়ি দিতে পারি।

দক্ষিণাদা বললেন ঃ অনীতার স্টোরিটা তুমি যুগান্তরে দিলে না কেন?

আমি বললাম ঃ ভাবলাম ইংরাজিতে দিলে অনীতা ও ইন্ডিয়ান এমব্যাসির চোখে পড়বে।

দক্ষিণাদা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ কিন্তু তুমি যুগান্তরের স্টাফ।

আমি চুপ করে রইলাম। অতশত বুঝিনি। ভেবেছিলাম, সব লেখাই তো যুগান্তরে দেই, একটা না হয় অমৃতবাজারে পাঠালাম। দক্ষিণাদা একটু পরে আবার স্বাভাবিক ভাবে বললেন ঃ তোমার লেখার সব টাকা তোমার বাবা এসে নিয়ে গেছেন।

বিলেত থেকে ফেরার এক সপ্তাহ পরে গোবরডাঙ্গায় গেলাম বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ছোট বোন গায়ত্রীর জন্য একটি মামুলি কোট ছাড়া আর কারও জন্য কিছু আনিনি। জেনিভা থেকে একটি রিস্টওয়াচ কিনেছিলাম ছোট দাদা-বউদির মেয়ে গীতুর জন্য। কারণ যাবার আগে ছোট বউদি বলে দিয়েছিলেন।

আটমাস বিদেশে কাটাবার পর কলকাতা এয়ারপোর্টে নামলেই বিরোধাভাস চোখে পড়ে। ভি আই পি রোড তখনও হয়নি। এয়ারপোর্ট থেকে নাগের বাজার লেকটাউন হয়ে কলকাতার রাস্তাটি হতশ্রী। শহরে আবর্জনা বেশি করে চোখে লাগে। মানুষ গুলোকে রুগ্‌ণ, অপুষ্ট ও অসহায় বলে মনে হয়। সেই ঝকঝকে ভাবটা শহরের রাস্তাঘাট, দোকানপাটেও নেই, মানুষের চেহারাতেও নেই। শিয়ালদা স্টশন, লোকাল ট্রেনের যাত্রী আর ঘিঞ্জি জনবসতি আমার কাছে আরও বিসদৃশ ঠেকল। আর গ্রামে পা দিয়ে মনে হল গ্রামের মানুষ যেন আরও গরিব হয়ে গেছে।

গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে হাঁটতে হাটতেই বাড়ি ফিরলাম। স্টেশনের পশ্চিমদিক থেকে এই রাস্তাটা ষষ্ঠীতলার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তাধরে আমার বাড়ি হাঁটাপথে দশ মিনিট। এক কিলোমিটারের মত। এখন রিকশ হয়েছে। একটা সময় গরুর গাড়ি ও সাইকেল ছাড়া কিছুই ছিল না। দুপাশে গভীর জঙ্গল। আম কাঁঠাল লিচু বাগান। ফলের সময় মাচা বেঁধে সারা রাত ধরে খটখট আওয়াজ করে বাদুড় তাড়াত লিচুর ব্যাপারীরা। ভোরে মর্নিং স্কুলের সময় লিচু তলা খুঁজে তবে স্কুলে যেতাম। যদি কিছু

অক্ষত পাকালিচু মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকে।

একটু এগুলেই গলায় দড়ি বাগান। এই বাগানে একাধিক লোক গলায় দড়ি দিয়েছে। একবার স্কুলে যাবার সময় গ্রামের কানা পঞ্চু বলে একটি লোককে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা জঙ্গল থেকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছিল। দুটি বারবণিতার সঙ্গে সকাল দশটার সময় কানা পঞ্চু দিশি মদ খাচ্ছিল। ধরা পড়ে তার উলটে চোটপাট। আমি ফুর্তি করছি, তাতে তোদের কী? দাঁড়া তোদের বাবাকে গিয়ে বলছি।

সে দৃশ্যটা মনে করতেই এত বছর পরে হাসি এল।

সেসব ঝোপজঙ্গল উঠে গিয়ে এখন সেখানে ঘনবসতি রিফিউজি কলোনী।

এই কলোনি ছাড়ালেই আমাদের সমাদ্দারপাড়া ওরফে যুগীপাড়া।

বাড়ির পাশে রাস্তার ওপর কতগুলি ময়লা ফ্রক পরা মেয়ে খেলা করছিল। তার মধ্যে একটি আট-ন, বছরের রোগা মেয়ে আমাকে দেখে হেসে দৌড়ে গলির ভেতর দিয়ে বাড়ি ঢুকে গেল।

আমি চিনতে পারলাম, আমার ছোটবোন খুকু অর্থাৎ গায়ত্রী।

মা, মা, দাদা এসেছে। খুকু চেঁচিয়ে মাকে ডাকল।

মা রান্না করতে করতে বেরিয়ে এলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সেই দুই ঘরের ছোট্ট বাড়ির উঠোন পাড়া প্রতিবেশীর ভিড়ে ভরে উঠল। তারা জীবনে প্রথম একজন বিলেত ফেরত মানুষকে স্বচক্ষে দেখতে এসেছে। যে ছেলে নাকি এ পাড়াতেই বড় হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে লোকজনের ভিড় পাতলা হয়ে গেল। বাবা বাড়ি ছিলেন না, ফিরলেন।

কালী এসেছে নাকি?

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

কিন্তু একী চেহারা হয়েছে বাবার। রোগা চেহারা এখনও আরও শীর্ণতর দেখাচ্ছে। মাথার চুলে অনেকখানি পাক ধরেছে।

আমি বললাম ঃ কেমন আছ?

বাবা কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকে মায়ের দিকে তাকিয়ে গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললেন। তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে দুহাত দিয়ে গেঞ্জিটা উঁচু করে ধরতেই আমি আঁতকে উঠলাম। বাবার গোটা পিঠ জুড়ে দগদগে ক্ষতচিহ্ন। ক্ষত শুকিয়ে গেছে। কিন্তু পিঠের চামড়া বিশ্রীভাবে কুঁচকানো। পিঠের মসৃণ ত্বকটি উঠে গিয়ে শাদা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। আমি চোখ বুজলাম।

॥ একুশ ॥

নিভে যায় বার বার

মা বললেন ঃ আজ থেকে ছ মাস আগে এক অন্ধকার রাতে বাবা যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন গলির মোড়ে দুজন লোক পিছন থেকে তাঁর পিঠে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দেয়। অ্যাসিড ওঁর মুখে ঢেলে দিয়ে মুখটা বিকৃত করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে দুটো চোখও তারা অন্ধ করে দিত।

ওরা এসে তাঁকে জাপটে ধরতেই তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতল তারা পিঠে ঢেলে দেয়।

ঃ আমায় তো একথা জানাওনি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মা বললেন ঃ সবাই বারণ করল তোমাকে জানাতে। বলল ঃ ছেলে অল্পদিনের জন্য বিলেত গেছে। সেখানে খবর দিয়ে কী হবে? আসতে তো আর পারবে না। মিছিমিছি উদ্বেগে ছটফট করবে।

ঃ কে করল অমন কাজ? কেন?

মা বললেন, পুলিশ দুজনকে ধরে চালান দিয়েছিল। তারা জামিনে খালাস আছে। উনিতো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান হয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মাসখানেক পর ছাড়া পেয়েছেন।

পুলিশ কাকে ধরল?

মা যাদের নাম করলেন তারা আমাদের প্রতিবেশী।

বাবার সন্দেহ এই ঘটনার পিছনে রয়েছে আমাদেরই একজন জ্ঞাতি। যে জড়িত আছে জুয়ো আর চোরাই চালানের মধ্যে। তাদের সন্দেহ আমি যুগান্তরে তাদের খবর ছাপিয়ে দিয়েছি। সে খবরের সূত্র বাবা। খবরটি প্রকাশিত হবার পর পুলিশ রেইড করে তাদের আড্ডায়, তাই আমাকে না পেয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য বাবাকেই—

আমি শিউরে উঠলাম।

বাবা বললেন ঃ মামলা যাতে তুলে নেই তার জন্য হুমকি দিচ্ছে ওরা। ওরা এখন নিতাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের এখান থেকে হঠাতে চাইছে। আমাদের অন্য একটা বাড়িতে নিয়ে চলো কালী। দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে একলা থাকি। এখানে থাব-তে আর একদণ্ড ভরসা পাচ্ছি না।

আমি তারপরদিনই গোবরডাঙ্গায় বাড়ি ভাড়া খুঁজতে লাগলাম। অন্য পাড়ায় দুএকটা ঘর খালি আছে। কিন্তু সবাই এড়িয়ে গেল। কিছুদিন পরে খোঁজ নিও। একটু ভেবে দেখি এসব বলে তারা পাশ কাটিয়ে গেল। আমি অন্তত তিন-চারটে বাড়িতে গিয়ে ভাড়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করলাম। কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি হল না।

দুদিন দেশে থেকে মায়ের হাতে সংসার খরচের কিছু টাকা দিয়ে খুব উদ্বিগ্ন মনে কলকাতায় ফিরলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম কোন কারণে গোবরডাঙ্গার কেউ বাবাকে বাড়িভাড়া দিতে রাজি নয়। হয়তো তাদের আশংকা বাবা এক দুষ্টচক্রের শিকার। তাঁকে বাড়ি ভাড়া দিলে তাদের ওপর হয়তো চাপ আসবে।

কিন্তু বাবার প্রতি নৃশংস আক্রমণের পিছনে যে খবরের কাগজের রিপোর্ট এটা মানতে মন চাইল না। মফঃস্বল সংবাদদাতা হিসাবে খবর সংগ্রহ ও লেখার পদ্ধতিগুলো তখনও জানতাম না। সাধারণত সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানের খবরই পাঠাতাম। ঘটনা দুর্ঘটনার খবরও পাঠিয়েছি কিন্তু সরকারি সূত্র থেকে তা সংগ্রহ করিনি। সীমান্ত এলাকা হিসাবে ওই অঞ্চলের অর্থনীতি চোরাই চালানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। অভাবের জ্বালায় বাবাও কয়েকবার বাক্সভর্তি সুপারি কলকাতার আড়তে পৌঁছে দিতে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তারপর থেকে তিনি আর ও পথ মাড়াননি। আমি চোরাই চালানের

উপর একটি সাধারণ খবর লিখেছিলাম একথা সত্য। কিন্তু সেও তো আমার গোবরডাঙ্গা ছাড়ার ছ মাস আগের ঘটনা। সেই রাগ পুষে রেখে বাবাকে কেন আক্রমণ করবে ওরা? তবে কী চোরাই চালানকারীদের সঙ্গে সংশ্রব বর্জন করতে গিয়েই এই বিপত্তি। আমি তো তারপর অনেকদিন দেশে ছিলাম।

কলকাতায় গিয়ে আমি এস পি হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলাম।

তিনি বললেন, মামলা এখন বারাসত কোর্টে। ম্যাটারটা সাব জুডিস। পুলিশের আর কিছু করার নেই।

ঃ তবু পুলিশ তো চেষ্টা করতে পারে দোষীরা যাতে সাজা পায়।

ঃ এটা নির্ভর করছে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর। সাক্ষীরা যাতে ঠিক সময় আদালতে হাজিরা দেয় তার ব্যবস্থা করুন।

প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল একজন মাত্র লোক। নাথদেরই এক শরিক। তাকে আমরা ভুতোর মা বলতাম। বাবার চিৎকার শুনে সে প্রথম বেরিয়ে আসে এবং দুষ্কৃতীদের পালিয়ে যেতে দেখে। একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন ঃ আসামীদের সাজা দেওয়া এই কেসে শক্ত। অন্ধকার রাতে একজন বয়স্ক মহিলা যে সঠিক আসামীদের দেখেছিলেন এ সম্পর্কে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল সন্দেহের আঙুল তুলে দেখাতে পারে। আসামীরা বেনিফিট অব ডাউট পেয়ে যাবে।

ঃ তাহলে কী করা?

ঃ আপনাকে আলাদা উকিল দিতে হবে। কোর্ট ইন্সপেকটরের ওপর ভরসা করলে চলবে না।

উকিল দেওয়া মানে আবার খরচের ধাক্কা। আমি ঠিক করলাম, গোবরডাঙ্গায় যখন বাড়ি পেলাম না তখন কলকাতাতেই বাসা করবো। রামমোহন রায় রোডে আরও কয়েক বছর থাকলে কিছু পয়সা জমত। শিশুদার রিটায়ার হতে এখনও দেরী আছে। তার আগে ঘর ছাড়ার দরকার হচ্ছে না। কিন্তু উপায় নেই। দুটো বাসা করলে যুগান্তরের বেতন থেকে কুলবে না। আনন্দবাজার একমাত্র কাগজ যারা প্রথম বেতন কমিশনের নির্দেশ মত এ ক্যাটাগরিতে পড়েছে। যুগান্তর বি ক্যাটাগরি। দুই গ্রেডের মধ্যে দেড়শ টাকার মত তফাৎ।

দেড়শ টাকায় আমার কলকাতায় একটা বাসা হয়ে যাবে।

একদা আনন্দবাজারে

একদিন দুরু দুরু বুকে আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে বিনোদ বসুর সঙ্গে দেখা করলাম।

বিলেত থেকে খবরের কাগজের ট্রেনিং নিয়ে আসাটা অতিরিক্ত যোগ্যতা। আমার মৌলিক যোগ্যতা বলে যা বিবেচিত হবে তা আমার লেখার ক্ষমতা। তখনও পর্যন্ত আমার অনেক গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব লেখার ক্লিপিং সঙ্গে নিলাম।

আর সঙ্গে নিলাম আমার প্রথম বই 'দেখা-অদেখা'। যা আমার বিলাত প্রবাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

দেখা-অদেখার প্রকাশক এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। এই প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা

সস্ত্রীক আমেরিকায় চলে যাওয়ায় তার ভাই মৃণাল দত্ত প্রকাশনীটি দেখত। মৃণাল গোবরডাঙ্গা স্কুলে কিছুদিন পড়েছিল। সেখানে কয়েকবছর ছিল। কলকাতায় এসে সেই সম্পর্কটি আবার ঝালিয়ে নিলাম। ১৯৫৯ সালের মে থেকে ১৯৬০ সালের এপ্রিল এই এক বছর আমি নিয়মিত কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে এশিয়া পাবলিশিং এ যেতাম। মৃণালই আমার প্রথম বই প্রকাশে উৎসাহিত হয়। দর্পণ-সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি রম্যরচনা নিয়ে দেখা-অদেখা বার হয়। ওই বই এর প্রচ্ছদ শিল্পী দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছাকাছি সময় বিলেতে যান তিনি সেখানে পাকাপাকি বাস করছেন না ফিরে এসেছেন তা জানি না।

দেখা-অদেখার প্রকাশকাল নববর্ষ ১৩৬৭। বইটির নামকরণ করে দেন যুগান্তরের প্রদ্যোৎদা বা প্রদ্যোৎ মিত্র। ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের মধ্যে আমার সঙ্গে গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে জহর বকসির। জহরের মত অমন খোলা মনের নিষ্কলুষ ছেলে আমি কম দেখেছি। সে রানীগঞ্জ কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে এসেছে। জহর আমার দেখা-অদেখার পাণ্ডুলিপি কপি করে দিয়েছিল। তার হাতের লেখা মুক্তোর মত।

দেখা-অদেখার একটি কপি হাতে করে বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বইটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বিনোদবাবু বললেন ঃ এর মধ্যে বই লিখে ফেলেছেন? খুব অপরাধ করেছি এমন মুখের ভাব করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিনোদবাবু বললেন ঃ বসুন।

বসলাম।

যুগান্তর ছাড়বেন কেন?

টাকার জন্য একথা তো বলতে পারি না। বললাম, আমার কিন্তু ছোটবেলা থেকে আনন্দবাজারে ঢোকার ইচ্ছে। আমি লিখিটিখি তাই মনে হয় মনের দিক থেকে আনন্দবাজার বেশি স্যুট করবে।

সন্তোষবাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে?

আলাপ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বিলেত যাবার আগে দেখাও করেছিলাম। তিনি আমার স্কলারশিপের খবর ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। সমস্ত এডিটরিয়াল ভিসিসন তিনিই নিয়ে থাকেন। আমি বলে রেখে দেবখন।

সন্তোষবাবু তখন পাইকপাড়ার বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে দেনা ব্যাঙ্কের ওপরের ফ্ল্যাটে চলে এসেছেন।

আমি তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। ওঁকেও দিলাম দেখা-অদেখার এক কপি। পাতা উলটে দেখে বললেন ঃ অনেকগুলো লেখাই পড়েছি মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে কয়েকটি লেখা বেরিয়েছে। দর্পণে বেরিয়েছে অনেকগুলি লেখা। সন্তোষবাবু বললেন ঃ তাই হবে। কোথাও কোন ভাল লেখা নজরে পড়লে মনে রেখে দেই। মনে হচ্ছে তোমার সব লেখা নামে বেরোয়নি।

ঃ ঠিক বলেছেন। দর্পণে একটা সিরিজ লিখতাম বেরুতো ঈশ্বর গুপ্ত নামে।

ঃ ও। সন্তোষবাবু অন্যমনস্কভাবে বই এর পাতা ওলটাচ্ছেন। সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালেন একটা।

তারপর বললেন ঃ হ্যাঁ এবার বলো।

ঃ বিনোদবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

ঃ হ্যাঁ, দেখো, এখানে আসবে? এখানে কিন্তু ভীষণ ক্লিক।

কোন কোন সংবাদপত্রের ক্লিক সাংবাদিক মহলে ওপেন সিক্রেট। আজ অমুক বাবুর গোষ্ঠী ক্ষমতায়। কাল তমুক বাবুর গোষ্ঠী ক্ষমতায়।

এসব অল্প দিনের মধ্যেই কানে এসেছিল। শুনেছিলাম, আনন্দবাজারে এটা বেশি বললাম ঃ আমি কোন দলে থাকব না। আমি একজন যথার্থ প্রফেশনাল হতে চাই। সেটা কী করে হতে হয় ইংলন্ড থেকে সেটাই শিখে এসেছি।

সন্তোষবাবু কোন মন্তব্য করলেন না। বললেন ঃ তুমি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে জয়েন করো। ওখানে আমাদের লোকের দরকার।

আমি বললাম ঃ দেখুন, আমি বাংলায় যত জোর পাই, ইংরাজি ভাষার ওপর ততখানি জোর পাই না। বাংলায় আমি ভাষাকে দোমড়াতে মোচড়াতে পারি। ইংরাজিতে তা পারি না। কাজ চালিয়ে দেব কিন্তু ভাষা দিয়ে লোকের নজর কাড়তে পারব না। তাছাড়া বাংলা সাংবাদিকতা নিয়ে আমার কিছু চিন্তা-ভাবনাও আছে।

স্তাবকতা শোনাতে পারে এই ভেবে বললাম না, যে আপনি তো ইংরাজির ছাত্র। ইংরাজি সাংবাদিকতায় সফল। তবে কেন বাংলায় এসেছেন? কারণ ভাষার প্রতি ভালবাসা। আমারও তাই। আমি সারাজীবন বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাংবাদিকতার সেবা করে যেতে চাই। আমাকে এ সুযোগ দিন।

কিছুদিনের মধ্যেই যুগান্তরে একটা ফোন পেলাম। 'আমি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ডেপুটি চিফ রিপোর্টার বিজয় রায় বলছি। আপনি কি একবার আজ রাতের দিকে আনন্দবাজারে আসতে পারবেন?

আমি বললাম ঃ নটার সময় আমার শিফট ডিউটি শেষ হবে। তখন যাবো।

তিনি বললেন ঃ তখন বড় রাত হয়ে যাবে। আপনি না হয় কাল আসুন।

পরদিন আনন্দবাজারে গিয়ে বিজয় রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। লম্বায় প্রায় ছ ফুট। সাহেবি পোশাক পরা। আমায় নিয়ে একটি ঘরে গেলেন। বললেন কবে জয়েন করতে পারবেন ? এক মাসের নোটিশ তো দিতে হবে। তার আগে বলুন কোন পোস্টে জয়েন করতে চান? ফিচার এডিটর না স্টাফ রিপোর্টার?

স্টাফ রিপোর্টার। তবে আমি আনন্দবাজারে জয়েন করতে চাই।

হ্যাঁ, আনন্দবাজারেই হবে। আপনি আগামীকাল সন্তোষবাবুর সঙ্গে তাঁর চেম্বারে দেখা করুন।

সন্তোষবাবু আগে বসতেন খোলা হলঘরে। একটি পিলারের সামনে। তাঁর মাথার ওপর একটি ঘড়ি ছিল। এখন যে তাঁর চেম্বার হয়েছে জানতাম না।

পরদিন দুপুরে তাঁর চেম্বারে দেখা করতেই তিনি বললেন ঃ তুমি পয়লা তারিখে মাইনে নিয়ে দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে জয়েন করো। কিন্তু এখানে জয়েন করার আগে যুগান্তরকে জানিও না। তাহলে তোমাকে যেতে দেবে না ওরা।

সন্তোষকুমার ঘোষের কথা মত বিনা নোটিশেই আনন্দবাজারে জয়েন করেছিলাম। সন্তোষবাবু বলেছিলেন, আমি দক্ষিণাদাকে বলে দিচ্ছি। সন্তোষবাবু আমার সামনে ফোন করে দক্ষিণাদাকে বলে দিলেন ঃ দক্ষিণাদা, পার্থকে আমি নিয়ে নিচ্ছি। ওপাশ থেকে কি কথা হল জানি না। সন্তোষ বাবুবললেন, আমি বলে দিয়েছি। তুমি আজ থেকে লেগে যাও।

আনন্দবাজারে জয়েন করলাম বটে কিন্তু টেনসনে পরপর কয়েক রাত ঘুমতে পারলাম না। একে বাড়ির ওই অবস্থা। তার ওপর এইভাবে যুগান্তর ছেড়ে দেওয়াটা বিবেক থেকে সায় দিল না। মনে হল একটা বিরাট অপরাধ করে ফেললাম। সেই সঙ্গে বোধ হয় ভুলও। সব খুলে তরুণবাবুকে একটি চিঠি দিলাম। কিন্তু শুনলাম তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমাকে আমার বন্ধু সুনীত মুখার্জি বলেছিল ঃ তুই ভুল করতে যাচ্ছিস। বিলেত থেকে ফেরার পর এত তাড়াতাড়ি তোর যুগান্তর ছাড়া উচিত হচ্ছে না।

আমি বললাম, এখনও গায়ে বিলেতের গন্ধ আছে তাই আনন্দবাজার খাতির করে আমাকে নিচ্ছে, পুরনো হয়ে গেলে আর নেবে না। তুই জানিস না, ওয়েজ বোর্ডের পর গত দেড়বছর ধরে ওরা একটা লোকও নেয়নি। আমি ওয়েজবোর্ডের পর প্রথম রিক্রুট।

ঃ তাহলে তুই ঝগড়া করে ছেড়ে দে—

ঃ ঝগড়া করবো কার সঙ্গে? দক্ষিণাদার সঙ্গে? ওঁর মত মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়?

আমি সঙ্গত কারণেই কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না আর নকল ঝগড়া করবো কেস তৈরি করার জন্য? ছি।

একথা ঠিক, সেদিন আনন্দবাজারে না ঢুকলে পরে আমি কোনদিনই আনন্দবাজারে ঢুকতে পারতাম না। আর আনন্দবাজারে না ঢুকলে আমার জীবনের অনেকগুলো দরজা খুলতই না। কিন্তু যুগান্তরে থেকেও আমার পক্ষে খারাপ হত না। সহকারী সম্পাদক যথাসময়তো হতেই পারতাম। কিন্তু অন্যদিকে যুগান্তর পরপর দুবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক সহকর্মীর মত আমিও মধ্যবয়সে বেকার হয়ে পড়তাম। যদিও তাদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে অনেকেই অন্যত্র পুনর্বাসন পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কী হত তা বলা মুশকিল।

কিন্তু যুগান্তর ছাড়ার অপরাধবোধের যে যন্ত্রণায় আমি সারাজীবন ধরে জ্বলেছি তা কোনও নিছক একটা চাকরি ছাড়ার জন্য নয়। আমার দুঃখটা থেকে গেল আমি তরুণবাবুকে দুঃখ দিয়েছি বলে। তিনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবেছিলেন। আমি ত্রিশ বছর ধরে মাঝেমাঝেই চিঠি লিখতাম তাঁকে। বলা বাহুল্য কোন জবাব আসত না। একবার আমি লিখেছিলাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও বারো বছর পর অপরাধী ছাড়া পায় এক সময়—আমি কি আপনার কাছে নরহত্যার চেয়েও বড় অপরাধ করেছি। তিনি আমাকে যে ক্ষমা করেননি তাঁর ঠাণ্ডা আচরণ দেখেই বুঝতে পারতাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হলে আমি নিজে গিয়ে আলাপ করতাম। তিনি একটু মৃদু হেসে

বলতেন ঃ কী ভাল আছিস? ব্যস এই পর্যন্তই।

আনন্দবাজারে আমাকে আন্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সন্তোষবাবু। আজকের আনন্দবাজারের দৌলতে যাঁরা বিশ্বজোড়া খ্যাতি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের অনেককে অসহায় অবস্থা থেকে সন্তোষবাবু প্রফেশনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর সেই অভিপ্রায়ই ছিল। কিন্তু তিনি সফল হননি। কারণ তেইশ বছর বয়সে স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে গিয়ে, ওয়েজবোর্ডের পর সরাসরি পাকা চাকরিতে ঢুকে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি ও দুতিন বছরের মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয় বই লিখে ফেলে আমি আমার ভাবমূর্তিকে জীবনের চেয়ে বড় করে ফেলেছিলাম। চাকুরিতে মালিকপক্ষও সব সময় হাই প্রোফাইলের কর্মচারীকে ঝুঁকি বলে মনে করেন। বিশেষ করে সে যদি একটু মাথা উঁচু করে চলতে চায়।

আমি হরিণের মত নিজের মাংসেই নিজের বৈরী হয়ে উঠলাম। একজন দুজন ছাড়া আমার সমবয়সী সহকর্মীরা আমাকে গ্রহণ করতে পারল না। আমি তাদের মাৎসর্যের শিকার হয়ে পড়লাম।

আমি বেশ বুঝতে পারতাম চিফ রিপোর্টার শিবদাসবাবু আমাকে পছন্দ করছেন না। এর কারণ অজ্ঞাত তবে কারণ ছাড়া কার্য হয় না। আমার অনুমান এর কারণ আমি সন্তোষবাবুর মাধ্যমে চাকরিতে ঢুকেছি। দুই ঃ তাঁর নিজের রিক্রুট করা দুজন রিপোর্টার ছিল। তাদের তখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। বছরখানেকের ওপর তারা ভাউচারে বেতন নিচ্ছে। তাদের চাকরি না হয়ে আমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলুম। তিন ঃ তিনি উত্তর কলকাতার এক রেস্টুরেন্টে রোজ সকালে যুগান্তরের কিছু রিপোর্টারের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন যিনি আমার বিলেত যা ওয়ায় বাগড়া দিয়েছিলেন। তিনি আমার সম্পর্কে কিছু বিরূপ কথা বলতে পারেন। এক কথায় আমি একটি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। এই প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনার চেষ্টা আমি বছরের পর বছর ধরে করে গিয়েছি। কিন্তু সফল হইনি।

নৌকো পুড়িয়ে দিয়ে আমি জলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছি। এখন সাঁতার কাটা ছাড়া আর উপায় নেই। আমি ঠিক করলাম কপালে যাই থাক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করে যেতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

আনন্দবাজারে দুই পর্বে ৩১ বছর ধরে কাজ না করলে আমি লড়াই করে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় তা জানতে পারতাম না। আনন্দবাজার আমাকে সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি, বিরল অভিজ্ঞতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সান্নিধ্যেই শুধু দেয়নি, আমাকে শিখিয়েছে সাংবাদিকতার প্রফেসনটির গুপ্ত রহস্য কোথায়? কোথায় পাঠক মন জয়ের চাবিকাঠি? সেই সঙ্গে শিখিয়েছে ধৈর্য আর সংযম। যুগান্তর আমায় চক্ষুদান করেছে; প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে আনন্দবাজার।

॥ বাইশ ॥

বিনোবাভাবের পদযাত্রা

আনন্দবাজারে আমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে আচার্য বিনোবা ভাবের পদযাত্রা কভার করা। এটি কিন্তু শিববাবুই আমাকে দিয়েছিলেন। সম্ভবত এটা ছিল আমার একধরনের পরীক্ষা।

রিপোর্টারদের সঙ্গে একজন করে ফোটোগ্রাফার যায়। আমার সঙ্গে গেলেন শম্ভু চ্যাটার্জি। তিনি প্রবীণ ফোটোগ্রাফার। প্রেস ফোটোগ্রাফার হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। অনেকের মতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর আলোকচিত্রী। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানা ব্যাপারে অর্থনষ্ট করতেন। বলাবাহুল্য সেসব সৎ কাজে নয়। তাই তিনি নিয়মিত অর্থকৃচ্ছতায় ভুগতেন। সে সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীরা আমাকে অবহিত করে দেন।

বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলন সম্পর্কে আমি ছাত্রজীবন থেকে উৎসাহী ছিলাম। সে সময় কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে ভূদান যজ্ঞ বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। আমি ঐ পত্রিকায় কয়েকবার লিখেছি। গান্ধীবাদী ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কলেজে পড়ার সময় আলাপ হয়। তিনি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুঙ্গেরের কাছে জামুই স্টেশন থেকে দশ কিলোমিটার দূরে খাদিগ্রামে ছাত্র শিবির করতেন। গান্ধীবাদ, সর্বোদয় ও ভূদান সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই ওই শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথম বছর কলেজ থেকে আমি একা ওই শিবিরে যাই। সেবার শিবিরে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী ছিলেন। নরেন দেব রাশভারী চেহারার মানুষ হলেও খুব সরস ব্যক্তিত্ব। আমি তাঁর কাছে দু একটি কবিতা সংশোধন করিয়ে নি। তাঁদের কন্যা নবনীতা তখন প্রেসিডেন্সির থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। আমি পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে।

মনে আছে রাতে রুটি খাওয়া নিয়ে শিবিরে কয়েকজন অনুযোগ করেছিল। নবনীতা শুনে বলেছিলেন ঃ মা, এরা লন্ডনে গেলে কী করবে। তখন আমি অত বড় করে ভাবতে শিখিনি। নবনীতা ভাবতেন।

খাদিগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুচেতা কৃপলনির দাদা ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি খাদি গ্রামে একটি কুটিরে থাকতেন। বিশাল এলাকা জুড়ে গ্রামের মানুষদের নিয়ে শ্রমদান ও নঈ তালিম শিক্ষার মাধ্যমে তিনি গ্রামে জাগরণ এনেছিলেন। খাদিগ্রামে গান্ধীচর্চার তালিম নিয়ে আমি কলেজে পড়ার সময় আর একটি বৃহত্তর গান্ধী যুব শিবিরে যোগ দিতে যাই বিন্ধ্য প্রদেশের ছতরপুরে।

তখন মে মাস। ১১২ ডিগ্রি গরমের মধ্যে একা গোবরডাঙ্গা থেকে ছতরপুর গিয়ে পৌঁছই। জায়গাটা খাজুরাহোর কাছে। ছতরপুরে প্রায় একমাস ছিলাম। তামিলনাড়ুর বিখ্যাত গান্ধীবাদী রামচন্দ্রন, গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই প্রমুখেরা এসেছিলেন। তবে খাদিগ্রাম শিবির আমায় এত আকৃষ্ট করত যে পরের বছর আমি কলেজ থেকে কুড়ি জন ছেলেকে নিয়ে ওই শিবিরে যোগ দিই। তখন থেকেই ভূদান সম্পর্কে অবহিত হই।

ভূদান যজ্ঞ সম্পর্কে আমি মনে করতাম আইন করার আগে এই আন্দোলন অনুকূল মানসিকতা তৈরি করছে। ভূমিহীন চাষীদের সমস্যা লোকের দৃষ্টিতে আসছে। এটাও কম সাফল্য নয়। সেই বিনোবা ভাবে বিহার সফর সেরে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছেন। খবরের কাগজের কাছে এটি বড় ইভেন্ট।

পূর্ণিয়া ও ইসলামপুর সীমান্তে বিনোবা পৌঁছলেন ভোরবেলা। তখন রাত চারটে। তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কয়েক হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিল।

বিনোবাকে আমি এই প্রথম দেখলাম। খালি গা। লম্বা একহারা চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ। গান্ধীজীকে আমি দেখিনি। কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে দেখলাম।

তিনি ইসলামপুরে ঢুকে একটি স্কুল বাড়িতে শিবির গাড়লেন। সেখানে আমরা সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তিনি বললেন ঃ চৈতন্যের দেশ বাংলায় এসেছি। বাংলার আছে প্রেমধর্ম। বাংলা আমাকে নিশ্চয়ই ফেরাবেনা। বিনোবাজী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বিনোবার খাদ্য তালিকা দেখে আমি অবাক হলাম। দিনের বেলা তাঁর খাদ্য মধু ও দই। কিন্তু স্বাস্থ্যটি ভাল রেখেছেন।

ইসলামপুরে ওই ভীড়ের মধ্যে একটি সুদর্শন ব্রহ্মচারী হঠাৎ আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল ঃ পার্থ না?

আমি চিনলাম ঃ আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত অসীম। ও ভাল গান গাইত। কলেজ সোস্যালে গেয়েছিল ঃ বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও। আমি বললাম, অসীম, তুমি এখানে?

অসীম বলল ঃ চুপ। আমার নাম এখন ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য।

অসীমের এই পরিবর্তন দেখে অবাক হলাম না। অসীম একটু ব্যতিক্রমী ছেলে ছিল। এই ধরনের ছেলেরাই স্বদেশী যুগে জন্মালে বিপ্লবী হয়ে যেত।

অসীম আমাকে একটু দূরে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলল ঃ তুমি বিলেত গিয়েছিলে তা শুনেছি। তুমি এখন কোথায় আছ?

আমি বললাম ঃ আমি আনন্দবাজারে রিপোর্টার হিসাবে জয়েন করেছি। এখানে বিনোবা ভাবে কভার করতে এসেছি। তুমি এখানে কী করছ অসীম?

অসীম বলল ঃ আমি তো ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেই সদগুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

গুরুর সন্ধান পেয়েছ?

নির্জনে অনেককাল ধরে তপস্যা করেছি। গুরুদেবই নামকরণ করেছেন ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য।

আমি বললাম ঃ তা এখানে কী করে?

অসীম বলল ঃ বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনে যত বাঙালি গত বছর উত্তরবঙ্গে রিফিউজি হয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য আমি উত্তরবঙ্গে চলে আসি। তারপর থেকে উত্তরবঙ্গেই আছি। শুনলাম, বিনোবা আসছেন তাই তাঁকে দেখতে এসেছি। আমি বললাম সন্ন্যাসীর জীবন কেমন লাগাছে? অসীম বলেছিল ঃ এ বড় কঠিন জীবন পার্থ। সব কিছু ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু কাম জয় করতে পারিনি এখনও।

তোমাকে বলি গৃহীর চেয়ে সন্ন্যাসীর কাছে নারীর প্রলোভন অনেক বেশি।

অসীমের সঙ্গে এর কয়েকবছর পরে আমার যোগাযোগ হয়। সে হরিপালে এসে রাজনীতি শুরু করে। তারপর ফরোয়ার্ড ব্লকের এম এল এ. হয়। তারপরে শুনেছিলাম সে একটি স্কুল চালায়।

বিনোবা ভাবের সঙ্গে সফরে স্টেটসম্যানের রিপোর্টার অসীম রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। অসীম রায় তখন গল্প উপন্যাস লিখে বুদ্ধিজীবী মহলে আদৃত হয়েছেন। তিনি ভদ্র এবং সংযতবাক। রিপোর্টারদের সহজাত গুণ প্রগলভতা। অনেক কিছু বিষয় নিয়ে বক বক করা এবং একটু সুযোগ পেলেই রাজা উজির মারা। অসীমবাবু সে দলের লোক ছিলেন না। আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোক একজন লোনার। তখন ভাবিনি অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হবে।

বিনোবা ভাবের সফরের রিপোর্ট আমি ইসলামপুর পোস্ট অফিস থেকে প্রেস টেলিগ্রাম করে পাঠাই। তখন মোর্স কোডে টেলিগ্রাফ যেত। অর্থাৎ টরে টক্কা করে সংকেতে খবর যেত। এতে অনেক সময় লাগত। তার ওপর আমাদের বাংলা লেখার স্টাইল বজায় রাখার জন্য বাংলায় রোমান হরফে টেলিগ্রাফ পাঠাতাম। ট্রাঙ্ককলের জন্য কল বুক করে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হত।

অনেক সময় সারাদিনেও কল ম্যাচিওর করত না। তবে বিনোবার কভারেজের জন্য ইসলামপুর পোস্ট অফিসে সাময়িকভাবে টেলিপ্রিন্টার বসানো হয়েছিল। খবর পাঠাতে অসুবিধা হয়নি।

বিনোবা ভাবের কভারেজ শেষ করে প্লেনে ফিরব বলে আমরা আমবাড়ির দিকে যাচ্ছি। তখন প্রাইভেট কার্গো বিমান কলকাতা উত্তরবঙ্গ যাতায়াত করত। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকার মত ভাড়া ছিল।

আমরা স্টেটবাসে যাচ্ছিলাম। একটা জায়গায় বাস থামতে শম্ভুদা বললেন ঃ চ, চা খেয়ে আমি।

আমি বললাম, যদি বাস ছেড়ে দেয়?

পাগল হয়েছিল। এটা চা খাবার স্টপ। দেখছিস না সবাই নেমে যাচ্ছে। শম্ভুদা ক্যামেরা শুদ্ধ ব্যাগ বাসে রেখে নেমে গেলেন। তারপর চায়ের দোকানে বসে এ গল্প সে গল্প।

হঠাৎ দেখি আমাদের বাস স্টার্ট নিচ্ছে। শম্ভুদাকে বলতে তিনি রোককে রোককে বলতে বলতে ছুটে গেলেন।

কিন্তু বাস থামল না।

শম্ভুদা চোখে অন্ধকার দেখলেন। ওর মধ্যে ক্যামেরা। ক্যামেরায় এক্সপোজ করা ফিলম। অফিসের ক্যামেরা। তিনি কি চোর প্রতিপন্ন হবেন?

শম্ভুদা পাগলের মত একটা লরি থামিয়ে আমায় বললেন, উঠে পড়।

তারপর চালককে বললেন, সামনে একটা স্টেটবাস যাচ্ছে। যে করে হোক বাসটাকে ধরতে হবে। যত টাকা চাও দেব।

এইবার লরি ছুটতে শুরু করল।

আমার প্রতিমুহূর্তে ভয় করছিল এই বুঝি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়।

প্রায় বিশ মাইলের মত ছুটে বাসটাকে পাওয়া গেল। বাসটা তখন স্টপেজে থেমেছে। শম্ভুদা ছুটে গিয়ে দেখলেন ব্যাগ ঠিক আছে। তারপর কনডাকটরকে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিচে নিয়ে এলেন।

বললেন ঃ হারামজাদা, ছুঁচোর বাচ্চা। আমরা চা খেতে গেছি, এর মধ্যে হর্ন না দিয়ে বাস ছেড়ে দিয়েছিস। জানিস আমরা কে? আমি আনন্দবাজারের শম্ভু চ্যাটার্জি। তোর চাকরি আমি খাবই। আমি কলকাতায় গিয়ে তোদের চেয়ারম্যানকে গিয়ে কমপ্লেন করবো। লোকটি এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শম্ভুদার পায়ে ধরেছে।

স্যর, আমি বুঝতে পারিনি আপনি বাইরে ছিলেন। আপনি ক্ষমা করুন স্যর আর কখনও হবে না।

শম্ভুদা বললেন, আমার যে ক্ষতি করেছিস তার ক্ষতিপূরণ দে। একশ টাকা ছাড়। এই ড্রাইভারকে একশ টাকা দিয়ে নাক কান মূলে বল, আর কখনও এমন কাঁচা কাজ করবি না।

এই নাক কান মূলছি স্যার।

ব্যাগ থেকে একশ টাকার একটি নোট বার করে দিল কনডাক্টর। শম্ভুদা লরি ড্রাইভারকে টাকাটা দিয়ে বললেন ঃ মিষ্টি খেও।

বিনোবা ভাবের প্রথম দিন পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার খবর প্রথম পাতায় আমার নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাইলাইনে সেই প্রথম খবর প্রকাশিত হল। এরপর বহুবার বাইলাইনে আমার খবর বেরিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে বিনোবার খবর আর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। বিনোবা যখন কলকাতায় এলেন তখন গৌরকিশোর ঘোষ রিপোর্ট করেছিলেন। গৌরদা ব্যঙ্গ লেখায় সিদ্ধহস্ত। কেন জানি না, তিনি বিনোবার ভূদান আন্দোলন, তাঁর বক্তৃতা ও তাঁর সফরকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে রিপোর্ট করতে শুরু করেন। সে সময় কংগ্রেস সরকার বিনোবাকে সমর্থন করত। শুধু কম্যুনিস্টদের কাগজ স্বাধীনতাতেই ভূদানের বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশিত হত। জাতীয়তাবাদী দৈনিক আনন্দ বাজারের বিনোবা বিরোধী ভূমিকা দেখে আমার একটু অবাক লেগেছিল। কিন্তু আমি তখন এত জুনিয়র যে এনিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার আমার অধিকার ছিল না।

॥ তেইশ ॥
গ্রাম ছাড়া পথ ধরে

ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ বাবা একদিন রামমোহন রায় রোডের বাড়িতে এসে ছলো ছলো চোখে বললেন—আমি মরি দুঃখ নেই। কিন্তু তোমার মা বোনের ইজ্জৎ রাখতে হলে তোমাকে ওদের অন্য জায়গায় সরাতে হবেই।

আমি বললাম— কেন আবার কী হল?

— নিতাই-এর বউ আমাদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে গালাগাল। মামলার ব্যাপারেও কোন কিছু এগুচ্ছে না। আসামী পক্ষ নানা ছুতোয় তারিখ নিচ্ছে।

আমি বাবাকে বললাম—তুমি আমায় আর পনের দিন সময় দাও। নতুন চাকরিতে জয়েন করেছি। একদম সময় করে উঠতে পারছি না।

বাবাকে বিদেয় করে আমি বাড়ি খুঁজতে বেরুলাম। একটা বাড়ির সন্ধান পেলাম অশোক গড়ে, ডানলপ ব্রিজের কাছে। পুরো একতলা বাড়ি। বালিগঞ্জে বাড়িওয়ালা থাকেন। তিনি একশা টাকা ভাড়া চাইলেন। কিন্তু আমি আশি টাকার বেশি দিতে পারব না। কেটেকুটে নিয়ে হাতে পৌনে চারশ টাকার মত পাই।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী বরানগরে থাকতেন। তিনি একটি বাড়ির সন্ধান দিলেন বরানগরে। কিন্তু বেশি ভাড়া। টালা থেকে টালিগঞ্জ বাড়ির জন্য চষে ফেললাম।

অবশেষে একদিন খবরের কাগজে দেখলাম দমদম ঘুঘুডাঙ্গায় দু কামরার বাড়ি ভাড়া আছে।

বাড়ির ঠিকানা দেওয়া ছিল কেদারদাস লেন। সাউথ সিঁথি রোড জায়গাটা চেনা। নীহার গুপ্ত থাকতেন। ছাত্র জীবনের পরিচিত কানাইলাল দাস এম এল এ-র বাড়ি। তদুপরি আমার পিসতুতো দাদা ইছাপুরের সেজ পিসীমার বড় ছেলে লালাদা দীর্ঘকাল ভাড়া আছেন ডি গুপ্ত লেনে।

বাড়িটা দেখলাম গলির গলি তস্য গলি। এক ভদ্রলোক রিটায়ার করে দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন। নিচেটা ভাড়া দেবেন। উনি বলছেন দুটো ঘর। কিন্তু আসলে ঘর দেড়খানা। অ্যাসবেসটসের রান্নাঘর আর কলঘর। এলাকাটা নিরিবিলি। মশা ছাড়া তেমন উৎপাত নেই। দমদম জংশন স্টেশন হাঁটাপথে মাত্র পাঁচ মিনিট। আশী টাকা ভাড়া। এক মাসের ডিপোজিট। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিনই গিয়ে ভাড়ার টাকা ও অগ্রিম জমা দিয়ে চাবি পকেটে নিয়ে দমদদম জংশন স্টেশন থেকেই গোবরডাঙ্গা রওনা হয়ে গেলাম।

মাকে বললাম—তিনদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি মা। তোমরা তৈরি হও। পরশুদিন তোমাদের কলকাতায় নিয়ে যাবো।

মা বোধ হয় ভাবতে পারেননি, এত তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় বাসা করব। তাছাড়া গোবরডাঙ্গা থেকে কত লোকই তো কলকাতায় চাকরি করে। তারা হয় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে, না হয় কলকাতায় গিয়ে বউ নিয়ে আলাদা বাসা করে থাকে। গোটা পরিবার শুদ্ধ তুলে এই বাজারে কেউ কলকাতায় নিয়ে যায় না।

মা বললেন—তুমি এই বাজারে এত জনকে নিয়ে চালাতে পারবে?

আমি বললাম— তোমার আশীর্বাদ থাকলে পারব মা। তাছাড়া দুটো সংসার চালানো আমার পক্ষে খুব মুশকিল হবে। রামমোহন রায় রোডের বাসায় বেশি দিন তো থাকতে পারব না। একদিন না একদিন আমাকে আলাদা বাসা ভাড়া নিতেই হবে। তাই বাড়ি আমি ভাড়া নিয়ে নিয়েছি।

ঃ কোথায়?

ঃ ঘুঘুডাঙ্গায়। লালাদার বাড়ির কাছে। ও জায়গাটা পুরো শহর হয়ে ওঠেনি। তোমার খারাপ লাগবে না।

মেজতরফের নাচঘরে বসেছিলাম আমি ও ভবানী।

গত এক বছর ধরে ভবানী আমার আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছে। সেচ দফতরে পার্টটাইম কাজ করে পোস্ট অফিসে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। আমার বিলেত প্রবাস কালে

সে পোস্ট অফিস থেকে আমার জমা টাকা তুলে নিয়মিত মায়ের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। বাবার অ্যাকসিডেন্টটা হবার পর সে খোঁজখবর করেছে। নিজেও সে বিব্রত আছে কিছুটা। প্লুরিসি হওয়ায় পাঁচ-ছ মাস নষ্ট হয়েছে। আবার নতুন করে ইকনমিক্স অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আমার সঙ্গে একই সঙ্গে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেও সে এইবার সবে বি এ ফাইন্যাল দেবে।

আমি বললাম—কলকাতায় বাসা করতে হচ্ছে ভবানী। খুব আশা ছিল দেশের সঙ্গে কিছুতেই সম্পর্ক ত্যাগ করবো না। কিন্তু একটা বাড়ি ভাড়াও পেলাম না এত বড় গ্রামে।

ভবানী বলল— সব যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছে তাই না—আমরা যেভাবে জীবনটাকে গড়তে চাইছি। সেভাবে গড়তে পারছি না।

ভবানী বলল—আমাদের কলেজের একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মেয়েটির বাড়ি আঁধার-মানিকে। আঁধারমানিক বসিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম। গোবরডাঙ্গা থেকে বেশি দূর নয়। শিখা তার নাম। মেয়েটি কী যেন বলতে চায় আমাকে— বলতে পারে না।

আমি হেসে বললাম— মেয়েরা বলতে চায় বলতে পারে না কখন এমন হয়?

ভবানী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, তখনই হয় যখন তারা কারও মধ্যে কিছু খুঁজে পায়।

কী খুঁজে পায় বল তো?

আমি বললাম—তার মনের মানুষকে।

ভবানীর ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল।

সে বলল— ধেৎ, সেসব কিছু না। এমনি আসে। ক্লাস নোট চায়। এই পর্যন্ত। একদিন তোমার সঙ্গে শিখার আলাপ করিয়ে দেবো .....

গোবরডাঙ্গার বাস তুলে জিনিস পত্র নিয়ে কলকাতা যেতে হবে। ঠিক করলাম একটা লরি ভাড়া করবো। সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ লোক থাকলে ভাল হয়।

গোবরডাঙ্গা স্টেশনের কাছে থাকেন মোহিতদা। আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। বয়সে বড়। শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে বেশি বয়সে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করতাম।

যে সব অভিযানের মধ্যে নতুনত্ব আছে মোহিতদা সেইসব অভিযানে যেতে সব সময় রাজি। জিনিসপত্র শুদ্ধ এক নয়া উদ্বাস্তু পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে যেতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। অস্থাবর সম্পত্তি বলতে গোবরডাঙ্গায় তেমন কিছু ছিল না। বাবার বিয়ের খাট। ঠাকুমার পুরনো কাঠের সিন্দুক। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তৈজসপত্রের মধ্যে পেতল কাঁসা অনেক কিছুই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তবু ছিল গোটা দুয়েক ঘড়া। কিছু বাটি। রেকাব থালা, গামলা, পুজোর কালো পাথরের থালা। আসন চৌকি। ছেঁড়া বিছানা লেপ তোষক। মায়ের সারা অঙ্গে সোনা ছিল না। ভাই-বোনদেরও জামা কাপড়ের বাহুল্য ছিল না। ছিল পুরনো কাপড় বোঝাই গোটা দুয়েক তোরঙ্গ আর পুণ্যাহের দিনে ব্যবহার করা হত সিঁদুর মাখানো হাতবাক্স।

বাড়িটি বন্ধক দেওয়া। সুদে আসলে জমা টাকার পরিমাণ কম হবে না। তবে তা

বাবার হেফাজতেই এখনও আছে। যদিও যিনি বন্ধক নিয়েছেন তিনি প্রায়ই হুমকি দিচ্ছেন বাড়ি তিনি নীলামে চড়াবেন।

একটি ছেলেকে যোগাড় করা হল। সে মাসে আট টাকা ভাড়ায় বাড়িটিতে থাকবে। রক্ষণাবেক্ষণ করবে। লরির ওপর মালপত্র তোলা হল।

ভাই ও বোন লরিতে উঠল। বাবা বললেন— তোমরা লরিতে যাও আমি ট্রেনে যাবো।

লরি ছাড়ার সময় মা আর কান্না সামলাতে পারলেন না। ছেলেমানুষের মত ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমার নিজের চোখে দুঃখে জল আসে না। তবু আমার মন চকিতে বিষাদে ভরে উঠল। ক্রমে আমাদের দেওয়ানজি পুকুর পেরিয়ে ষষ্ঠীতলায় আমাদের পাঠশালার স্মৃতিজড়ানো যমুনার তীর ধরে বাজার হয়ে এগিয়ে চললাম। ডানদিকে জমিদার বাড়ি, মাঠ পেরিয়ে কালীবাড়ি বাঁ দিকে যমুনা সেতুর দিকে বাঁক নেবার সময় মা বার বার নমস্কার করতে লাগলেন কুলদেবতা রঘুনাথকে।

আমি শুধু বসে বসে ভাবছিলাম আমারই মত হাজার হাজার মানুষ চিরজন্মের মত এইভাবে জন্মভূমিকে ছেড়ে গিয়েছে। মাটির বন্ধন নাড়ির বন্ধনের মত। সেই বন্ধনকে কেটে তারা ছিন্নমূল, বৃন্তচ্যুত, কিন্তু তাদের এই পরিণতি কার পাপে? আমি তো সাম্প্রদায়িকতার শিকার নই। রাজনীতির শিকার নই। এক দুর্দম নিয়তি তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে আমায় নিয়ে চলেছে। কিছু দুষ্ট মানুষ শুধু উপলক্ষ। কিন্তু আমার এই নিঃশব্দ যাত্রা কি পলায়ন? আমার কি উচিত ছিল লড়াই করে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা? মাটি কামড়ে পড়ে থাকা? আমিই না একদিন ভাবতাম হারানো জেরুজালেমের মত দেওয়ানজি বাড়ির সেই দুটো ঘর আমি আবার উদ্ধার করব। আমরা ফিরে যাবো দেওয়ানজি বাড়িতে।

ক্ষীণস্রোতা যমুনার ওপর লরি উঠল। কেঁপে উঠল কাঠের সেতু। এক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল বহু দূরে কালাকুণ্ডর শ্মশান।

মরিলে ঝুলায়ে রেখ তমালেরই ডালে।

রঘুনাথের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলাম—সামনের দিকে যাত্রা শুরু করে আর পিছু হঠব না। বিদায় হে জন্মভূমি চিরবিদায়। শুধু আমার মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন দাহ হয় এই শ্মশানে। আমার চিতাভস্ম যেন মিশে যায় যমুনার ক্ষীণ স্রোতে তা হলেই আমার পরম শান্তি।

॥ চব্বিশ ॥

১৩, কেদার দাস লেন

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩, কেদার দাস লেনের দেড়খানা ঘরে শুরু হয়ে গেল আমার নতুন সংসার। বেতনের পুরো টাকাটাই খরচ হয়ে যেত সংসার চালাতে।

বোনকে ভর্তি করে দিলাম কর্পোরেশন স্কুলে। কাছাকাছি আর কোন ভাল বাংলা মিডিয়ামের প্রাইমারি ইস্কুল ছিল না। ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে পড়াতে গেলে বেতন ও বাসভাড়া মিলিয়ে অন্তত একশ টাকা খরচ।

ভাই তরুণ পড়ছিল গোবরডাঙ্গা স্কুলে। সে ক্লাশ সেভেনে উঠেছিল। কিন্তু বরাবর

স্কুল পালানো ছেলে, পড়াশোনায় তার তেমন মন ছিল না।

তাকে ভর্তি করে দিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্কুলে। বাড়িতে কোন কাজের লোক রাখার ক্ষমতা ছিল না। মা হাসি মুখে সংসারের যাবাতীয় কাজের দায়িত্ব তুলে নিলেন। বরং দেশে থাকতে তাঁকে দূরে টিউবওয়েল থেকে ঘড়া ঘড়া জল আনতে হত। কলকাতায় কল টিপলেই জল। ফ্যানের হাওয়া খাওয়া কারও অভ্যাস ছিল না। দক্ষিণ খোলা বাড়ি। পাশেই অনেকখানি ফাঁকা মাঠ। সেখানে তালগাছ। তার ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠত। আমার শোওয়ার ঘর থেকে দেখা যেত। ফ্যান কেনার মত টাকাও ছিল না তাই এই বাড়িতে বিনা ফ্যানেই ছিলাম।

আমি দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা একটা নাগাদ গিয়ে দমদম স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেনে উঠতাম। শিয়ালদা থেকে ট্রাম ধরে অফিসে যেতাম।

আমি চাকরিতে জয়েন করার কিছুদিনের মধ্যেই রানী এলিজাবেথ কলকাতা সফরে এলেন। ভেবেছিলাম, বিলেত ফেরৎ রিপোর্টার হিসাবে রানীর কলকাতা সফরের কোন একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি পাবো। পেলাম না। পুরীতে কি একটা ধর্মীয় মেলা হচ্ছিল। সন্তোষবাবু আমাকে পুরী পাঠাবার প্রস্তাব দিলেন। শিববাবু বললেন, ও তো এইমাত্র বিনোবা ভাবে করে এল। ওকে আবার বাইরে পাঠানো উচিত হবে না।

আমাকে বিভিন্ন লোকাল অনুষ্ঠান কভার করার কাজই বেশি দেওয়া হত। আমিও নিষ্ঠার সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠান কভার করার চেষ্টা করতাম।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অনেক অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছি। একদিন গেলাম দামোদরের সেতু শিলান্যাস অনুষ্ঠানে। বোম্বাই হাইওয়ে দিয়ে যেতে গেলে উলুবেড়িয়ার কাছে খেয়া পার হয়ে মেদিনীপুর যেতে হত। দামোদর সেতু হওয়ার ফলে দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ সুগম হল। ডাঃ রায়ের সল্টলেক প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠান আমি কভার করেছিলাম। দমদম থেকে উল্টোডাঙ্গা স্টেশন হয়ে শিয়ালদা যাবার পথে রোজ দেখতাম উলটোডাঙ্গা স্টেশনের পাশে বিরাট বিরাট পুকুরগুলো বোজানোর কাজ চলছে। তার পূর্ব দিকে বিশাল জলাশয় সমুদ্রের মত জল থই থই করছে। এই বিশাল জলাশায় বুজিয়ে লবণ হ্রদ প্রকল্প করার প্লান ডাঃ রায়ের মাথায় আসে। ওই বিশাল পরিমাণ ভেড়ি অধিগ্রহণ করা এক জটিল ব্যাপার ছিল। আমার জেঠতুতো দাদা সুশীল চট্টোপাধ্যায় তখন ২৪ পরগনার সেটলমেন্ট অফিসার হিসাবে অধিগ্রহণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

রামমোহন রায় রোডে তাঁর বাড়িতে প্রায় রোজই আমাকে অধিগ্রহণ পর্বের নানা বাধা বিপত্তির কথা বলতেন।

যুগোস্লাভিয়ার ইনভেস্ট ইমপোর্ট বলে একটি সংস্থা বিশ্ব টেন্ডারে লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধারের কাজ পেয়েছিল। ওই ফার্মটি ডানিয়ুব নদীর সন্নিহিত জলাভূমি উদ্ধার করে বড় শহর করে। হল্যান্ডেও তারা জলাভূমি উদ্ধারের কাজ করে।

গঙ্গা থেকে ড্রেজার দিয়ে পলিমাটি কেটে সেই মাটি মেশানো জল পাইপে করে এনে ভেড়িতে ফেলা হত। আর একটা পাইপ দিয়ে ভেড়ির জল ছেঁচে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত। ১৯৬২ সালের ২২ এপ্রিল উল্টোডাঙ্গার দিকে (এখন যেখানে AA AB ব্লক) কিছু জায়গা উদ্ধার করে সেখানে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়।

ডাঃ রায় অনুষ্ঠানের পর যখন চা খেতেন তখন খুব মুডে থাকতেন। নানা রসিকতা করতেন। সেদিনও অনুষ্ঠান শেষে চা মিষ্টির ব্যবস্থা ছিল। উনি ওই বয়সেও টপাটপ সন্দেশ মুখে পুরে দিতেন। আমাদের ডেকে বললেন—কই কাগজওয়ালারা, তোমরা খাও। না খেলে কাজ করবে কী করে? এই বলে হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলাল কবিতাটা আবৃত্তি করে গেলেন।

সে সময় নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন—ডাক্তার রায়ের দেখছি সব মনে আছে।

ডাঃ রায় সেদিনের বক্তৃতায় বলেছিলেন, সল্টলেক একাধারে হবে নতুন কলকাতা। কলকাতা থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালি হঠে যাচ্ছে। নতুন করে কারও পক্ষে সেখানে বাড়ি করা সম্ভব নয়। সল্টলেকে মধ্যবিত্ত বাঙালিরা বাস করতে পারবে। জমির দাম তাদের নাগালের মধ্যে রাখা হবে। আমার মানসকন্যা কল্যাণী, বলতে পারেন মানসপুত্র এই সল্টলেক।

এই সল্টলেকের কভারেজ করতে গিয়ে আমি একদিন ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে উঠলাম। আমাকে ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সুমন্ত সেনকে একদিন পাঠানো হল সল্টলেক রিক্লেমেশনের কাজ কেমন হচ্ছে দেখে রিপোর্ট করতে। আমাদের সঙ্গে ফোটোগ্রাফার দেওয়া হল শম্ভুদাকে।

যথাসময় ইনভেস্ট ইমপোর্ট-এর যুগোস্লাভ ইঞ্জিনিয়র আমাদের স্টিমারে করে ড্রেজারে নিয়ে গিয়ে তুললেন। ড্রেজার একটি স্টিমার। সামনে যন্ত্রচালিত বিশাল কোদাল। তা দিয়ে পলি কাটা হয়। ড্রেজারটি তখন বাগবাজারের কাছে মাঝগঙ্গা থেকে পলি তুলে সল্টলেকে পাঠাচ্ছে। ওদের কাজকর্ম দেখার পর কেবিনে বসে যখন চা খেতে খেতে ব্রিফিং হচ্ছে তখন কোট প্যান্ট পরা এক বয়স্ক ভারতীয় ভদ্রলোক ঢুকলেন। শম্ভুদা তার কানে কানে কী বলতে লাগলেন। ভদ্রলোক বসে ব্রিফিং শুনতে লাগলেন। সাহেবরাও তাঁকে সমীহ করতে লাগল।

ভদ্রলোক কে? আমি শম্ভুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

শম্ভুদা বললেন—পরে বলবো।

ভদ্রলোক কিন্তু আমাদের দুজনের কারও সঙ্গে কোন কথা বললেন না।

ঘুরিয়ে দেখানো শেষ হবার পর সাহেবরা বলল—আপনারা সবাই আমাদের ফ্ল্যাটে আসুন। ওখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেতে হবে বাগবাজার থেকে নিউ আলিপুর।

আগন্তুক ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। কিন্তু মৌলালি পর্যন্ত যাবার পর তিনি বললেন—আমার জরুরি কাজ আছে। আমি অফিস চলে যাচ্ছি।

অনেক অনুরোধ করলেন সাহেবরা। ভদ্রলোক শুনলেন না। চলে গেলেন।

অফিসে ফিরতেই শিববাবু রাগত ভঙ্গিতে বললেন—তুমি কি আমার চাকরিডা খাবা?

ঃ কেন কী হয়েছে দাদা।

ঃ হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। তোমারে সাহেবদের কাছে পাঠালাম

বিলেত ফেরত লোক, তুমি জাস্টিস করতে পারবা। কিন্তু তুমি পার্বতীবাবুরেই অসম্মান করলে?

ঃ কী হয়েছে একটু বুঝিয়ে বলুন।

শিববাবু যা বললেন তা শুনে আমি স্তম্ভিত! অফিসের পার্সোনেল অফিসার পার্বতী বাবুরই কনট্যাক্ট ওই সাহেবরা। সেই সুবাদে অনুরোধ—আমাদের কাজকর্ম দেখে একটা রিপোর্ট করে দিতে বলুন আপনার কাগজকে। পার্বতীবাবু দুই কাগজের চিফকে অনুরোধ করেছেন। তিনি একজন ক্ষমতাশালী অফিসার। তিনি বললে কার সাধ্য তা না রাখে।

কিন্তু তিনি ফিরে এসে শিববাবুকে তুলোধোনা করেছেন, কাকে পাঠিয়েছিলেন শিববাবু? আমাকে ইগনোর করল সাহেবদের সামনে।

আর ইগনোর করা মানে খোদ বড়সাহেবকে অপমান করা।

কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি উনিই পার্বতীবাবু। অফিসে সব সময় পার্বতীবাবুর নাম শুনি। কিন্তু তিনি বসেন ওপরের তলায়। তাঁকে কখনও দেখিনি। আমারও দরকার পড়েনি তাঁর কাছে যাওয়ার। শম্ভুদার ওপর রাগ হল। তাঁকে তো জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু তিনি বলেননি।

শিববাবু বললেন—যাও, পার্বতীবাবুর সঙ্গে দেখা করি ক্ষমা চেয়ে নাও। বলবা তুমি চিনতি পারনি, যা হয়েছে ক্ষমা করে দ্যান।

সুমন্তর কাছে গিয়ে বললাম, তুমিও চলো। একসঙ্গে গিয়ে ক্ষমা চাই।

সুমন্ত বলল—আমার চিফ তো আমাকে কিছু বলেননি। আমি যাবো কেন? তাছাড়া আমরা অন্যায় কিছু করিনি। তাঁরই উচিত ছিল নিজের পরিচয় দেওয়া।

সুমন্তকে নিয়ে যাওয়া গেল না। অগত্যা আমি একাই গেলাম।

ঘটনাটি থেকে আমি এক বিরাট শিক্ষা গ্রহণ করলাম। আমারই আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক যখন এলেন এবং সবাই যখন তাঁকে সমীহ করতে লাগল তখন আমার বোঝা উচিত ছিল ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আমার নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল। একজন রিপোর্টারের উচিত নিত্যনতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করা। তারপর থেকে আমি কোন পার্টিতে বা ছোটখাটো সমাবেশে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করতাম।

আমি দেখেছিলাম আনন্দবাজারে যোগ দেবার পর ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে দেখে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে বলেন—আমার নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমি আনন্দবাজারে আছি। আমি কিছুদিন আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের জার্নালে আপনার ছবি দেখি। আমিও কিছুদিন আগে ইংলন্ড থেকে ঘুরে এলাম।

নীরেনবাবু একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি। ছাত্রজীবন থেকে আমি তাঁর কবিতার ভক্ত। ১৯৫৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সফর করে আয়ুবের সঙ্গে শিরোনামে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আনন্দবাজারে লিখে আমার আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলা সাংবাদিকতায় ওই রিপোর্টাজ লেখা গুলি আধুনিক সাংবাদিকতার একটি মডেল হয়ে থাকবে। সেই নীরেনবাবু একজন অখ্যাত তরুণ সাংবাদিক সহকর্মীর সঙ্গে নিজে থেকে

আলাপ করেন। এটাও জন সংযোগের মডেল। আমাকে লন্ডনে অমৃতবাজারের প্রতিনিধি সুন্দর কাবাড়ি প্রায়ই বলতেন, আমরা এই প্রফেসনে প্রতিদিনই শিখি। কিন্তু শুধু প্রফেসন কেন, ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিটি মানুষের উচিত অভিজ্ঞতা থেকে নিরন্তর শিক্ষাগ্রহণ করা। তা না হলে অভিজ্ঞতার মানে কী হল।

আমি পার্বতীবাবুর কাছে গিয়ে অকপটে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তিনি যে ভীষণ রেগে ছিলেন, তা বুঝতে পারলাম। সেই থেকে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, তাঁকে আমার একজন সমর্থক করে তুলব। সেটা করতে আমার ৩৪ বছর সময় লেগেছিল।

আর একবার আমি অন্য একটি ঘটনায় ভুল বোঝাবুঝির শিকার হই। অবশ্য এক্ষেত্রে আমার দোষ যেটুকু ছিল তা হল শিষ্টাচার সম্পর্কে অসতর্কতা। এমন ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ আমার গোটা চাকরি জীবন ধরেই উঠেছে। একবার আমি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সেন্টার ফর মাস কম্যুনিকেশন স্টাডিজ বলে একটি এন জি ও করেছিলাম বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হল এই সংগঠনটির মধ্য দিয়ে আমি প্রতিষ্ঠান বিরোধী কাজ করেছি। শেষ পর্যন্ত সংগঠনটি বন্ধ করে দিয়ে নিষ্কৃতি পাই।

এটি আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পরের খণ্ডে একথা বলব।

পরবর্তীকালে আর একবার অভিযোগ তোলা হল স্বয়ং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দিয়ে। আমি নাকি আনন্দমার্গিদের আমন্ত্রণে ম্যানিলায় গিয়েছি। আসলে আমি সে সময় দ্বীপবাণী পত্রিকার আমন্ত্রণে আন্দামানের ডিগলিপুরে গিয়ে একমাস ধরে উপন্যাস লেখার মালমশলা যোগাড় করছিলাম। আমার তৎকালীন চিফ রিপোর্টার সুনীল বসু যখন একজন বিশ্বস্ত সিনিয়র সাংবাদিককে উদ্ধৃত করে এই অভিযোগ তুললেন, তখন আমি আমার পাশপোর্ট দেখিয়ে বললাম, আমি ভারতের বাইরে কোথাও যাইনি। বুদ্ধদেববাবুর কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়ে বললাম, তিনি সংবাদিক গুপ্তচরদের কথায় বিশ্বাস না করে যেন নিজেই খবর সংগ্রহ করেন।

একবার দমদমে সারদা মিশনের একটি অনুষ্ঠান কভার করতে গিয়েছিলাম। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিশনের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। সেজন্য মিশনের কোন কভারেজের ব্যাপারে যথেষ্টতা সতর্কতা অবলম্বন করা হত।

প্রেসের আসন মঞ্চের একদম সামনে। আমি সেখানে বসে নোট নিচ্ছিলাম। কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমার অনেকক্ষণ ধরে পা ঝুলিয়ে বসলে পা টন টন করে। তাই আমি মাঝে মাঝে এক পা কোলের ওপর রাখছিলাম। ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন কানাই সরকার মশাই। তিনি অফিসে ফিরে অভিযোগ করলেন—আমি সন্ন্যাসীদের দিকে জুতো দেখাচ্ছিলাম। কী গুরুতর অভিযোগ সেটা। এখানে অভিযোগ হজম করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ ক্ষমা চাইতে গেলে সন্ন্যাসীদের কাছেই যেতে হবে। সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এসব প্রসঙ্গ হয়তো এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিস্তারিত ভাবে আসবে। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য হল যে আমার বিরুদ্ধে কাদা ছিটানোর পালা কর্মজীবনের প্রথমেই শুরু হয়েছিল তা শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে আমার কৌশলহীনতাই দায়ী। বাংলা খবরের কাগজের জগতে চাকরি করে সাফল্য অর্জন করতে গেলে কৌশল-অপকৌশল এবং জনসংযোগ ভাল করে রপ্ত করতে হয়। এগুলি আমি শিখতে পারিনি। আমরা সাংবাদিকতার যে তত্ত্বের পাঠ

নিয়েছি তা যেন হিমবাহের উপরের অংশ মাত্র। কিন্তু যেখানে দেখেছি ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে আমার কোন দায় দায়িত্ব আছে সেখানে আমি সেই ভ্রান্তি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। কিন্তু যেটার অভাবে আমি পরিস্থিতির ঠিকমত সামাল দিতে পারিনি। সেটি হল আমি কোন সমর্থক গোষ্ঠী তৈরির দিকে নজর দিইনি।

আনন্দবাজার রিপোর্টিং-এ প্রথম যার সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্ক তৈরি হয় সে হল সুদেব রায়চৌধুরী।

লোকসেবকের সবুজ সাথী রমেন দাস তার কথা আমায় বলেছিলেন।

তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ এই ভাবে—

আপনি রমেন দাসকে চেনেন?

সুদেব বলেছিল—তাকে সবাই চেনে। তাই আমিও চিনি।

আমি পাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পকেটে করে ঢুকেছি, সুদেবের ও আর একজন সহকর্মীর তখনও চাকরি পাকা হয়নি। আমি ভেবেছিলাম সুদেব হয়তো এজন্য আমাকে আর একজনের মতই সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আলাপ হলে বুঝলাম এটা অমূলক। সে সময় যারা খবরের কাগজে ঢুকেছিল তাদের অনেকের পিছনে ছিল জীবন সংগ্রামের বহু অকথিত কাহিনী। অনেকে প্রকাশ করতে চান না যে অতীতেতাঁরা গরিব ছিলেন। এজন্য তাঁদের জীবন সংগ্রামের কথা জানলেও আমি তা প্রকাশ করলাম না। অবশ্য তারা আমার মত নিঃস্ব কেউই ছিল না। সুদেবের বাবা বাগেরহাট কোর্টে মোক্তারি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর উদ্বাস্তু হয়ে গোটা পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। সুদেবের মাথার ওপর দাদারা ছিলেন। কিন্তু সুদেবকে বি এ পাশ করেই স্কুল মাস্টারিতে ঢুকতে হয়। এরপর মিলিটারি অ্যাকাউন্টসে সে চাকরি পায়। কিন্তু সেখানে যোগ না দিয়ে সাংবাদিক হবার নেশায় সে বসুমতীতে যোগ দেয়। বসুমতী থেকে সে আনন্দবাজারে আসে।

সে তখন কর্পোরেশন কভার করত। কর্পোরেশনে সে ছিল কিংবদন্তি রিপোর্টার। সবার সঙ্গে তার খাতির। তার আলাপ জমাবার টেকনিক ছিল তার নিজস্ব। এ নিয়ে জনসংযোগে একটি নতুন তত্ত্ব লেখা যায় যাকে বলা যেতে পারে সুদেবীয় আলাপচারিতা তত্ত্ব।

সে শেষে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং শেষ যে বই পড়েছে তার দ্বারা প্রভাবিত হত।

একদিন তার সঙ্গে কর্পোরেশনে গিয়েছি। সুদেব আগের দিন একজন কাউন্সিলর সম্পর্কে বিরূপ কিছু হয়তো লিখেছে। ভদ্রলোক সুদেবকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন—সুদেববাবু চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। সুদেব সে কথায় বিচলিত হল না। ভাল ভাল কথা বলে তাঁকে বশীভূত করল। তারপর সেখান থেকে ঢুকল চিফ ইঞ্জিনিয়রের ঘরে।

তিনি কয়েক জন রাগী কাউন্সিলার ও কিছু স্টাফ দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। তাঁর টেবলে সিগারেটের টিন থাকত।

সুদেব ঘরে ঢুকেই ভূমিকা না করে বলল—চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না মিঃ মিত্র। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। তার ধারণা সুদেব তাঁর কোন দুর্নীতির কথা জানতে পেরেছে। তিনি বললেন—আরে সুদেব বাবু আসুন বসুন।

সুদেব চেয়ারে বসল। আমায় বসাল। তারপর টেবলে সিগারেটের টিন থেকে নিজে একটি সিগারেট নিল, আমায় একটি দিল। কাউন্সিলরদের সামনে টিনটি এভাবে ধরল যেন এটা তার নিজের টিন।

তাপর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল— নতুন খবর টবর ছাড়ুন তো দেখি...আমরা কী আগামী একশ বছরের মধ্যে জলটল পাবো না কী?

সুদেবের সময় কর্পোরেশনের খবর প্রতিদিনই ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড লিড হত। তার লেখা শিববাবুর পছন্দ হত না। তিনি তাকে বসিয়ে রাত দশটার সময় বলতেন—কী ছাইপাশ লিখিছ। লেখো আমি যা বলি—সুবোধ বালকের মত সুদেব ডিক্টেশন নিত।

শিববাবু হার্ড টাস্ক মাস্টার। রাত সাড়ে দশটার আগে অফিস ছাড়ার নিয়ম ছিল না কারও।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা দুজন বেরুতাম। আমি এক একদিন ট্রেনে ফিরতাম। সুদের থাকলে শ্যামবাজার পর্যন্ত যেতাম। সুদেব ওখান থেকে বরানগরের বাস ধরত। আমি দমদমের বাস ধরতাম।

মাঝে মাঝে সুদেব ভীষণ মজা করত। অফিস থেকে বার হয়ে সে বলত এই যে দু বন্ধু এক সঙ্গে হাঁটতে পারছি এটা আমাদের ভাগ্য। আমরা এইভাবেই এক সঙ্গে হাঁটবো। এমন সময় দেখা গেল বরানগরের একটি বাস আসছে।

সুদেব অমনি রোককে বলে চলন্ত বাসে উঠে পড়ে বলত—আজ চলি, কাল আবার দেখা হবে।

আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টিং বিভাগ ছিল একই জায়গায়। এপারে আনন্দবাজার। ওপারে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড। শুধু টাইপ রাইটার দেখে বোঝা যেত ওটা ইংরাজি কাগজ। ১৯৬১-৬২ পর্যন্ত এই দুই কাগজে রিপোর্টারদের মধ্যে বহু নামী ও দক্ষ সংবাদিকরা ছিলেন। যেমন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে খগেন দে সরকার, সুনীত ঘোষ, সুনীল বসু। আনন্দবাজারে অমিতাভ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ। ৬৩ সাল থেকে জুনিয়ররা আসতে শুরু করল। সুনীল বসু দিল্লি চলে গেলেন। খগেন দে সরকারও দিল্লি গেলেন। অমিতাভ দৌধুরী ডেপুটি নিউজ এডিটর হলেন। গৌরকিশোর ঘোষ সহকারী সম্পাদকের পদে প্রমোশন পেলেন।

আনন্দবাজারে ঢুকে দেখলাম বরুণ সেনগুপ্ত নিয়মিত রিপোর্টি বিভাগে ফ্রিল্যান্স করছেন। ওর কাজটা কী তা আমাদের কাছে জানা ছিল না। দেখতাম বাজেটের মোটা বইপত্র ঘেঁটে তিনি ছোটখাটো খবর তৈরি করছেন। ১৯৬২ সালে চিনা আক্রমণের সময় তিনি লাইব্রেরিতে ইংরাজি বইপত্র থেকে মালমশলা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখলেন গাদা বন্দুক থেকে গাইডেড মিশাইল। বরুণবাবু আমাকে দর্পণে দেখেছেন। ব্রজেনবাবুর ছাত্র বলে আমাকে বেশ সমীহ করতেন। বিধান রায় দামোদর সেতুর শিলান্যাস করেছেন খবরটি একটু অন্যভাবে লিখেছিলাম। বরুণ বাবু বললেন— বেশ

ব্যতিক্রমী লেখার স্টাইল। এটা যে আপনারই হবে আমি আঁচ করেছিলাম।

বরুণবাবু তখনও অনিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক বর্তমান প্রকাশ করতেন। আমার কাছে বহুবার লেখা চাইতেন। আমার তখন একদম সময় নেই। একে তো দুটোয় আসি। দশটায় যাই। এছাড়া তখন আমি নিয়মিত গল্প উপন্যাস ফিচার লিখতে শুরু করেছি।

বরুণবাবু আমার লেখা না পেয়ে সমকালীনে প্রকাশিত আমার কয়েকটি লেখা বর্তমানে রিপ্রিন্ট করেন।

কিন্তু আনন্দবাজারে বরুণবাবুর অবস্থান যত পাকা হতে লাগল আমার প্রতি তাঁর আচরণও তত বদলাতে লাগল। অতি অল্প সময়ের ভেতর তিনি আনন্দবাজারে চাকরি পাকা করে নিতে পারলেন। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল পলিটিক্যাল করেসপনডেন্ট। বাংলা সাংবাদিকতায় এই পদ এই প্রথম চালু হল। বরুণবাবু আমার মতে একজন দক্ষ আলাপচারি তথা জনসংযোগবিদ। তাঁর ছিল অনর্গল নানা বিষয়ে গসিপ করার ক্ষমতা। কলকাতার বড় ঘরের কেচ্ছা কেলেংকারি তাঁর মুখস্ত ছিল। কোন পরিবারের কে কোথায় রয়েছে। কোন পরিবারের সঙ্গে কোন পরিবারের বিয়ে হয়েছে। কার সঙ্গে কার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে তা ছিল তাঁর নখদর্পণে। বিশেষ করে ব্যারিস্টারদের সম্পর্কে তিনি অনেক তথ্য জানতেন। তাঁর চেহারার মধ্যে ছিল তারকাসুলভ রোম্যান্টিক আবেদন। দশজনের ভিড়ে তাঁকে যেমন চিনে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল তেমনি ছিল তাঁর নেতৃত্বসুলভ গুণ। অতি দ্রুত তিনি আনন্দবাজারের কোর গ্রপের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সন্তোষ ঘোষ মশাই, কানাইলাল সরকার ও অমিতাভ চৌধুরীর বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন হয়ে উঠলেন। অতুল্য ঘোষ মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা জন্মে গেল। কারণ অতুল্যবাবুকে আনন্দবাজার ভীষণ মানত। অতুল্যবাবু তখন বঙ্গেশ্বর। মানুষ চেনার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি বরুণবাবুর উজ্জ্বল সম্ভাবনা বুঝতে পারলেন।

অন্যদিকে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গেও বরুণবাবুর ভাল সম্পর্ক হয়ে গেল। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের একজন চমৎকৃত হয়ে নাকি মন্তব্য করেছিলেন একজন মানুষকে দুই বিপরীত মেরুর মানুষ সমান খাতির করছে, এটা বিরল ঘটনা।

বরুণবাবু রাজনৈতিক সংবাদদাতা হলেন। লোকে বলে তিনি প্রথম থেকে সতর্ক ছিলেন যাতে তাঁকে শিববাবুর আন্ডারে কাজ না করতে হয়। কারণ বরুণবাবুর আশঙ্কা ছিল শিববাবুর আন্ডারে তিনি সহজে স্টাফ রিপোর্টারের নাড়ী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। তাই তিনি এমন একটি পজিশন বেছে নিলেন যেখানে তাঁকে নাইট ডিউটি দিতে হবে না। বিট কভার করতে হবে না। শিববাবুর অধীন কাজ করতে হবে না। দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেশন, ইউনিভার্সিটি লালবাজার বা মহাকরণে অফিসারদের ঘরের সামনে বেয়ারাদের সঙ্গে এক বেঞ্চে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে না।

বরুণবাবু, আসলেন, দেখলেন ও জয় করলেন। জয় করলেন তিনি মালিকপক্ষকে সেই সঙ্গে পরের ধাপের প্রশাসকদেরও। তিনি বিশেষ সংবাদদাতার সমতুল রাজনৈতিক সংবাদ দাতার পদে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন। পরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন এ পদের তিনি যোগ্য।

ডাঃ রায়ের মৃত্যু

১৯৬২ সালের ১ জুলাই বেলা এগারটা নাগাদ কেদার দাস লেনের বাড়িতে বসে আছি। এমন সময় কে যেন বলল—ডাক্তার রায় আজ সকাল আটটায় মারা গেছেন।

আমি রেডিওটি চালিয়ে দিলাম। করুণ সঙ্গীত বাজছে আর ঘোষক কাঁপা কাঁপা গলায় বলে চলেছেন, ডাঃ রায়ের মৃত্যুর খবর। গত ২৩ জুন ডাঃ রায়ের সামান্য জ্বর হয়। তিনি প্রতিদিন লাঞ্চ খেতে বাড়ি যেতেন আবার বেলা তিনটে নাগাদ ফিরে আসতেন। কিন্তু সেদিন আর বিকেলে মহাকরণে যাননি। কিন্তু তাঁর জ্বরের উপসম হয়নি। তিনি জ্বর গায়ে বাড়ি বসে ফাইল দেখছিলেন। ওই অবস্থাতে তিনি মৃত্যুর দুদিন আগে বাড়িতে ক্যাবিনেট বৈঠক করেছিলেন।

সাতদিন ধরে তিনি অসুস্থ হয়ে বাড়িতেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ডাঃ এল .এম. ব্যানার্জি, ডাঃ মিলন তাঁকে দেখছিলেন। কিন্তু ৩০ জুন তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। তার পর মৃত্যু। তাঁর মরদেহ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়িতেই রাখা হয়েছে। দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করেছেন। আমি তাড়াতাড়ি দুমুঠো খেয়ে ট্রেন ধরে শিয়ালদা গেলাম। সেখান থেকে সরাসরি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। ধর্মতলা স্ট্রিটে ট্রাম থেকে নেমে ওয়েলিংটন স্ট্রিটে আর ঢুকতে পারলাম না। হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। আরও লোক আসছে। ক্রমে রাস্তা ছাপিয়ে পার্কের ভেতরও ভিড় উপচে পড়ল।

ডাঃ রায় জীবদ্দশায় বাঙালির কাছে এতটুকুও জনপ্রিয় ছিলেন না। ট্রামে বাসে চায়ের দোকানে যেখানে বাঙালি এক জায়গায় হত সেখানেই তাঁকে একবার গালাগাল না দিয়ে লোকে জল খেত না। বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের কাছে তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য নাকি আন্তরিকভাবে কিছুই করেননি। উলটে আন্দামানে ও দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন দিয়েছেন তাঁদের। এই ছিল তাঁদের অভিযোগ। বাংলার মধ্যেই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ছিল তাঁদের দাবি।

তাঁর সময় শিক্ষক আন্দোলন, ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন ও খাদ্য আন্দোলনের মত তীব্র আন্দোলন হয়েছে। বামপন্থীরাই সে সময় দেশের জনমত নিয়ন্ত্রণ করতেন। সরকারই ছিল সম্পূর্ণ কোনঠাসা। কংগ্রেস বিরোধী এবং বামপন্থী না হলে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে কল্কে পাওয়া যেত না। আর উঠতে বসতে সবাই দেশের দুর্ভাগ্যের জন্য ডাঃ রায়কে দায়ী করত।

ওই লোকটা না মরলে বাংলার উন্নতি নেই বুঝলেন।

কেউ বলতো আজ নেতাজী থাকলে দেশের এ অবস্থা হত না।

কেউ বলতো এর চেয়ে ব্রিটিশরা ভাল ছিল মশাই।

কেউ ওঁর চরিত্রের অপবাদ দিত।

ডাক্তার রায়ের বাড়ির সামনেই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। সেখানে তাঁর বাড়ির দিকে মাইক লাগিয়ে বিরোধীরা প্রতিদিনই রাত আটটা পর্যন্ত মিটিং করতো। হুঁশিয়ার বিধান রায়। বিধান রায় গদি ছোড়। আভি ছোড়, জলদি ছোড়।

তিতি বিরক্ত হয়ে ডাক্তার রায় থিয়েটার রোডে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সে বাড়ি অর্ধসমাপ্ত থেকে গেল।

এমনকী কংগ্রেসের ভেতরেও ডাক্তার রায়কে কেউ ভেতরে ভেতরে পছন্দ করত না। তাঁকে সবাই ভয় করতো। মুখের ওপর কথা বলতে পারত না। মৎস্যমন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর বলতেন—আমরা হলাম গিয়ে ওই কচ্ছপ। ডাক্তার রায় রাইটার্সে এসে আমাদের চিৎ করে শুইয়ে দেন। বাড়ি যাওয়ার সময় আবার উলটে দেন। কিন্তু সেই মানুষটি হঠাৎ চলে যাবার মুহূর্তের মধ্যে কী হয়ে গেল। সমস্ত মানুষ এসে জড় হতে লাগল তাঁর বাড়ির সামনে। কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর এত বিশাল মানুষের ঢল আর কোন মৃত্যু মিছিলে নামেনি। রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রায়ও প্রচুর ভিড় হয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধরা বললেন তা এরকম নয়।

ডাঃ রায় যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ৮০ বছর। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য যেমন ভাল ছিল তাতে তিনি স্বচ্ছন্দে আরও পাঁচ বছর সুস্থ অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চালাতে পারতেন। তিনি ৮০ বছর বয়সেও সোজা হয়ে হাঁটতেন। আর কী গলার আওয়াজ। তাঁর চোখ একটু বেগ দিচ্ছিল। একবার চিকিৎসা করতে ভিয়েনায় গিয়েছিলেন বলে বিধানসভায় সে কী সমালোচনা। এখনকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রতিবছর সপরিবারে বিলেত গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসেন।

বামপন্থীরা ডাঃ রায়কে প্রতিনিয়ত কোমরের নীচে আঘাত করে এসেছে। তাঁর কোন নীতিকেই তারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশন মারফত শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। অমনি শুরু হল ব্যাপক শিক্ষক আন্দোলন। মাত্র এক পয়সা ট্রামের ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাবে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব নিয়ে তো প্রশাসন অচল হবার অবস্থা। শেষে উত্তর পশ্চিম কেন্দ্র যেখানে কংগ্রেসের ঘাঁটি, সেখানেও কংগ্রেস প্রার্থী হেরে গেল। ডাঃ রায় যাকে হাতে ধরে রাজনীতিতে এনেছিলেন সেই বিচারমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ১৯৫৮ সালের ৯ মার্চ পদত্যাগ করে ডাঃ রায়ের বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলান।

ডাঃ রা: কে নির্বাচনে হারাবার জন্য বিরোধীরা সবাই এককাট্টা হয়। বউবাজার কেন্দ্র থেকে তিনি মাত্র ৪২০ ভোটে জয়ী হন। তাও এগুলি পোস্টাল ব্যালটের ভোট। নির্বাচনে দাঁড়ালে কলকাতার মানুষ তাকে ভোট দেবে না এমন একটা ধারণা হয়েছিল তাঁর—তিনি শালতোড়া থেকে আর একটি নিরাপদ নির্বাচন কেন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতা যদি তাঁকে ভোট না দেয় অন্তত গাঁয়ের মানুষ দেবে।

সেই ডাক্তার রায়ের মৃত্যুতে বাঙালির পালটি খাওয়া দেখে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। একেই বলে কিং ইজ ডেড লং লিভ দ্য কিং।

ডাঃ রায়ের মৃত্যুর সময় ডঃ রাধাকৃষ্ণন কলকাতায় ছিলেন। আমায় বলা হল, ডাক্তার রায়ের ওপর তার একটি স্মৃতিচারণ যদি যোগাড় করতে পারি।

আমি প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারিকে রাজভবনে ফোন করলাম। তিনি রাধাকৃষ্ণনের অনুমতি নিয়ে আমাকে বললেন : চলে আসুন। আমি সুদেবকে নিয়ে রাজভবনে চলে গেলাম।

রাধাকৃষ্ণনকে এই প্রথম দেখলাম। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে। নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারার মানুষ। আমাদের বললেন। এই তো গত পরশু

আমি তাঁর বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলাম। বললেন : ও কিছু না, সামান্য জ্বর। সেরে যাবে। এই অবস্থায় তো সব কাজ করছি। এমনকি ২৯ তারিখে ক্যাবিনেট মিটিংও করলেন। আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তখন দুর্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মারা যাবেন ভাবতেও পারিনি। আমার অনুরোধে ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলে গেলেন। বেশ শোকার্ত মনে হচ্ছিল ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, তোমাদের কাগজের খবর বলো। সুরেশ মজুমদার মশাই আমার বন্ধু ছিলেন। আমি এখনও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পড়ি।

ডাঃ রায়ের মৃত্যুদিনে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন কভারেজের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়েছিল মহাকরণে আমার সঙ্গে তাঁর সদয় ব্যবহারের কথা। তারও আগে ১৯৫৬ সালে ছাত্রদের নিয়ে তার বাড়িতে যাওয়া। আধ ঘণ্টার ওপর ধরে আলোচনা। তাঁর কভারেজে গিয়েছি উলুবেড়িয়া, কল্যাণী, সবশেষে এই তো মাত্র কদিন আগে সল্টলেক। তাঁকে দেখে সেদিনও কী ভেবেছিলাম আর দুমাসের মধ্যেই তাঁর শোক সংবাদ লিখতে হবে। বাঙালিও কি জানত, জীবনে যাকে কখনও মালা দিইনি, মরণে তার জন্য নিয়ে আসবে রাশি রাশি ফুল।

বিকেলের মধ্যে কলকাতার সমস্ত ফুলের দোকানের স্টক নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সব ফুলই ডাঃ রায়ের মরদেহে দেওয়ার জন্য।

ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তিনি জনগণের মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করার জন্য কিছুদিন রাজভবনে আম দরবার বসালেন। জনসাধারণ যে যার আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে আসতে পারত। এরকম একটি আমদরবার আমি কভার করেছিলাম। কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা যাহা আরম্ভ করি তাহা শেষ করি না। দুদিনেই আমদরবার বন্ধ হয়ে গেল।

আনন্দবাজারে যোগ দেবার পর আমি সাহিত্যচর্চায় বেশি করে মন দিলাম। আমার স্বপ্ন ছিল সাংবাদিকতার পাশাপাশি আমার সাহিত্য জীবনও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আমি বিদেশে বহু সাংবাদিককে সাহিত্যচর্চা করতে দেখেছি। ইংরাজি সাহিত্যে নমস্য চার্লস ডিকেন্স, ডানিয়েল ডিফো থেকে হাল আমলের আর্নেস্ট হেমিংওয়ে হেনরি মিলার সাংবাদিকতা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে যশ পেয়েছেন। হাতের কাছে সন্তোষকুমার ঘোষ গৌরকিশোর ঘোষ ও অসীম রায়ের উদাহরণ ছিল। তাঁরা রিপোর্টার কিন্তু উপন্যাস লিখেও নাম করেছেন।

আমার ইচ্ছা ছিল দেশে গল্প উপন্যাস লেখা। আনন্দবাজার পুজো সংখ্যা যেদিন গল্প উপন্যাস ছাপাতে পারব সেদিনই হবে আমার ডি ডে।

আমি প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। প্রথমে দেশ পত্রিকার জন্য গল্প না দিয়ে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় কাগজে লেখালেখি শুরু করে দিলাম।

উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ তখন জনপ্রিয় কাগজ। সমস্ত সাহিত্যিক সেখানে লেখেন। আমি একদিন উল্টোরথ অফিসে গিয়ে সম্পাদকের দর্শন প্রার্থী হলাম।

আমি একেবারে অজ্ঞাতপরিচয় নই। একটি বই-এর লেখক। ছোটখাটো কাগজে

প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। যুগান্তর আনন্দবাজার দর্পণে দু বছর ধরে স্বনামে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। উল্টোরথের প্রসাদ সিংহ ও গিরীন সিংহ দুজনেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন আমার সম্পর্কে। তারপর পাঠালেন এক তরুণ ভদ্রলোকের কাছে। আর্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা সপ্রতিভ এক ভদ্রলোক। আমার চেয়ে বয়সে সিনিয়র। বললেন—আমার নাম রবি বসু। আমিই লেখাটেখা দেখি। আপনি কোন লেখা এনেছেন?

আমি বললাম, এনেছি। একটি উপন্যাস।

একেবারে উপন্যাস! এর আগে উপন্যাস কোথাও লিখেছেন?

আমি বললাম, না। এই প্রথম উপন্যাস লিখলাম। আমি কার্ডিফ শহরে কিছুকাল ছিলাম। সেখানকার ভারতীয় চরিত্র নিয়ে লেখা। নাম দিয়েছি, দূরের আকাশ। পাণ্ডুলিপি রেখে দিয়ে চলে গেলাম। এক সপ্তাহ পরে যেতেই রবিবাবু বললেন—আপনার উপন্যাস ছাপা হবে। তবে উল্টোরথে নয়, সিনেমা জগতে।

মনটা দমে গেল। সিনেমা জগৎ ওদের বি টিম। বড় লেখকেরা সবাই উল্টোরথে লেখেন। আমি তো আর বড় লেখক হতে পারিনি। তবে আমার চেষ্টা থাকবে উল্টোরথে প্রমোশন পাবার।

রবিবাবু বললেন—আপনি উল্টোরথ পুজো সংখ্যার জন্য একটি ফিচার লিখতে পারবেন?

আমি বললাম—কিসের ওপর?

রবিবাবু বললেন—আপনি মার্গারেটের বিয়ের গল্প করছিলেন। ওই বিয়ের ওপরে একটা বড় ফিচার লিখুন। বিয়ে তো এখন পুরনো খবর। আপনি রাজপরিবারের হাঁড়ির খবর নিয়ে লিখুন, যা এখানকার রিডাররা জানে না।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখেছিলাম রানীর বোন মার্গারেট।

রবিবাবু লেখাটা পড়ে বললেন—খুব ভাল লেখা হয়েছে। আপনি উল্টোরথে নিয়মিত বিলিতি ফিচার দিন। মজার মজার ঘটনা আনুন। ইন্টারেস্টিং চরিত্র নিয়ে আসুন।

উল্টোরথে পরের সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল—বিলেতের নানা ঘটনা নিয়ে ধারাবাহিক রম্যরচনা। কেন্দ্রীয় চরিত্রে এল ওমর ফারুকি। ফারুকি হয়ে উঠল একটি কমিক চরিত্র। পাঠকরা প্রশংসা করল। উল্টোরথের কল্যাণে আমি রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। অত গল্প লেখা যায় না। প্রতি সংখ্যায় গল্প বারও করবে না। কিন্তু গল্পধর্মী এই রম্যকাহিনী প্রতিমাসেই বেরুতে লাগল। ত্রিশ টাকা করে দক্ষিণা পেতে শুরু করলাম। আমাকে লালাদা ১৯৬১ সালের গোড়ায় একটা দামী উপদেশ দিয়েছিলেন, লিখে যা উপায় করবে তার একটি পয়সাও খরচ করবে না। জমাবে। মনে করবে ও টাকা তোমার নয়।

এইভাবেই লিখে যা রোজগার করেছি তা ব্যাঙ্কে রেখেছি। ছ বছরে টাকা ডবল হয়েছে। বারো বছরে চার ডবল। আঠারো বছরে আট হবল।

আমার বাড়ি করার ইতিহাস এই। অনেকে যখন আমার বাড়ি দেখে লোকে ঈর্ষা চাপতে পারে না। তখন কে তাদের বোঝাবে এমন বাড়ি তোমরাও করতে পারবে যদি আঠারো বছর ধরে পরিকল্পনা করো। শুধু টাকা জমানো নয়, আমাকে অনেকে

বলেছিলেন, যদি কখনও বাড়ি করেন তাহলে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল খুলুন। তাই খুললাম। সেই ষাটের দশক থেকে আমার ট্যাক্স ফাইল।

লিখে কিছু না কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন হল কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্য থেকে সম্পাদকরা আমাকে দূরে সরিয়ে ক্রমাগত ফিচার লেখার বরাত দিতে লাগলেন। এর একটা কারণ গল্প উপন্যাস অনেকে লিখতে পারে কিন্তু ফিচার লেখা খুব কঠিন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যের চুলচেরা সীমারেখাটা যে ডুবো পাহাড়ের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে এটা যে না জানবে সে কখনই ভাল ফিচার লেখক হতে পারবে না।

উপন্যাস গল্প লিখতে না জানলে ভাল ফিচার লেখক হওয়া যায় না। কারণ প্রতিটি ফিচারের মধ্যে থাকা চাই মানবিক উপাদান। আর ওই মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র সাহিত্যের আঙিনায়। অথচ এটা বুঝেও ফিচার লেখককে প্রলোভন জয় করতে হবে। সাহিত্যের কাছে হ্যাংলামো করা চলবে না। এক কথায় বাংলা ফিচারের একটা নিজস্ব ভাষা ও স্টাইল আছে। সেটি কম লোকেরই জানা।

ক্রমাগত ফিচার লিখতে লিখতে গল্পকার হিসাবে আমার নাম হল না। নাম হল সাংবাদিক হিসেবে যদিও মাঝে মাঝেই আমি গল্প লিখতাম। আনন্দবাজারের রবিবাসীয়তেও গোটা দুয়েক গল্প বেরিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে ছাপ পড়ে গেল আমি উল্টোরথের ফিচার লেখক বলে।

বিমল মিত্র একদিন বললেন—পার্থবাবু, আপনি এমন দারুণ দারুণ প্লট ফিচার লিখে নষ্ট করছেন। কিন্তু আমি কি আর নষ্ট করেছি। আমার তখন টাকার দরকার ছিল। অতবড় সংসারের দায়িত্ব। সামান্য বেতন। সে টাকা থেকে সংসার চালিয়ে জমানো যেত না। ফিচারের ডিমান্ড ছিল। তাই আমি বাধ্য হয়ে ফিচার লেখক হলাম। আর তার ফলে সৃজনশীল সাহিত্যের জগৎ থেকে আমি একরকম নির্বাসিত হলাম। তবু গল্প উপন্যাস লেখা ছাড়লাম না।

আনন্দবাজারে ঢুকে অজস্র কাজের মধ্যে এমন করে সেঁধিয়ে গেলাম। বাজারটা বাবাই করেন। আমি সকালে উঠেই লিখতে বসি। বারোটা পর্যন্ত লিখি। দুটো নাগাদ অফিস যাই। রাত এগারটায় বাড়ি ফিরি। রবিবারে সারা দিনটা আড্ডা দিয়ে অথবা সিনেমা দেখে কাটাই।

॥ পঁচিশ ॥
নারী বিচিত্র বেশে

আমার জ্যোতিষীরা এক বাক্যে আমায় বলেছিল—নারী আপনার শত্রু হবে।

আশ্চর্যভাবে আমার জীবনের গোড়া থেকেই এই ভবিষদ্বাণী ফলতে শুরু করেছিল। অথচ আমি সোপেনহাওয়ারের মত নারীবিদ্বেষী ছিলাম না। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মেশার সহজাত গুণ আমার ছিল না। আমি তাদের কাছে সর্বদা আড়ষ্ট থাকতাম।

আমার স্কুলজীবনের সহপাঠীদের অনেকেরই বাল্য প্রেমিকা ছিল। যেমন দুর্গা, সুপ্রকাশ। সুপ্রকাশ স্কুলে পড়ার সময়ই তার পাশের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েই সুপ্রকাশ রেলে কেবিনম্যানের চাকরি পায়। আমরা যখন

কলেজে পড়ছি তখন সুপ্রকাশ বিয়ে করে হাওড়ার দিকে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে সংসার পেতেছে।

দুর্গা বিয়ে করেছে তার ডিভোর্সি প্রণয়িণী রাণুকে।

গোবরডাঙ্গায় সহপাঠীদের মধ্যে প্রেমের ছড়াছড়ি ছিল।

বিলেত থেকে ফিরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রথম নিজেকে পুরুষ বলে ভাবতে শিখলাম। কিন্তু মোনালিসা আমার সহজ বন্ধুত্বকে প্রত্যাখান করে যেভাবে আমায় অপমান করেছিল তাতে আমার পৌরুষে আঘাত লেগেছিল। মোনালিসা বলেছিল—আমার জন্য কত ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই আমাকে নিয়ে অকারণ কোন দ্বন্দ্বে মেতে উঠো না।

কিন্তু কথাটা মোনালিসা মিথ্যা বলেনি। তাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চক্র গড়ে উঠেছিল। অন্তত তিন-চারটি ছেলে তার প্রেমিক ছিল। আমার খারাপ লেগেছিল অন্য ছেলেরা আমাকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে দেয়নি। মোনালিসা মোটেই সুন্দরী ছিল না। তার আলগা চটক এবং সপ্রতিভ আচরণই তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত। কিন্তু আমি নিজে ছিলাম রূপের পূজারি। বলাবাহুল্য যেমন তেমন নারীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না।

তবে আগেই বলেছি। আমার পছন্দসই মেয়ে যে বাংলাদেশে ছিল না তা নয়। কিন্তু আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাইনি দুটো কারণে। এক, যদি তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করে। দুই, তারা কেউ আমাকে গ্রহণ করলেও আমি তাকে গ্রহণ করবো কী করে? আমার তো এই পারিবারিক অবস্থান। তিন, কোন মেয়ে যদি সত্যিই নিজে থেকে এগিয়ে আসে তাহলে প্রয়োজনে আমার বাবা-মায়ের অমতে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারব কি না। এনিয়েও আমার ধন্দ ছিল।

যে মা বাবা ভাইবোনের জন্য আমি বিলেতে পাকাপাকি বাস না করে চলে এসেছি। যাদের সুখী করার জন্য, উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি তাদের কলকাতায় নিয়ে এসেছি অথবা এই ভাবে বলা যায় ভাগ্য যখন তাদের আমার সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে তখন আমি এমন কাউকে বিয়ে করবো না যাকে মা গ্রহণ করতে পারবে না।

ঠিক এই কারণে নারীর প্রেম আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী প্রথম পরিচয়ের পর দমকা হাওয়ার মত আমাকে গ্রাস করতে চাইল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। নিষ্ঠুরভাবেই প্রত্যাখ্যান করতে হল তাকে। কোন জীবন নিয়ে খেলা করার পক্ষপাতী আমি নই। এখনও সে হয়তো এক বুক ঘৃণা বুকে করে বেঁচে রয়েছে।

আর একবার ঘটল এক মজার কাণ্ড। একজন উপমন্ত্রীর পি এ আমায় একদিন ফোন করে বললেন—মন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। আপনি কী একদিন আসবেন?

ডাক্তার রায়ের ক্যাবিনেটে মন্ত্রী উপমন্ত্রী মিলিয়ে প্রায় ৫২ জনের মত সদস্য ছিলেন। তাঁদের সবাইকে ডাক্তার রায়ও নাকি চিনতেন না। উপমন্ত্রীর কাছে যেতেই তিনি বললেন—আমার শ্যালিকা শ্যামলী আপনার সহপাঠিনী ছিলেন। আমি ওই নামের

কোন মেয়েকে চিনতে পারলাম না।

উপমন্ত্রী বললেন—শ্যামলী এখন কলকাতায় আছে। অশোক গড়ে আমার এক ভায়রাভাই-এর বাড়ি উঠেছে। আপনাকে আগামী কাল সকালে তার বাড়ি যেতে বলেছে। এই তার ঠিকানা। আমি এর মধ্যে এক বিপদের গন্ধ পেলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভীষণভাবে কাজ করে। এর আগে যে মেয়েটি তার প্রেম নিবেদন করেছিল সেও আমাকে এমন ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কৌতূহলের বশে গিয়ে তারপর অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। এ ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হতে পারে হয়তো। তবু আবার কৌতূহল হল। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই দুর্মূল্য।

সুদেবকে সব কথা বলতাম। সে বলল—যাও না দেখে এসো না সে কী চায়?

আমি বললাম, যাবো। তবে তোমাকেও যেতে হবে।

সুদেব রাজি হল।

অশোকগড়ের ওই বাড়িতে পৌঁছনর আগে সুদেবকে বললাম—যদি দেখো মেয়েটি আমাদের প্রচুর খাওয়াচ্ছে তবে বুঝবে কেস খুব খারাপ। কারণ মেয়েরা প্রেমে পড়লে প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে প্রচুর খাওয়ায় এ কথা শরৎবাবুর বইতে পড়েছিলাম।

বাড়ির লোকজন খুব খাতির করে বসাল। যেন আমরা কনে দেখতে এসেছি। কিছুক্ষণ পরে শ্যামলী বলে মেয়েটি এল। সে বলল— সে আমাদের সেকশনেই পড়ত। এখন পাশ করে গেছে। বিলেত যাওয়ার আগে ক্লাশের ছেলেমেয়েরা আমাকে ছোট্ট একটি সম্বন্ধনা দিয়েছিল। সেদিন সে উপস্থিত ছিল। আমার লেখাও সে নিয়মিত পড়ে আসছে।

খুব প্রগলভ নয় মেয়েটি। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা। নাক বোঁচা, চোখ ছোট ছোট। সুদেব বলেছিল, মনে হচ্ছে ট্রাইব্যাল। উত্তরবঙ্গে আদিবাড়ি। একটু পরে দুটো থালায় করে মিষ্টি এল। প্রচুর মিষ্টি। যেন গোটা দোকান উজাড় করে আনা হয়েছে।

সুদেব কানে কানে বলল— যা বলেছিলে তাই। এখনই কেটে পড়ো।

কিন্তু কেটে পড়লেও বিপদ থামল না। এরপর একের পর এক চিঠি আসতে লাগল শ্যামলীর। চিঠি মানে প্রেম পত্র। আমার জন্যই নাকি সে প্রতীক্ষা করে আছে। আমি নাকি তাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম ফিরে এসেই তাকে—

কী সর্বনাশ। চিঠির সংখ্যা যখন গোটা পনের ছাড়িয়ে গেল তখন চিঠি কটি বান্ডিল বেঁধে সঙ্গে নিয়ে আমি লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমায় হেসে বললেন—পঞ্চানন ঘোষালের বই পড়েছেন? অপরাধ বিজ্ঞান। ছেলেমেয়েদের এমন ফিক্সিটি হয়। এটা এক ধরনের মানসিক অসুখ। আপনি চেপে যান। কোন চিঠির উত্তর দেবেন না। আপনা আপনি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

সত্যি সত্যি একদিন চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রেম নয়, আমি চেয়েছিলাম মেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব। কফি হাউসে আড্ডা। আঁতলামো ভরা চিঠিপত্র লেখা। এক সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে যাওয়া। সাহিত্যিক হিসাবে মেয়েদের সান্নিধ্য আমার প্রয়োজন ছিল। তারা আমার লেখার চরিত্র। মেয়েদের না বুঝলে জীবনকে বুঝব কীভাবে?

প্রথম বছরের ছুটি পেয়ে সিমলায় বেড়াতে গেলাম। সিমলার গল্প শুনতাম হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টার নবকুমার নাগের কাছে। নবকুমার সিমলাতে কোন এজেন্সির রিপোর্টার ছিলেন। সেখানে এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। ওই বাড়ির এক মেয়েকে তিনি পরবর্তীকালে বিয়ে করেন।

তিনি বলেছিলেন কালীবাড়িতে থাকার জায়গা আছে। আমি গিয়ে কালীবাড়িতে উঠলাম।

দিন পনের ছিলাম সিমলায়। কিন্তু কালীবাড়িতে থাকার ফলে একাধিক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। এঁদের একজনকে নিয়ে গল্প লিখেছিলাম। ভদ্রমহিলার নাম চিনুদি। তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটি তখন স্কুলে পড়ত। আলাপ হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেড়াতে আসা কিছু ভ্রমণকারীর সঙ্গে। আমি সকলের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতাম। শুধু তরুণীরা ছাড়া।

তবু অপ্রত্যাশিত ভাবে দুই তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তারা প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওগ্রাফির ছাত্রী।

কলেজের প্রফেসর ডঃ নিশীথ রঞ্জন কর জন দশবারো ছেলেমেয়ে নিয়ে এক্সকারসানে এসেছেন। উঠেছেন কালীবাড়িতে।

আমার সঙ্গে ছেলেদের খুব জমে গেল। ওই ছেলেদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে আই এফ এস হয়েছিল। তার নাম অমলকুমার বসু। অমল দীর্ঘকাল কলকাতায় পাশপোর্ট অফিসার ছিল। অমল পরে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার হয়। ছাত্রজীবনের সেই পরিচয় আজও দীর্ঘস্থায়ী রয়েছে।

দুদিন পরে ছেলেমেয়েরা যাবে আরও উত্তরে হিমবাহ দেখতে। ওরাই বলল—স্যার, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

পাহাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে জিপ চলছে। সব শুদ্ধ তিনটি জিপ। একটি জিপে বসে তপতী আর রঞ্জু। তপতী একটু স্বাস্থ্যবতী ; ফর্সা রঙ। রঞ্জু, শ্লিম কালো গায়ের রঙ, দীর্ঘাঙ্গী। সারাদিন ঘুরে দশ হাজার ফুঁট উঁচুতে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। আমি ক্যামেরায় ঘন ঘন প্রকৃতির ছবি তুলছিলাম বলে তপতী বলল—আপনি মানুষকে ছেড়ে শুধু গাছপালার ছবি তোলেন বুঝি?

আমি বললাম—গাছপালার ছবি তোলার একটা সুবিধে যে তাদের কপি দিতে হয় না।

আপনি এত কৃপণ কেন? রঞ্জুর প্রশ্ন।

আমি বললাম—উদারকে সবাই সহজলভ্য ভাবে। এই ধরনের কাব্যিক কথাবার্তায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম। এ আমার ছাত্রজীবনে বেশি করে বাংলা উপন্যাস পড়ার প্রভাব।

সারাদিন হইচই করে রাতে ফেরার পর রঞ্জু আমার ঘরে এসে একটি কার্ড দিয়ে গেল। তাতে লেখা—

Faces do not lie
faces do not lie
But Tapati says faces do lie.

এই হেঁয়ালির মানে বুঝতে সারারাত কেটে গেল।

সিমলায় আমার দিনগুলি খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। ফেরার পথে দিল্লি ছুঁয়ে গেলাম। এই আমার দ্বিতীয়বার দিল্লি পরিদর্শন। উঠলাম হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড অফিসের লাগোয়া সুনীল বসুর ফ্লাটে। সুনীলদা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের কলকাতা এডিশনের দিল্লি প্রতিনিধি হয়ে চলে গিয়েছেন। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের দিল্লি এডিশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি তখন শুধু কলকাতায় খবর পাঠান।

দিল্লিতে গরমের দিনে লোকে ছাদের ওপর খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। সুনীলদারও তাই অভ্যাস। পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় শুয়ে অনেক রাত ধরে আমরা গল্প করলাম।

সুনীলদা গল্প শুরু করলে থামতে চান না। অধিকাংশই তাঁর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে। সুনীলদা বললেন—সাংবাদিকদের কেউ কেউ গাল গল্প লিখে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে চালায়। আর আমি আমার অভিজ্ঞতাকে গাল গল্প বলে চালাচ্ছি। আমি যা বলছি তা মনে করবে সত্যি হলেও গল্প। যা ছাপার অক্ষরে বেরোয়নি ইতিহাসের কাছে তার কোন দামই নেই। এই বলে সুনীলদাও নানা গাল-গল্প শুরু করে দিলেন।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পরে তপতীর চিঠি পেলাম। সিমলা ছাড়ার আগে সে আমার ঠিকানা নিয়েছিল।

তপতীর হাতের লেখাও ভাল। লেখার মধ্যে বৈদগ্ধ্যের ছাপ আছে।

যে কোন মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কৃতি তার চিঠি লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। নির্ভুল বানান, ঝরঝরে লেখা ও অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব প্রকাশের ক্ষমতা চিঠির মধ্যেই ফুটে ওঠে হাতের লেখার মধ্য দিয়ে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার চিঠি পড়ে মনে হল সে আমাকে পছন্দ করে। আমাকে কফি হাউসে দেখা করতে লিখছে। তপতীর সঙ্গে দেখা হল কফি হাউসে।

সে কথায় কথায় বলল—রঞ্জু একজন গুড স্পোর্টস উওমেন। আমরা দুজনে ডায়াসেসনে পড়তাম। ও দুবার ইন্টার স্কুল দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

—ইজ ইট? দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।

তপতী বলল, না ওকে দেখে বোঝা যায় না।

আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেল।

বললাম— দেশে মুকুল দত্ত স্পোর্টসে মেয়েদের মধ্যে যারা নাম করেছে তাদের নিয়ে লিখছেন। আমাকে মুকুলদা বলে রেখেছেন যদি ভাল মেটিরিয়াল পাও আমাকে দিও। রঞ্জুকে একদিন কফি হাউসে আসতে বলুন না। আমি ওর ইন্টারভিউ করব।

তপতী বলল—দি আইডিয়া। তবে ও না আসলেও ক্ষতি নেই। রঞ্জু সম্পর্কে আমি সব জানি। আমি বলে যাচ্ছি, আপনি লিখে নিন। তপতী রঞ্জুর জীবনপঞ্জী বলে গেল। আমি নোট করে নিলুম। তপতী রঞ্জুর একটা ছবিও দিল। ছবিটি তার নিজস্ব অ্যালবাম থেকে খুলে দিয়ে বলেছিল—দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে রঞ্জুকে।

মুকুলদাকে সমস্ত মালমশলা দিতেই মাস দুয়েকের মধ্যে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় রঞ্জুর ছবি দিয়ে লেখাটি বেরিয়ে গেল। এরপর তপতীর সঙ্গে আর দেখা নেই। কফি হাউসে বিভিন্ন সময় গিয়েও তাকে পাইনি। মনটা উশখুশ করছে লেখা সম্পর্কে রঞ্জুর

আর তপতীর প্রতিক্রিয়া জানতে।

দেখা হয়ে গেল একদিন।

তপতী কফি হাউসে একটি টেবলে একাই বসে। হয়তো কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

কাছে গিয়ে বলাম—বসতে পারি?

তপতী বলল—বসুন।

— কী কোন খবরাখবর নেই। আমি ভেবেছিলাম আপনার একটা চিঠি পাব। লেখাটা দেখেছেন?

তপতী অন্যোদিনের মত প্রগলভ নয়। বেশ গম্ভীর। আমাকে বলল— আপনাদের কাগজ কি লেখার কোন সাবজেকট পাচ্ছে না? শেষে রঞ্জুকে নিয়ে অত বড় লেখা ছাপল।

ঃ বাঃ, রঞ্জু কী একজন সফল অ্যাথলেট নয়। আপনিই তো বলেছেন সে ইন্টারস্কুল চ্যাম্পিয়ন।

ঃ অমন চ্যাম্পিয়ন তো অনেক গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাদের ক'জনের জীবনী ছাপেন?

— জীবনী ছাপার মত হলে নিশ্চয়ই ছাপা হয়। বিশেষ করে তপতী সেনের যদি সে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়। কিন্তু এই স্তাবকতায় তপতী ভুলল না।

সে বলল কি আছে রঞ্জুর জীবনীতে—

বাঃ রে! আপনিই তো বললেন ওর বিষয় ছাপতে। এখন আপনি উলটোসুর গাইছেন।

আমি বললাম বলেই আপনি ছাপবেন.....

আমি দেখলাম তপতী খুব সিরিয়াস। কিন্তু কেন তার কারণ বুঝলাম না।

তপতী কি রঞ্জু সম্পর্কে জেলাস হয়ে গেছে? এক এক সময় হঠাৎ আমরা আমাদের প্রিয়জন সম্পর্কেও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ি।

আমি দেখেছি ছোট্ট একটা ঘটনায় বাবা ছেলে সম্পর্কে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠছে। গুরু শিষ্যকে ঈর্ষা করে। শিষ্য গুরুকে ঈর্ষা করে। শিষ্য প্রতিষ্ঠিত হলে গুরু ভাবে তার জায়গা যদি কেড়ে নেয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এই একচক্ষু ঈর্ষা দৈত্য বাস করে। অধিকাংশ সময়ই আমরা বিচার বুদ্ধি সংযম দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সে জেগে ওঠে। সামনে যাকে পায় তাকেই ছুঁয়ে ফেলে।

রঞ্জুর পাবলিসিটি দেখে তপতীর ভেতরে সেই দৈত্যটা কী আবার জেগে উঠেছে? পরিচিত জনের ও বন্ধুবান্ধবের পাবলিসিটি অনেকে সহ্য করতে পারে না। এটা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে ওঠে।

রিপোর্টারদের হাতে এক অদৃশ্য অস্ত্র আছে। তারা যদি কাউকে বসিয়ে দিতে চায় তাহলে তার পাবলিসিটি দিয়ে থাকে। আর যত বেশি প্রচার হয় ততই সে বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। কর্মক্ষেত্রে অধস্তনের বেশি নামডাক হয়ে গেলে বস সেটা সহ্য করতে পারে না। এর ফলে তার উন্নতির পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। আমাদের গ্রামে একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁকে আমরা কেষ্টাদা বলতাম।

সেই কেষ্টদা একদিন পাগল হয়ে গেলেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। স্টেশনের প্লাটফর্মে, গাছতলায়, কারও বাড়ির নিচে তিনি বসে থাকতেন। একটা দুটো পয়সা পেলে *গান শোনাতেন। উদাসী পথিক শুনেছি তোমার ব্যাকুল বাঁশির কামনা*—এমন কত গান যে তিনি গাইতেন।

কেষ্টদার সব চলে গিয়েছিল। গানের গলাটা যায়নি। অথচ ওই গলার জন্যই ঈর্ষাকাতর এক চক্র তাঁকে খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে পাগল করে দিয়েছিল। এটাই বলত লোকে।

তপতী—অমন ভদ্র, সপ্রতিভ, মেধাবী সুশ্রী মেয়েটির চোখ মুখের ভাষা আমি চিনতে পারলাম না।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। এখন তপতী যদি বলে বসে রঞ্জু সম্পর্কে আমি সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম। অথবা রঞ্জু যদি একটা চিঠি দেয় দেশ পত্রিকার দফতরে আমার অসাক্ষাতে আমার সম্পর্কে লেখা হয়েছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। তাহলে তো খুব বিপদ।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম তপতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় হয়ে গেছে।

॥ ছাব্বিশ ॥

হীরক রাজার দেশে

অফিসে নানা কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতের মামার বাড়িতে মাঝে মাঝেই যাচ্ছি। প্রভাত যদিও এম. এ. পাশ করে তার দেশে চলে গিয়েছে। প্রভাতের জায়গা নিয়েছি আমি। ওরা যেন আমারই মামা-মামীমা। আমি এখন সরাসরি দোতলায় উঠে যাই। সবচেয়ে ছোট মেয়েগুলির সঙ্গে গল্প করি। মামা বলেন, প্রভাত দেশের কলেজে সামান্য চাকরি করছে। ওর পক্ষে অ্যামবাসাডরের চাকরি হলে সবচেয়ে ভাল হত। মামার ধারণা, যাদের আর কোন চাকরি করার যোগ্যতা নেই তারাই অ্যামবাসাডর হয়।

একদিন মামীমা বললেন—পার্থকে তুমি সে কথাটা বলো না।

কোন কথা গো?

আহা সেই ওকে রামবাবুর সঙ্গে পাঠাবার ব্যাপারটা।

মামা বললেন ও হ্যাঁ। তুমি সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ একবার আসতে পারবে বাবা?

কী আছে?

রামবাবু আসবেন। হীরের দালালি করেন। আমাদের একটি হীরে আছে। উনি দু-চারজন জহুরীকে দেখাতে নিয়ে যাবেন। কী দাম দেয় দেখি। তা পরের কাছে দু লাখ

টাকার মাল ছাড়তে ভয় করে।

দু লাখ টাকা দাম আপনাদের হীরের?

হ্যাঁ, তা তো হবেই। গোলকুণ্ডার বৈদুর্যমণি। আমাদের বংশানুক্রমে ওই হীরে রয়েছে। আমার ঠাকুর্দা রাজা উপাধি পান। তিনি বছরে কয়েকবার পাগড়ির সঙ্গে ওই হীরে পরতেন। পাকিস্তান থেকে কিছুই আনতে পারিনি ওই হীরেটা ছাড়া। হীরেটা বিক্রি করে মেয়েদের বিয়ের টাকা গুছিয়ে রাখব। কী জানি, আজ আছি কাল নেই।

আমার কাছে বেশ উপন্যাসের মত লাগল হীরের গল্পটা। আমি সোৎসাহে রাজি হয়ে গেলাম সোমবার আসতে।

আমার এক কবি বন্ধু থাকত নৈহাটিতে। আমাদের সঙ্গে এম এ পড়ত। আমার মত তারও পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। নিখিলের বন্ধু হিসাবে সেও আসত মাঝে মাঝে নিখিলের মামার বাড়িতে। তাকে হীরের প্রসঙ্গটা বলতেই সে বলল—আগে জানতাম ওই বাড়িতে রাজকন্যারা বাস করে, এখন দেখছি রাজত্ব না থাক রাজমুকুটে আছে কোহিনুর হীরে। এক কাজ করা যাক। তুমি বড় রাজকন্যাকে বিয়ে করো। আমি মেজ রাজকন্যাকে বিয়ে করি। হীরে বেচা কিছু টাকা আমরাও নিশ্চয়ই পাবো। আমি বললাম— তোমার টাকার লোভ? না, রাজকন্যার ওপরেই লোভ? সে বলল রাজত্বটা ফালতু পাওনা। আমি ভাই মেজ রাজকন্যার রূপে মজেছি। শ্যামা শিখরিদশনা।

দুজনেই হেসে উঠলাম।

সোমবার দিন মামার বাড়ি গিয়ে দেখি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক বসে। মামা বললেন, আলাপ করিয়ে কি, ইনি রামবাবু। নামী জহুরি। আর রামবাবু, এর কথা আপনাকে বলেছিলাম। আনন্দবাজারের রিপোর্টার। বিলেত ঘুরে এসেছে। প্রায়ই কাগজে লেখা বেরোয়। রামবাবু বললেন, আপনার কথাই উনি বলছিলেন। চলুন দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি।

মামীমা আলমারি খুলে একটি গহনার বাক্স বার করলেন। তার মধ্যে রুপোর কৌটো। তার ভেতরে তুলো দিয়ে মোড়া কাবলি ছোলার আকারের একটি হীরে।

আমি এর আগে কখনও হীরে দেখিনি। দেখে আহামরি কিছু মনে হল না। ভদ্রলোক বললেন, দেখছেন ভেতরটায় কতগুলো রঙের রিফ্লেকশন হচ্ছে। এমন একটা খাঁটি মাল অথচ কিছুতেই খদ্দের জুটছে না।

দেখি এবার জোড়াসাঁকো পাড়াটা চেষ্টা করবো।

ভদ্রলোক আমায় বললেন, খুব সাবধানে নিয়ে চলুন। আমি যেখানে যেখানে যাবো সেখানে সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

আমি আমার ব্যাগের মধ্যে দুলক্ষ টাকা দামের হীরেটা পুরলাম। তারপর দুজনে হেদোর মোড় থেকে একটা রিকশ নিয়ে গিরিশ পার্কের কাছে নামলাম।

রামবাবু আমায় একটি চারতলা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সোজা উঠে গেলেন তিনতলায়। একজন চাকরের সঙ্গে দেখা হল। রামবাবু হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন আগরওয়ালাজী আছেন? সে বলল—আছেন। আপনি ডানদিকে চলে যান। দুটো ঘর ছেড়ে।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দরজা ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকতেই গদির ওপর তাকিয়া ঠেশ দিয়ে শাদা শার্ট আর ধুতি পরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন। গদির ওপর আরও দুজন বসে। একদিকে একটি লোহার সিন্দুক। তাতে সিঁদুরের স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা। দেওয়ালে একটি হনুমানের ছবিতে বাসি মালা ঝুলছে। দেওয়ালে একটি ইংরাজি ক্যালেন্ডার।

আগরওয়ালজির সামনে একটি ডেস্ক। এক পাশে কাচের বেষ্টনীর মধ্যে একটি নিক্তি।

আগরওয়ালাজী বললেন—মাল এনেছেন?

রামবাবু বললেন, জী হ্যাঁ। আমায় ইঙ্গিত করতেই আমি হীরের কৌটো বার করে ডেস্কের ওপর রাখলাম।

আগরওয়ালাজী আমার পরিচয় নিয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। শুধু হীরেটা বার করে আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। আমি কড়া নজর রাখছিলাম পাছে ভদ্রলোক কোন ফাঁকে হীরেটা না পালটে নেন। কিন্তু সে সব কিছু ঘটল না। হীরেটা যেমন ছিল তেমন মুড়ে তিনি কৌটোর ভেতরে রেখে কৌটো আমার হাতে দিলেন।

এবার রামবাবুকে বললেন—হ্যাঁ, দেখলাম। এবার ভাও বলুন।

এই বলে তিনি আমার হাত থেকে খপ করে চামড়ার বারো ইঞ্চি ব্যাগটা নিয়ে রামবাবুর ডান হাতটা টেনে ডেস্কের ওপর রাখলেন। তার ওপর ব্যাগটা চাপা দিলেন। এবার নিজের ডানহাতের আঙুল দিয়ে রামবাবুর আঙুল স্পর্শ করতে লাগলেন। আমি বুজতে পারলাম ওঁদের আঙুলে আঙুলে কথা হচ্ছে।

এক একটা আঙুল আগরওয়ালা ধরেন আর রামবাবু বলে ওঠেন — না-না।

আবার রামবাবু আগরওয়ালার একটা আঙুল ধরেন অমনি আগরওয়ালা বলে ওঠেন — না-না। নেহি হো সকতা হ্যায়। এইভাবে মিনিট দু-তিন আঙুলে আঙুলে কথাবর্তার পর রামবাবু বললেন—তাহলে আরও দু একজায়গায় গিয়ে দেখি আগরওয়ালা জী। রাম রাম।

'রাম রাম' এই বলে আগরওয়ালা হাত জোড় করলেন। তারপর বললেন— চায়ে উয়ে কুছ নেহি পিজিয়েগা।

রামবাবু বললেন— আজ একটু তাড়া আছে আগরওয়ালাজী। আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবো।

গিরিশ পার্ক থেকে গণেশ টকি, এই এলাকাটুকুর মধ্যে রামবাবু আমাকে আরও তিনজন জহুরীর কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথাও দরে পোষাল না। সব জায়গাতেই অমন সাঙ্কেতিক ভাষায় দরদস্তুর হল।

রামবাবুর সঙ্গে ঘুরে কলকাতার এক বিচিত্র পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। রামবাবু আর কোন কাজ করেন না। কলকাতার বনেদী বাড়ির বর্তমান প্রজন্ম যারা গরিব হয়ে গেছে তারা পিতৃপুরুষের হীরে জহরৎ বিক্রি করে। তাদের দালালি করেন রামবাবু। কলকাতার বহু বনেদী পরিবারে তাঁর যাতায়াত। দু-একবার পুলিশি

ঝামেলাতেও পড়েছেন। জহুরীরা এই সব হীরে জহরৎ জলের দরে কিনে নাকি বিদেশেও পাচার করে। এমনি এক হীরে স্মাগলিং কেসে পড়ে গিয়েছিলেন রামবাবু। কিন্তু নির্দোষ বলে তিনি ছাড়া পান।

তবে রোজই তো মাল বেচাকেনা হয় না। দরদস্তুর কমিশনের হার ঠিক করতে এক একটা ডিলে কম করে একমাস দুমাস সময় লেগে যায়। এই হীরেটা বিক্রির চেষ্টা করে আসছেন আজ এক বছর ধরে। কিন্তু রাজাবাবু যে দর হাঁকছেন তা দিতে কেউ রাজি হচ্ছে না, তাঁর নিজেরও ধারণা এক লাখের বেশি কেউ এই হীরের দাম দেবে না। কিন্তু রাজাবাবু তো এটা বুঝবেন না।

প্রায় তিন চার ঘণ্টা ব্যর্থ হয়ে ঘোরাঘুরির পর আমরা মানিকতলার বাসে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সি করার মত পয়সা পকেটে নেই। শুধু ব্যাগটা বুকের কাছে আঁকড়ে দরলাম।

সাত রাজার ধন এক মানিক আমার হাতে।

যাকে বলে গৃহসুখ তা যে আমার কপালে নেই তার প্রমাণ বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার অশান্তি শুরু হল। বাড়িওয়ালার ছেলে এবং তার দুই মেয়ে মিলে আমাদের পরিবারকে নানাভাবে অপদস্থ করা শুরু করল। যেমন কথায় কথায় জল বন্ধ করে দেওয়া। বাথরুমে স্নান করছি। হঠাৎ জল বন্ধ হয়ে গেল। ওপর থেকে মেয়েরা চুল আঁচড়ে ছেঁড়া চুল দলা করে ফেলে দিত। এসে পড়ত আমার উঠোনে। অফিস যাচ্ছি ওপর থেকে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঃ কলির কার্তিক। যাকে বলে 'অ্যাডাম টিজিং'। শেষ পর্যন্ত একদিন ওরা সদর দরজা দিয়ে ঢোকা বন্ধ করে দিল। পাশে একটি গলির দরজা ছিল। সেখান দিয়ে ঢুকলে পিছন দিয়ে ঘুরে একটি ঘর পার হয়ে তবে আমার ঘরে ঢুকতে হয়। বাইরের কোন লোককে এভাবে আনা যায় না।

এই নিয়ে কাশীপুর থানায় আমি একাধিক পুলিশ ডায়েরি করতে বাধ্য হলাম। আমার বাড়িতে তখন কিছু কিছু লোক দেখা করতে আসত। যেমন একজন নিয়মিত ভিজিটর ছিল শুভ্রাংশু গুপ্ত। দমদম জংশন স্টেশনের কাছেই তার বাড়ি। ইংরাজিতে এম এ পাশ করে সে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে লেকচারারের কাজ করত। আর আনন্দবাজারে ফিচার লিখত।

শুভ্রাংশুর সঙ্গে দমদম মতিঝিলে এক বিখ্যাত গায়িকার দাদার বন্ধুত্ব। একদিন ও আমাকে গায়িকার বাড়ি নিয়ে যায়। গায়িকার সঙ্গে আলাপ হয়। তার দাদার সঙ্গেও আলাপ হয়। পরিবারটি খুব লড়াই করে উঠেছে। আমাকে শুভ্রাংশু একদিন বলল— গায়িকার দাদার তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। গায়িকা—বোনের জন্য তারা একজন সুপাত্র খুঁজছে। তুমি রাজি থাকলে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতে পারে। অতবড় গায়িকা তোমার বউ হবে, তোমার লাক ফিরে যাবে। তাছাড়া ওরা বামুন। পালটি ঘর।

শুভ্রাংশু ঠাট্টা করছিল না। সে সিরিয়াস। আমি বললাম, তুমি খেপেছ? আমি কী অতবড় গায়িকার যোগ্য? তাছাড়া ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সবাই আমার পরিচয় দেবে

অমুক আর্টিস্টের বর। এটা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা খুব কঠিন। শুভ্রাংশু বলল— সরি। কিন্তু তুমি একটা চান্স মিস করলে।

আগেই বলেছি তখনও আমি বিয়ে থা করার কথা ভাবছি না। তাছাড়া আমার পারিবারিক পরিবেশ তখনও অনুকূলে নেই। আমাকে দেখতে মোটামুটি সুশ্রী ছিল। মায়ের ইচ্ছা চাকরি যখন পেয়েছি, কলকাতায় যখন বাসাও হয়েছে তখন এবার একটা বিয়ে করলে ষোল কলা পূর্ণ হয়।

কিন্তু বিয়ে করার কথা তখন কল্পনাতেও আনতে পারছি না। ভাই ক্লাশ এইটে পড়ে। বোন ফোরে। দেড়খানার বেশি ঘরের সাশ্রয় নেই। যে মাইনে পাই সংসারে সব লেগে যায়। আমি ঠিক করেছি নিজের স্ট্যান্ডার্ড বাড়াব না। পোশাক পরিচ্ছদের শখ নেই। সিগারেট নিজের টাকায় খাই না। কেউ অফার করলে খাই। কিন্তু পরে সিগারেটও চিরতরে বর্জন করি। অনেকের মত মদের নেশাও ধরিনি।

আর্থিক সঙ্কট ছাড়াও আমার সামনে তখন অনেকগুলি কাজ রয়েছে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল পি-এইচ ডি করার। কেন? আমার বন্ধু বান্ধবেরা সবাই নিরুৎসাহ করল আমাকে। পি-এইচ ডি করে কী হাত-পা গজাবে নাকি? খাচ্ছিলে তাঁতী তাঁত বুনে শাল হবে পি-এইচ ডি করে। একজন সাহিত্যিক বললেন— লোকে ভুল করে ডাক্তার মনে করে চিকিৎসার জন্য আসবে।

পৃথিবীতে নেগেটিভ লোকের সংখ্যাই বেশি। যাঁরা অন্য মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে বাগড়া দেন। কিন্তু আমি যদি নিরুৎসাহ হয়ে থেমে যেতাম তাহলে ওখানেই ফুরিয়ে যেতাম।

আমি প্রাইভেটে এম এ পরীক্ষা দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম এম এ পরীক্ষা না দিয়ে বিয়ে করার কথা চিন্তা করব না।

বিয়ে করার ব্যাপারে আমার আর একটি উদ্বেগ ছিল। আমার এই সংসারের নানা সমস্যার মধ্যে বাইরের একটি মেয়ে কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবে? অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া আমার একার আয়ে তাকে আমি তার পছন্দ মত জিনিসপত্র কিনে দিতে পারব না। সুতরাং কর্মরতা মেয়ে হলে ভাল হয়। কিন্তু কোন কর্মরতা মেয়ে সব জেনেশুনে যৌথ পরিবারে কেন থাকতে চাইবে?

আরও অনেক অসুবিধা ছিল। আমার বাবার কোন সামাজিক প্রতিপত্তি নেই। তিনি বেকার এবং পরমুখাপেক্ষী। তিনি নিজের খেয়ালখুশি মত চলেন। কোন রোজগার নেই বলে হাতখরচের টাকার জন্য যত্রতত্র হাত পাততে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধে না। আমার মায়ের ইগোও কম নয়। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মধ্য বয়সে কিছুটা নিরাপত্তার স্বাদ পেয়ে তাঁর মনে আশঙ্কা থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক এই বুঝি তাঁকে আবার আগের জীবনে ফিরে যেতে হয়। আমার ভাইও অপরিণতমনস্ক। বোন তখনও ছোট। কিন্তু সে যত বড় হয়ে উঠবে ততই সে চাইবে শহরের মধ্যবিত্ত মেয়েদের মত মানুষ হতে।

এর ওপর আমার পরের বোন সাবিত্রী বা শান্তা তার ছেলে নিয়ে প্রায়ই আমাদের

বাড়ি থাকত। কখনও সে একা মাসের পর মাস থেকেছে। ভগনিপতি দুর্গাপুর প্রজেক্টে ইলেকট্রিসিয়ানের চাকরি নিয়ে দুর্গাপুরে থাকত। কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে তাকে শাশুড়ির গঞ্জনা শুনতে হত। কারণ তার বুদ্ধি কম। তদুপরি অসুস্থ। বিশেষ করে তার প্রথম ছেলের জন্মের সময় তার হাতের দুগাছা চুড়ি বাবা বন্ধক দিয়েছিল হাসপাতালের খরচ চালানোর জন্য। বাবা তখন কপর্দকশূন্য। এছাড়া প্রসূতি ও নবজাতককে বাঁচাবার উপায় ছিল না। শাশুড়ি এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারেননি। সংসারে তখন আমাকে নিয়ে ছ'জন লোক। কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা অতি সরল ছিল বলে আমাকে কখনও ধার করতে হয়নি। আয় বুঝে ব্যয় করাই ছিল আমার নীতি।

তাছাড়া অভাবের মধ্য দিয়ে বড় হওয়ায় আমার আকাঙ্ক্ষাও খুব সামান্য ছিল। আমি বিয়ের আগে কখনও নিজের পয়সায় কোন রেস্টুরেন্টে খাইনি। রিপোর্টারি করার সূত্রে বড় বড় হোটেলে প্রেস কনফারেন্স লেগেই থাকত। কখনও ডিনার, কখনও ককটেল, মাঝে মাঝে কিছু না কিছু কনডাকটেড প্রেসট্যুরে ভালমন্দ জুটত। আমি ভাবতাম যদি এমন জোটে রোজ বিনা পয়সার ভোজ।

আমি ভিড় বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যাই। গ্রামের ছেলে। হাঁটা অভ্যাস বলে বেশি ভিড় দেখলে হাঁটতে শুরু করি। কলকাতা শহরে হাঁটতে আমার ভালই লাগত। দু-এক কিলোমিটারের জন্য আমি কখনও ট্রামে বাসে চড়িনি। নেহাত প্রয়োজনেও বছরে দু-একদিনের বেশি ট্যাক্সি চড়িনি। এই মিতব্যয়িতার জন্য আমি অর্থকষ্টে কখনও ভুগিনি। আমার ভাই গণিতে বেশ সড়গড় ছিল। লেখাপড়ায় খারাপও ছিল না। তার বিষয়বুদ্ধি ছিল যথেষ্ট। আমি চেয়েছিলাম সে যদি ভবিষ্যতে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তাহলে যা খরচ লাগে আমি দেব।

কিন্তু তার পড়াশোনায় মন ছিল না। তখন আমি ঠিক করলাম তাকে সরাসরি রহড়া টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করে দেব। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যালের সমতুল পরীক্ষায় পাশ করে সে পলিটেকনিকে ভর্তি হতে পারবে। আর পলিটেকনিক থেকে পাশ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিও নিয়ে নিতে পারবে।

কিন্তু কিছুদিন টেকনিক্যাল স্কুলে যাওয়ার পর কী একটা ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুল ছেড়ে দেবার নোটিশ দিলেন। আমার মাথায় বজ্রাঘাত। সব শুনে আমি একজন প্রভাবশালী ভদ্রলোককে দিয়ে মহারাজকে অনুরোধ করলাম তার টি সি প্রত্যাহার করতে।

মহারাজ রাজি হলেন। অফিস থেকে ফিরে এই সুখবরটা দেবো ভাবছি।

আমার ভাই বলল—দাদা, তোমাকে আর আমার জন্য চেষ্টা করতে হবে না। আমি সুরেন্দ্রনাথ স্কুলে ক্লাশ নাইনে অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছি। বইপত্রও কিনে ফেলেছি।

স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর আমার ভাইকে আমি কল্যাণী আই টি আইতে ওয়েল্ডিং কোর্সে ভর্তি করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু সেখানে কয়েকটি সমাজবিরোধী ধরনের ছেলে তাকে র‍্যাগিং করতে শুরু করে। পড়া ছেড়ে সে বাড়িতে বসে থাকে। তখন তাকে আমি গড়িয়াহাট আই আই

টিতে ভর্তি করে দিই।

এ সবই সম্ভব হয়েছিল রিপোর্টার হিসাবে প্রভাবশালী মহলে আমার পরিচিতির ফলে। বহু বিশিষ্ট মানুষ আমাকে ভালবাসতেন। তার ফলে শুধু নিজের জন্য নয় বহু অপরিচিত মানুষের অজস্র উপকার করতে পেরেছি। একটা উদাহরণ দেই। সে সময় আমি স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে যেতাম খবরের জন্য। চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ তালুকদার। আই সি এস। আমাকে খুব ভালবাসতেন। একদিন আমি রিসেপশনে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে। সব বড় বড় সরকারি অফিসে রিসেপশনিস্টরা আমায় চিনতেন। আমায় দেখেই রিসেপশনিস্ট বললেন—এই এঁকে ধরুন। যদি কেউ কিছু করতে পারেন ইনিই পারবেন।

দেখি এক মহিলা আর এক তরুণ। দুজনেই উদভ্রান্ত। ছেলেটি আমার পা জড়িয়ে ধরল—আমায় বাঁচান স্যার।

কী হয়েছে?

শুনলাম ছেলেটি স্টেটবাসের কনডাক্টর। তার ব্যাগের ভেতর হিসাব বহির্ভূত কিছু ক্যাশ টাকা পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ছেলেটি তার মাকে নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে এসেছে তার চাকরি বাঁচাতে।

আমি আমার নিজের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য তালুকদার সাহেবকে বললাম, মিঃ তালুকদার, ছেলেটিকে যদি ওয়ার্নিং দিয়ে এবারের মত ছেড়ে দেন। তালুকদার বললেন—আপনাকে ধরেছে বুঝি? বলছেন যখন ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু এদের বিশ্বাস করবেন না। এরা ধরা পড়ে গেলে এমন করে সিমপ্যাথি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে।

বিপন্ন মনুষের জন্য আমার খুব সহানুভূতি হত। এটা হত আমার ফেলে আসা দিন গুলির কথা মনে করে। মানুষ নানাভাবে বিপদে পড়ে আমার কাছে ছুটে আসত। তাদের অনেককে আমি চিনতামই না। আমার বন্ধু ও পরিচিতরা একটি চিরকুট লিখে পাঠাত—একে পাঠালাম। এ খুব বিপদে আছে। এর জন্য কিছু করলে খুশি হবো।

যতক্ষণ না তাদের জন্য কিছু করতে পারতাম ততক্ষণ আমার মধ্যে অস্বস্তি হত। কাজটা হয়ে গেলে আমি ভীষণ তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু আমার জীবনের যত বিপত্তি তা এই পরোপকারের নেশা থেকেই। সেকথা যথাসময় বলব। তবে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বুঝেছি মানুষকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ। এমনকি, নিজের মা বাবা ভাইবোন ছেলেমেয়ে স্ত্রী কাউকে সন্তুষ্ট করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি কিছু প্রত্যাশা না করে শুধু এই কথাই ভাবেন You are Ok, I am Ok. তাহলে সেটাই একমাত্র লাভ। কিন্তু একথা ভাবতে পারে ক'জন?

বাড়িওয়ালার অত্যাচারের পর আমি সর্বপ্রথম চেষ্টা করতে লাগলাম সি আই টি ফ্ল্যাট পাবার জন্য। কারণ প্রাইভেট বাড়ি পাওয়া খুব মুশকিল। আমার পছন্দসই দু কামরার ফ্ল্যাট দুশো-আড়াইশো টাকার নীচে পাওয়া যাবে না। সি আই টি ফ্ল্যাট পেলে সব দিক থেকে সুবিধে।

সে সময় সি আই টির চেয়ারম্যান ছিলেন কে সেন। করুণাকেতন সেন। আই সি

এস অফিসার।

আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে খাতির জমালাম। মাঝে মাঝেই নেতাজী সুভাষ রোডে তাঁর অফিসে যেতাম। ওঁর পিএ ছিলেন পুলকেশ দে সরকার।

পুলকেশবাবুর সঙ্গে দর্পণে আলাপ। ব্রজেনবাবু তাঁর লেখার ভক্ত ছিলেন। ভাল স্যাটায়ার লিখতেন। লেডি রাণুকে নিয়ে ব্যঙ্গ উপন্যাস লেখেন— লেডি রম। অচরণবাদ বলে মনঃস্তত্ত্বের ওপর তাঁর বই ছিল। তিনি আনন্দবাজারের একজন ডাকসাইটে রিপোর্টার ছিলেন। কিন্তু ইনসাবঅরডিনেশনের অভিযোগে তাঁর চাকরি চলে যায়। আমি যতদূর শুনেছি ইগোর সংঘর্ষই ছিল তার কারণ। চাকরি চলে যাবার পর তিনি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে চাকরি পান। এদিকে আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে তাঁর মামলা চলতে থাকে। সে মামলায় তিনি জয়ী হয়ে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। খুব সঙ্গত কারণেই আনন্দবাজারের কর্মীদের পুলকেশবাবু সুনজরে দেখতেন না। আমাদের কাছেও তিনি ছিলেন পার্সোনা নন গ্রাটা। এটি সব কাগজেরই নিয়ম। মালিকেব বিরাগভাজন কর্মীর সঙ্গে বাকী কর্মীরা কথা বলে না। পারলে মালিকের হয়ে তাকে অপমান করে। কিন্তু পুলকেশবাবু আমাকে পছন্দই করতেন, সেটি ব্রজেনবাবুর ছাত্র বলে। আমি কে সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি দেখা করিয়ে দিতেন। উনি ব্যস্ত, দেখা হবে না , একথা বলা অধিকাংশ পি এরই স্বভাব। আমি ওঁকে আমার সমস্যার কথা বললাম। বললাম, আমার একটা ফ্ল্যাটের বড দরকার। বাড়িওয়ালা খুব অত্যাচার করছে।

উনি বললেন—খুব মুশকিল। কদাচিৎ ফ্ল্যাট খালি হয়। কিন্তু মন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া সে সব পাওয়া মুশকিল। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি প্রফুল্লদার কাছ থেকে সুপারিশ আনছি।

প্রফুল্ল সেনের একটা গুণ ছিল তিনি পরিচিত কেউ কিছু প্রার্থনা করলে ফেরাতেন না। একবা· আমাদের ফোটোগ্রাফার বিশ্বনাথ রক্ষিত বাড়ি মেরামত করবেন, সিমেন্ট পাচ্ছিলেন না। তখন সিমেন্ট কন্ট্রোল। পারমিট ছাড়া সিমেন্ট পাওয়া যায় না। সেবার প্রফুল্লদার সঙ্গে আমি ও বিশ্বনাথদা গঙ্গাসাগরে গিয়েছি। বিশুদার পকেটে সিমেন্টের পারিমিটের আবেদনপত্র, একটি অনুষ্ঠানে প্রফুল্লদা সভাপতি। বিশুদা ছবি টবি তুলে কোন ভূমিকা না করে দরখাস্তটি প্রফুল্লদার সামনে রেখে বলেছিলেন—দাদা একটা সই চাই।

প্রফুল্লদা একবার চোখ বুলিয়ে খচখচ করে লিখে দিলেন— রেকমেন্ডেড। আমার ফ্ল্যাটের দরখাস্তেও প্রফুল্লদা রেকমেন্ডেড লিখে দিয়েছিলেন। আমি সেই দরখাস্ত নিয়ে পুলকেশবাবুর কাছে যেতেই তিনি বললেন—আপনার তো দেখছি সবুজ কালীর সুপারিশ।

তার মানে? কালির তারতম্য আছে নাকি?

আছে বৈকী। প্রফুল্লদা তিন রকম কালি ব্যবহার করেন। কালো কালি মানে ইগনোর করো। সবুজ মানে চেষ্টা করে দেখো হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। আর লাল মানে একে যে করে হোক করে দাও।

একবছর ধরে ধরনা দিয়ে যখন ফ্ল্যাট হল না তখন খবর পেলাম সিঁথি রায়পাড়া

বাই লেনে এক কাঠা চোদ্দ ছটাক জমি বিক্রি হবে। দাম পড়বে সাড়ে চার হাজার টাকা। আরও শ পাঁচেক টাকা রেজিস্ট্রি খরচ।

জমিটা গলির ভেতর। কয়েকটি খালি প্লটের শেষ প্লটটি। তারপরেই ড্রেন। সাউথ সিঁথি রোড থেকে তিন মিনিট ভেতরে। সাত আট মিনিট হাটলে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম। সেখান থেকে কলকাতার বাস ছাড়ে। কলকাতা পুরসভার মধ্যে জমি তখন দুর্লভ। আরও একটা বড় আকর্ষণ সামনেই সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর বাড়ি। উল্টোরথের কল্যাণে তখন সব সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তখন আমি তরুণ লেখক তদুপরি আনন্দবাজারে চাকরি করি। সব সাহিত্যিক আমায় পছন্দ করেন। শক্তিপদবাবু মানুষটি ভাল। লেখাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাঁর অনেক ছবি সিনেমা হয়েছে। অজস্র লিখতে পারেন। পাঠক চায় বলে পপুলার কাগজগুলিতে তাঁর লেখা নিয়মিত ছাপা হয়। তিনি চাকরি করেন ডাক-তার বিভাগে। তাঁর সঙ্গে দু চারবার নানা সভাসমিতিতেও গিয়েছি।

বিলেত থেকে ফেরার সময় যে টাকা বেঁচেছিল আর দু বছর ধরে লেখালেখি করে যা পেয়েছিলাম তা মিলিয়ে দেখলাম মাণিকতলা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্টে হাজার ছয়েক টাকার মত আছে।

জমিটি রেজিস্ট্রি করে ফেললাম। ঠিক করলাম আর ফ্ল্যাটের জন্য লোকের দ্বারস্থ হবো না। ওই জমির ওপরেই একটি ছোট্ট বাড়ি বানাবো। রামমোহন রায় রোডের ছোট দিদি আপ্পাদির স্বামী সুশান্ত মুখার্জি ইঞ্জিনিয়ার। তাঁকে দিয়ে বাড়ির প্ল্যান করলাম। শর্ত ছিল তাকে সামান্য হলেও কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে। পঞ্চাশ টাকা নিতে তিনি সম্মত হলেন। তার আগে দর্জির দোকানে আমার স্যুটের টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি। এতে তিনি আমার ওপর খুশি।

কলকাতা কর্পোরেশন থেকে জমির প্ল্যান বার করা খুব কঠিন। ঘুষ না দিলে নাকি প্ল্যান বার করা যায় না। আমার প্রতিজ্ঞা ঘুষ দেব না, নেবও না।

কী আশ্চর্য! চার মাসের মধ্যে আমার বাড়ির প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গেল। একটা পয়সা কাউকে দিইনি। বরং আমি গেলে চিফ আর্কিটেক্ট শ্রীমন্ত ঘোষ আমাকে চা অফার করতেন। প্ল্যানের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন কাউন্সিলার গণপতি সুর আর কুলদা চক্রবর্তী বলে বিল্ডিং বিভাগের এক কর্মচারী।

এবার বাড়ি করার পালা। এখানে এসেই আমি আটকে গেলাম। প্রয়াত কৌতুক অভিনেতা বিমল দেব তখন কনস্ট্রাকশন বোর্ডে কাজ করতেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ আমি নিয়মিত নিউ সেক্রেটারিয়েট কভার করতাম। ইনডাস্ট্রি, লেবর, পাওয়ার হাউসিং সব বিভাগের ডাইরেক্টরেট ওই নিউ সেক্রেটারিয়েটে। বিমলবাবুও ওখানে বসতেন। গেলে মজার মজার গল্প করতেন আর ক্যারিকেচর শোনাতেন। আমায় বললেন, আপনি হাউসিং লোনের দরখাস্ত করুন। কাগজপত্র আমি টাইপ করিয়ে দিচ্ছি। হাউসিং লোনে যেটা সবচেয়ে জটিল ডকুমেন্ট তা হল এস্টিমেট। এছাড়া জমির দলিল, বাড়ির প্ল্যান থেকে শুরু করে নানা ডকুমেন্ট কয়েক কপি করে তৈরি করা সোজা নয়। এসবই করে দিলেন বিমলবাবু।

ত্রিশহাজার টাকার মধ্যে একতলা বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে বলে বিমলবাবু আশ্বাস দিলেন। কিন্তু লোন না পেলে বাড়ি করা সম্ভব নয়। আমার কাছে তখন তিনশ টাকাও নেই।

আমি গৃহনির্মাণ ঋণের দরখাস্ত পেশ করলাম। এখন আমার আর কিছু করার নেই। আমি নিশ্চিন্ত।

মানুষের জানা উচিত সে কোন পর্যন্ত যেতে পারে, কোথায় তার সীমা। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রত্যেকের জীবনেই আসে সাফল্য আর ব্যর্থতার মুহূর্ত। কখনও আসে কাজ করার সময়। কখনও চুপচাপ বসে থাকতে হয় রেজাল্টের জন্য। ভাত চাপিয়ে দেওয়ার পর আর কিছু করার নেই। শুধু লক্ষ্য রাখতে হয় ফ্যান উপচে পড়ে যাচ্ছে কিনা। লোনের দরখাস্ত করে আমি অমন চুপচাপ বসে রইলাম।

১৯৬৪ সালের এক রবিবার প্রভাতের মামীমা আমাকে জরুরি তলব করে পাঠালেন। কদিন ধরে আমার কেন জানি না অনুর কথা খুব মনে হচ্ছিল। অনু স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে। সে কোন কথা বলে না, শুধু সন্ত্রস্ত চোখে একবার তাকিয়ে আবার চলে যায়।

মামীমা কেন ডাকছেন তা জানবার জন্য কৌতূহল হল। তাহলে কি হীরের জন্য নতুন খদ্দেরের সন্ধান এনেছেন রামবাবু?

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাড়িতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়িটি আজ কেমন যেন নিস্তব্ধ। আমি ওপরে যেতেই সেই পুরনো দৃশ্য দেখলাম। তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে মামাবাবু খবরের কাগজ পড়ছেন। কিছুক্ষণ আগে দিবানিদ্রা থেকে উঠেছেন। শ্বেতপাথরের টেবলে রুপোর গ্লাসে খাবার জল। তাতে ঝালর দেওয়া ঢাকনা। পাশে পিকদানি। পানের কৌটো। মামাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কী খবর? অনেকদিন আসো না। সেদিন ফাদার দাতিয়েন এসেছিলেন। বাইবেল নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। উনি যিশুর অলৌকিক কাহিনীর কথা বলছিলেন। মার্ক লিখিত সুসমাচারে নাকি আছে যিশুর হিলিং পাওয়ার ছিল। তিনি স্পর্শ করেই রোগ সারিয়ে দিতে পারতেন। তুমি কি সুপারন্যাচারালে বিশ্বাস কর?

আমি বললাম—কারণ ছাড়া কোন কার্য হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। অসুখ বিসুখ অনেক সময় সাইকো সোমাটিক হয়। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অসুখ সারানো যায়। তবে এসব ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু চিন্তা-ভাবনা করিনি।

এমন সময় মামীমা এলেন।

ও তুমি এসে গেছ? চলো ছাদে চল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম ছাদে কেন? এ বাড়িতে এতদিন আসছি কখনও তো ছাদে যাইনি।

তিনি আমায় ছাদে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছাদে উঠে হাওড়ার সেতু দেখা যাচ্ছে। উত্তরে পরেশনাথের মন্দির। আরও বাড়ির পর বাড়ি। কলকাতা শহরে আছি বটে তবে ছাদ থেকে শহরকে দেখার সুযোগ হয়নি। ছাদে এলে বোঝা যায় কংক্রিটের জঙ্গল কতখানি ঘন। দেখা যায় অনেকখানি খোলা আকাশ। এই সময়টা

আমি অফিসেই থাকি। আজ সকালে ডিউটি ছিল বলেই সন্ধ্যাটা ফাঁকা পেয়েছি।

মামীমা আমাকে বললেন--আমার পাঁচশটা টাকার খুব দরকার। আমার বলতে খুব লজ্জা করছে। দিতে পারবে? আমি একমাসের মধ্যেই দিয়ে দেব। আমি এটু বিব্রত হলাম। সাধারণত টাকা ধার দিতে বা নিতে আমি কুণ্ঠিত হই। টাকা ধার দেওয়া নিয়ে আমার বন্ধু আমার বই এর প্রথম প্রকাশক মৃণালের সঙ্গে সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেছে। আমারই দোষ। আমি টাকার তাগাদা করেছিলাম। কী এমন হত যদি না চাইতাম। তবু মামীমার নিশ্চয়ই প্রচণ্ড দরকার।

আমি বললাম—ও এই কথা। আমি কাল দিয়ে যাবো।

মামীমা বললেন—না, আর একটা কথা আছে।

তারপর একটু থেমে এদিক -ওদিক তাকিয়ে বললেন—আমার খুব ইচ্ছে অনুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দি....।

আমি চমকে উঠলাম। তবে কী আমার অবচেতন মনে আমি কি অনুর কথা ভেবেছিলাম। মেয়েরা পুরুষের মনের কথা টেনে বার করতে পারে।

আমি বললাম—আমি বিয়ের কথা এখন ভাবছি না মামীমা। তাছাড়া অনু তো এখন সবে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে।

না বিয়ে ঠিক হয়ে রইল। তারপর সময় সুবিধা মত।

আমি বললাম, বিয়েথার ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে কথা না বলে আমি কোন কথা দিতে পারছি না।

তাহলে তোমার মাকে একদিন নিয়ে এসো।

মাকে বলবো।

তবে বিয়ের ব্যাপারে একটা শর্ত আছে বাবা। তোমাকে একটা বাড়ি তার আগে তৈরি করতে হবে.....

এবার আমি বেশ অসন্তুষ্ট হলাম।

আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগলে আমি পাগল হয়ে যাই।

আমি বললাম—মামীমা। বাড়ি যদি আমি করি আমার নিজের প্রয়োজনেই করবো। আপনার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য নয়। আর একটা কথা বলি, বিয়ের কথা যখন তুলেছেন, তখন এরপর আর আমার এ বাড়িতে আসা আর উচিত নয়। আমি চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে জানাবো। এই কথা বলে আমি সাহিত্য পরিষদ স্টিটের বাড়ি থেকে নেমে এলাম। মাথাটা দপদপ করে জ্বলছে। খোলা আকাশের নিচে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলাম।

॥ সাতাশ ॥

লালবাজারের অভ্যন্তরে

১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ আমি লালবাজার নিয়মিত কভার করতে শুরু করলাম। প্রথম দিন গিয়েছিলাম হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টার সত্যসুন্দর চক্রবর্তীর হাত ধরে। তিনি

পুলিশ রিপোর্টার হিসাবে নাম করেছিলেন। তিনি আমাকে একতলার পাবলিক ইনফর্মেশন ব্যুরোর ইনচার্জের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

পি আই বি পরিচালিত হয় মহিলা পুলিশের দ্বারা। ওই সেলের প্রথম ও সি মীরা সরকার। তাঁর স্বামী অর্ধেন্দু সরকার ডি ডির চিটিং সেকসনের ওসি। ওই নিঃসন্তান দম্পতির সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এর একটি কারণ অর্ধেন্দুবাবুর বোনের গোবরডাঙ্গায় আমাদের অতি পরিচিত পরিবারে বিবাহ হয়েছিল। বোন বিধবা হলে অর্ধেন্দুবাবু পরম স্নেহে ভাগনে ভাগনিদের মানুষ করে তোলেন। অর্ধেন্দুবাবু পরবর্তীকালে এসি ডিডি হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। আমি ১৯৬১ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত লালবাজার কভার করেছি। তবে ষাটের দশকে ও সত্তরের দশকের পর্যন্ত আমি যেসব দক্ষ অফিসারদের দেখেছি তাঁদের জন্যই কলকাতা পুলিশকে সে সময় তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে। সেই দক্ষ অফিসারদের একজন অর্ধেন্দু সরকার।

লালবাজারকে আমি শুধু খবর সংগ্রহের জায়গা বলে ভাবতাম না। মনে করতাম আমার লেখার মালমশলা যোগাড়ের একটা সোনার খনি। কনস্টেবল থেকে পুলিশ কমিশনার সকলের কাছে ছিল আমার অবারিত দ্বার। লালবাজারে কত বিচিত্র অপরাধী ও বিচিত্র ধরনের অপরাধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। আর একটি দুর্লভ দিকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, সেটি পুলিশের মানবিক মুখ—হিউম্যান ফেস অব পুলিশ। তাদের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা, প্রেম ভালবাসা, ঈর্ষা, ঘৃণা সব কিছুই খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমার ইচ্ছা ছিল লালবাজারকে নিয়ে একটি আলাদা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি।

আমি যখন আনন্দবাজারে যোগ দিলাম তখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন, উপানন্দ মুখোপাধ্যায়।

উপানন্দবাবু রাজশাহীর লোক। তখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে যে সামান্য ক'জন আই.পি.এস. ছিলেন তিনি তাঁদের একজন। সিভিল সার্ভিসে অফিসারদের সিনিয়রিটি বোঝাতে গেলে ব্যাচের উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছিলেন ১৯৩৩ সালেব ব্যাচ। ১৯৩৪ সাল থেকে সার্ভিসে আছেন। উপেনবাবু পুলিশ অফিসার হিসাবে ৫১.ম নাম করেন ১৯৫৪ সালে। অ্যান্টিরাউডি সেকশনের স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে। সে সময় কলকাতায় মেয়েদের ওপর অশালীন ব্যবহার বেড়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্তদের মধ্যে মস্তান শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছিল। জনসাধারণ ডাঃ রায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে তিনি উপানন্দবাবুর ওপর এই দায়িত্ব দেন। সে সময় তিনি রোমিওদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর ভয়ে তখন কলকাতায় উঠতি মস্তানরা বড় চুল রাখতে পারত না। উপানন্দবাবু আগে একাধিকবার কলকাতা পুলিশের অস্থায়ী কমিশনার হয়েছেন। তবে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ তিনি এক নাগাড়ে পুলিশ কমিশনার ছিলেন। ১৯৬২ সালের ১ এপ্রিল থেকে তিনি আই জি হন। চলে যান মহাকরণ।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দোলের পর দিন আমার দুপুর ডিউটি ছিল। দুপুর ডিউটি

মানে ক্রমাগত লালবাজারে আর রেল কন্ট্রোলে ফোন করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর নেওয়া যে কোন ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না। আগের দিন দোল উপলক্ষে কাগজ বন্ধ ছিল। আমার মনে হল দোল কেমন কাটল সে সম্পর্কে পুলিশ কমিশনারের একটা বিবৃতি থাকলে ভাল হয়। আমি লালবাজারে ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম সিপিকে লাইনটা দিন। আমি কথা বলব।

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সেই প্রথম কথা বললাম ফোনে। তিনি বললেন এবার দোল উপলক্ষে গণ্ডগোল হয়নি। জনসাধারণ যথেষ্ট সচেতন হচ্ছে।

এরপরে তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় প্রেস কনফারেন্সে। ১৯৬২ সালের গোড়ায় তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স করলেন। সেখানে বললেন : ১৯৬১ সালে কলকাতায় একটিও ডাকাতি হয়নি। এটা পুলিশের ক্রেডিট।

পাঁচজনের বেশি মিলে অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে যদি লুঠপাঠ করে নেয় তাকে ডাকাতি বলে। পাঁচজনের কম হলে সেটা ছিনতাই হয়ে যায়। আমি দেখেছি কলকাতা পুলিশ পরিসংখ্যান নিয়ে খুবই স্পর্শকাতর। সারা বছর কত খুন বা রাহাজানি হয়েছে পরিসংখ্যান চান, পাবেন না। কারণ তথ্য নিয়ে নানা কারচুপি হয়। লোক কমিয়ে ডাকাতিকে রাহাজানি দেখানো হয়। খুনকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে দেখানো হয়।

তবে ষাটের দশকে কলকাতায় বড় ধরনের অপরাধ হত না সেজন্য যে সব রিপোর্টারদের অপদার্থ মনে করা হত তাদের লালবাজার পাঠানো হত। আমাকে কোন বিট যে দেবেন শিববাবু তা ঠিক করতে পারতেন না। কলকাতার খবরের কাগজে সবচেয়ে সম্মানজনক বিট রাজনৈতিক বিট। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিশে রাজনীতির খবব বার করা।

এই বিটে বানিয়ে খবর লেখার সুযোগ খুব বেশি। আর এই সুযোগটাই রিপোর্টাররা অনেক নিয়ে থাকে। এটা হতে যাচ্ছে। ওটা হতে চলেছে। অমুকের সঙ্গে অমুকের সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে অথবা দুজনের বৈঠকে এই সব আলোচনা হয়েছে বলে মনগড়া যা হোক লিখে পাঠকদের ধাপ্পা দেওয়া খুব সোজা।

কিন্তু অন্যান্য বিটে হার্ড নিউজই বেশি। ঘটনা না ঘটলে খবর হয় না। যদিও আমি মনে করি খবরের কাগজে কোন বিটই ফালতু নয়। সমান গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইউনিভার্সিটি লালবাজার, কর্পোরেশন রিপোর্টারদের কোন ইজ্জৎ নেই।

নির্ধারিত রিপোর্টার না এলেও আমাকে রাজনৈতিক খবর কভার করতে পাঠানো হত না তবে কেউ না এলে আমি মহাকরণে যেতাম। শিববাবু বলে দিয়েছিলে, তুমি যদি চাঁদের থেকে খবর আনো খবর । খবর হলে আমি ছাপব।

সে কথা মনে রেখে আমি সর্বত্র ঘুরতাম খবরের সন্ধানে। যে সব অফিসে রিপোর্টাররা কস্মিনকালেও যায় না আমি সে সব অফিসে যেতাম। তবে লালবাজারেই আমার বেশি ডিউটি থাকত। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত ও একঘেয়ে লাগত লালবাজারে যেতে। কারণ কলকাতা তখন এমন শান্ত শহর যে চুরি, পকেটমার প্রতারণা ছাড়া অপরাধই হয় না। রাজনৈতিক অবস্থাও শান্ত ছিল। ১৯৫৯ সালের পর থেকে আর

কোন বড় ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনও হয়নি। তারপর তো ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চিনা আক্রমণ ঘটল। জরুরী অবস্থা জারি হল। ভারতরক্ষা আইনে বহু লোক গ্রেফতার হল।

উপানন্দবাবুর ঘরে মাঝে মাঝে যেতাম। দেখি তিনি তাঁর ঘরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন। আর একটি পাথরের ফলকে মহাভারতের একটি শ্লোক লিখে রেখেছেন। যেখানে বলা হচ্ছে ঃ রাজ্য সুশাসিত হচ্ছে বোঝা যাবে কখন? না যখন সালঙ্করা নারী নিশুতি রাতে একা রাজপথে দিয়ে হেটে যেতে পারবে।

উপনন্দবাবু আই জি হবার পর ওই শ্বেতপাথরের ফলকটি মহাকরণে আই জির ঘরে নিয়ে যান।

আমি উপনানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার কি মনে হয় শহরের আইন শৃঙ্খলা এখন আদর্শ পর্যায়ে রয়েছে?

উপনানন্দ বাবু বলেছিলেন : কলকাতা এখন বিশ্বের অন্যতম পিসফুল সিটি। তবে তা বলে আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নেই।

উপনান্দবাবুর এক ভাই ও ভাইপো পুলিশে ছিলেন তাঁর ভাইপো বিনয়ের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বিনয় ছিল চিটিং সেকসনের সাব ইনসপেকটর। পরে পার্ক স্ট্রিট থানাব ওসি হয়। এরপর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে প্রমোশান পাওয়ার কিছুদিন পরে তার অকালমৃত্যু হয়।

লালবাজারের সে সময় কোন বড় রিপোর্টার যেত না। একমাত্র অনিল ভট্টাচার্য মাঝে মাঝে যেতেন। আর দেখতাম মাঝে মাঝে মহেন্দ্র চক্রবর্তীকে। কিন্তু এরা বিট রিপোর্টার নন। এরা সিপি, ডিসি হেড কোয়াটার্স বা ডি সি ডি ডির ঘরে বসে খবর নিয়ে চলে আসতেন। আমি তখন জুনিয়র রিপোর্টার। ওঁদের সমকক্ষ নই। কিন্তু আমার একমাত্র বাসনা ছিল ওঁদের মত কনট্যাক্ট তৈরি করার। পুলিশের যেমন কনট্যাকট অপরাধীরা, তেমনি পুলিশ রিপোর্টারের কনট্যাকট বন্ধু পুলিশ। যদিও আমি বলি পুলিশ কখনও বন্ধু হয় না। তবু পুলিশের যদি কেউ বন্ধু হয় রিপোর্টাররাই হয়।

লালবাজারের প্রথম দিনগুলিতে যে সব অফিসারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিসি সেন্ট্রাল শ্যামল মল্লিক। ডিসি ট্রাফিক পাঁচুগোপাল মুখার্জি। এসিডিডি দেবী রায়। ওসি ফ্রড সেকশন তপেন চক্রবর্তী। ডিসিডিডি গোলক মজুমদার। ডিসি হেড কোয়ার্টার্স সুনীল চৌধুরী। জয়েন্ট সিপি কল্যাণ চক্রবর্তী।

শ্যামল মল্লিক আমাকে মাঝে মাঝে রেইডে নিয়ে যেতেন। একবার চৌরঙ্গী রোডে ওয়াই এম সি-এর পাশে একটি বিউটি সেলুন রেইড হল। সেখানে নাকি পতিতাবৃত্তি চলত। গোটা তিনেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে ধরা পড়ল। ওই মেয়েদের একজনের নাম ছিল ব্লুসম। শ্যামলবাবু রসিক লোক ছিলেন। বললেন ঃ ওকে লক আপে পোর। লেট হার ব্লুম (Bloom)।

তবে পরবর্তীকালে ছোট পি. কে. সেন যখন ডিসি ডিডি তখন তিনি আমাকে একটি

রেইডে কারনালী ম্যানসন নিয়ে গিয়েছিলেন।

অনেক দিন ধরে খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে কারনালী ম্যানসনের একটি ফ্ল্যাটে বেশ্যাবৃত্তি চালানো হচ্ছে।

আমি এইসব পুলিশী অভিযানের নাম শুনলে বলতাম, আমায় নিয়ে যাবেন। এটা আমার অভিজ্ঞতা হবে।

উপানন্দ বাবুর ভাই বিনয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন কারনালী এস্টেট অভিযানের নেতা। আমায় বললেন : আপনি ওই ফ্ল্যাটে খদ্দের সেজে প্রথমে ঢুকবেন। আপনি যখন দর দস্তুর করবেন, তখন আমরা বাহিনী নিয়ে হাজির হবো। আমি প্রথমে বেশ রহস্যের গন্ধ পেয়ে রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু পরে বেশ নার্ভাস লাগল। ধর্মের ভাণ ভাল। কিন্তু পাপের ভাণ ভাল কী? তাছাড়া যদি সাক্ষী টাক্ষী দিতে হয়!

আমার বদলে রথীন বলে একজন সাব ইন্সপেক্টরকে পাঠানো হল। রথীনের চেহারাটি ভারি সুন্দর। টকটকে ফর্সা রঙ। লম্বা। তার চেহারার মধ্যে পুলিশি রুক্ষতা নেই।

সে ধুতি পাঞ্জাবি পরে খদ্দের সেজে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল। আসলে দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করায় দালালই তাকে নিয়ে গেল।

আমি শাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি রথীন একটি মেয়ের সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। আর একটি ঘরে আর একটি মেয়ে আর একটি অবাঙালি ছেলে।

পুলিশ ওখানে গিয়ে পড়ায় মধুচক্রে ঘা পড়লে যা হয় তাই হল। জানা গেল রোজই চার-পাঁচটা করে মেয়ে এখানে আসে। দালাল খদ্দের নিয়ে আসে।

পার্ক সার্কাস ও পার্ক স্ট্রিটের দুটো ম্যানসনই এক বিচিত্র জায়গা। ওখানে সম্ভ্রান্ত পরিবাররা বাস করেন আবার কোন কোন ফ্ল্যাটে এই সব অবৈধ কাজকর্মও চলে। অথচ ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা কসমোপলিটন। অনেকটা হোটেলের মত। পাশের ঘরে কি হচ্ছে জানার উপায় নেই।

কয়েকটি মেয়ে ও ফ্ল্যাটের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে চালান দেওয়া হল।

পরদিন লালবাজারে গিয়ে দেখি গতকাল ধরা পড়া একটি মেয়ে বসে আছে বিনয়ের সামনের চেয়ারে। মেয়েটির বয়স তেইশ-চব্বিশ। মোটামুটি সুশ্রী বলা যায়। শ্যামলা গায়ের রঙ। রুখু চুল। মুখটা শুকনো। সে কোন কথা বলছে না। আজ তাকে আদালতে তোলা হয়। জামিন নামঞ্জুর হয়েছে।

বিনয় বলল : মেয়েটি সারাদিন খায়নি। একদম খেতে চাইছে না। বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। আমি বললাম : আমি একটু চেষ্টা করবো?

করুন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কী?

কয়েকবার বলার পর বাংলায় জবাব দিল : শ্যামলী।

আমি বললাম : কোথায় তোমার বাড়ি?

বিডন স্ট্রিটে।

কতদূর পড়েছ?

ক্লাশ সেভেনে উঠে পড়া ছেড়ে দিই।

এ পথে এলে কেন?

সে কোন উত্তর দিল না। আমি বললাম, এপথে এলে বেঁচে ফেরা কঠিন। কত বিপজ্জনক তা তুমি বুঝতে পারছ না।

আপনি আমার চাকরি দেবেন? মেয়েটি এবার রুক্ষ ভাবে বলে উঠল।

আমি বেশ অবাক হলাম আবার সন্তুষ্টও হলাম। কারণ তাকে কথা বলাতে পেরেছি।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ, চাকরি দেব। চাকরি করবে? বিনয় এবার বলল: ইনি একজন বিশিষ্ট লোক। এঁর কথার দাম আছে। আমি বললাম : চাকরি তোমায় দেব। আমার কথা শুনতে হবে। তোমায় আগে খেতে হবে। নাও, খাবারের ঠোঙাটা হাতে তুলে নাও...মেয়েটি ধীরে ধীরে খাবারের ঠোঙা তুলে নিল। তারপর খেতে শুরু করল। কথা হল কেস মিটে গেলে সে বিনয়ের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

মেয়ে পুলিশের একজন এ এস আই এসে শ্যামলীকে ধরে ভ্যানে ওঠাতে নিয়ে গেল। আজও তাকে লিলুয়া উদ্ধার আশ্রমে থাকতে হবে।

আমি ভাবছিলাম আচ্ছা আমি যে চাকরি দেব বললাম, আমি চাকরি কোথায় পাবো? সত্যি সত্যি যদি মেয়েটি আসে। ভাবলাম যদি আসে আভা মাইতির কাছে গিয়ে অনুরোধ করবো। আভা মাইতি ত্রাণমন্ত্রী।

বিনয় বলল : আপনি খাইয়ে দিয়েছেন। এটা আপনার ক্রেডিট। আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনারদের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের। সত্যি সত্যি অনশন করলে ওকে আমাদের হসপিট্যালে ট্রান্সফার করতে হত। তবে আপনার ভয় নেই। চাকরি চাইতে ও কোনদিন আসবে না। এসব মেয়েরা আর চাকরি করে না। আপনি অফার করেছেন ঠিক আছে।

পৃথিবীর এই আদিমতম পেশা সম্পর্কে আমার কৌতূহল অদম্য। আমি এইসব মেয়েদের নিয়ে অনেকগুলি গল্প লিখেছি। তার মধ্যে একটি গল্প 'অন্ধ দেবতা' অনেকেরই ভাল লেগেছিল। অন্ধ দেবতা গল্পটি পেয়েছিলাম সোনাগাছির গণিকাপল্লী থেকে।

লালবাজারে আমি সব বিভাগে ঘুরতাম এবং ইন্সপেক্টর সাব-ইন্সপেক্টর স্তরের অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতাম। ট্রাফিক বিভাগের পরিসংখ্যান বিভাগের ওসি অমল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার এইভাবেই আলাপ। ওঁর শিশুপুত্রের নাম আর আমার নাম এক হওয়ায় তিনি আমার সম্পর্কে বেশি করে আগ্রহী হন।

পুলিশে অনেক অফিসারই চায় এমন জায়গায় পোস্টিং যেখানে পয়সা আছে। আমি শুনেছি কয়েকটি থানা নাকি গোপনে নীলাম হয়। যে বেশি টাকা দেবে সে সেখানে পোস্টিং পাবে। ওই টাকার দুতিনগুণ উঠে আসে।

অমলবাবু থানায় ছিলেন। তিনি থানা থেকে শুকনো জায়গা ওসি স্ট্যাটিসটিক্স পদে

স্বেচ্ছায় বদলি নিয়েছেন নিজে সৎ থাকবেন বলে। খুবই মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তিনি জোড়াবাগান থানায় ছিলেন। সোনাগাছি জোড়াবাগান থানায় পড়ে। তিনি সেখানকার নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনার গল্প করতেন।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত সাহিত রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। তিনি আমার লেখা ছাপতেন। আমার সঙ্গে নানা ব্যক্তিগত বিষয়ে গল্প করতেন। আমি ছাত্রজীবন থেকে তাঁর লেখার ভক্ত। বিশেষ করে লালবাঈ ও প্রথম প্রহর পড়ে মুগ্ধ। তার মত লোকের বন্ধুত্ব আমার কাছে সাত বাজার ধন এক মানিক। ১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব গুহ ও আমি দুজনে এক সঙ্গেই আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে লিখতে শুরু করি। বুদ্ধদেব লিখতেন নানা শিকার কাহিনী। শিকার কাহিনী লিখতে লিখতে বুদ্ধদেববাবু গল্প লেখক হয়ে যান। তারপর আনন্দবাজার পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখে তিনি জনপ্রিয় হন।

রমাপদবাবু আমাকে একদিন বলেন, আমার লেখার জন্য দরকার জন্য হবে আপনি আমায় পুলিশের সঙ্গে সোনাগাছি ঘোরাবার ব্যবস্থা করতে পারেন? আমি তখন অমল বাবুকে বলি। অমলবাবু জোড়াবাগান থানার ওসিকে বলে একটা তারিখ ঠিক করেন। আমি, রমাপদবাবু অমলবাবু ওসি ঠিক জোড়াসাঁকো মিলে একদিন নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়ি।

এক বিচিত্র জগৎ সোনাগাছি। এটি নাকি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ব্রথেল। এখানে যেমন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট আছে তেমনি আবার বস্তিও আছে। আমরা সব রকমের ব্যবস্থাই দেখলাম। যেমন গেরস্তদের মত সাজানো ফ্ল্যাট। দামী খাট, রেডিও সেট, ওয়ারড্রোব, অ্যাটাচ বাথ আবার গরিবদের জন্য ঘুপচি ঘর। তাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয়। রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েরা আমাদের দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা সন্দেহ করছিল আমরা পুলিশের লোক। রেইড করতে এসেছি।

অমলবাবু বলছিলেন : যখন এই থানায় ছিলেন, তখন ব্রথেলে ডিউটি পড়ত। প্রধানত কোন বেআইনি কিছু হচ্ছে কিনা, সেটাই তাঁরা দেখতেন। তাঁদের আসতে দেখে রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েরা এমন ছুট দিত। একদিন দেখলেন, সব মেয়ে দুড়দাড় করে ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। একটি মেয়ে শুধু যেতে পারল না।

অমলবাবু তার কাছে গিয়ে কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা পালাল, তুমি পালালে না কেন? মেয়েটি একটু বিস্মিত হয়ে বলে, ওরা কি কাছেপিঠে কেউ নেই? তাহলে কী পুলিশ দেখে পালিয়েছে?

হ্যাঁ, তুমি পালাওনি কেন?

আমি দেখতে পাইনি। আমি যে অন্ধ বাবু।

অমলবাবু মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন বিশীর্ণ কোটর। চোখের মণিতে দৃষ্টি নেই। মেয়েটি অন্ধ।

এই কাহিনী নিয়ে লিখেছিলাম, অন্ধ দেবতা।

লালবাজারের কথা লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে।

তবে পুলশের খবর পেতে গেলে ডিসিদের ঘরে বসে থাকলে হয় না। পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলি আছে। অফিসারদের মধ্যেও দল আছে। আবার দুজন পদস্থ অফিসারের মধ্যে ইগোর লড়াইও দেখেছি।

গোয়েন্দা বিভাগে অনেকগুলি শাখা। তার মধ্যে জালিয়াতি নিরোধ শাখার ওসি ছিলেন তপেন চক্রবর্তী। পরে তিনি লালবাজার থেকে এন্টালি থানার ওসি হয়েছিলেন।

লালবাজারে অনেক ইন্টারেস্টিং খবর আমি কভার করেছি। এর মধ্যে অনেক মজার ঘটনা ছিল। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাংবাদিক এক বয়স্কা বাঙালি মহিলাকে উত্ত্যক্ত করতেন। ওই মহিলার অভিযোগ মত সাংবাদিককে গ্রেফতার করে আনা হল। তারপর লালবাজারে আসামীকে পেয়ে ওই মহিলা পুলিশের সামনেই ওই সাংবাদিককে জুতো দিয়ে পেটাতে লাগলেন। এ আমার নিজের দেখা ঘটনা।

দেখলাম নোট ডবল করার জালিয়াতির নায়ককে। কলকাতার সেরা মহিলা পকেটমারকে যাকে দেখলে সাধারণ শ্রমজীবী মহিলা বলে মনে হবে। দেখলাম এক বিদূষী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে। সে ও তার কেমিস্ট স্বামী লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা করে বেড়াত।

অপরাধীদের দেখতে খুবই নিরীহ। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তারা সবাই কান্নাকাটি করে। কাঁচমাচু মুখ করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু লালবাজারে একবার গেলে কোন অভিযুক্ত আর অক্ষত দেহে ফিরতে পারে না। আমি নিজে দেখেছি লালবাজারের ওসিদের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ঘরে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া হচ্ছে। ভেসে আসছে আর্তনাদ। প্রথম প্রথম অস্বস্তি হত। পরে গা সওয়া হয়ে যায়।

পুলিশের সঙ্গে রিপোর্টারদের কাজের ধারা এবং মানসিকতারও মিল আছে। প্রথমে কাজের ধারার কথা বলা যাক। রিপোর্টার ও পুলিশ যদি মনে করে তাহলে মানুষের প্রচণ্ড উপকার ও প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। দুজনেই সিনিক। দুটি প্রফেশনের গোড়ার কথা হল কাউকে বিশ্বাস কোর না। কারণ মানুষ মুখে এক পেটে এক। বদমায়েশ লোকেরা সাধু সেজে থাকে। ভাল ভাল কথা বলে। প্রয়োজনে পরম বিনয়ী ও বোকা সাজে। কিন্তু আসলে সে দারুণ ধড়িবাজ।

লালবাজারে আমি দাগী অপরাধীদের দেখতাম ভেড়ার মত আচরণ করছে। কী বিনয়। কী ভদ্রতা। যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না। অথচ সেই লোকের ক্রিমিন্যাল রেকর্ড দেখলাম চার-পাঁচটা খুন করেছে।

রিপোর্টার হিসাবেও এমন একজনকে অপরাধীকেও পাইনি যিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি কবুল করেছেন। লাখ লাখ টাকা চুরির অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, অভিযোগ কী সত্যি? তিনি বলছেন, সব ঝুট হ্যায়। আমাকে ফাঁসানোর জন্যই পুলিশের চক্রান্ত।

পুলিশ যেমন একেসেস করে, ধরে আনতে বলে বেঁধে আনে, বেঁধে আনতে বললে মারতে মারতে নিয়ে আসে, রিপোর্টারও হামেশা একসেস করে। একে তো তিলকে,

তাল করে। তারপর যদি দেখা যায় মালিক লোকটির প্রতি সদয় নয়, রিপোর্টার তখন বেপরোয়া হয়ে যায়। পুলিশ যেমন পুলিশের মাংস খায়, রিপোর্টার তেমনি রিপোর্টারের মাংস খায়। বিশেষ করে বাংলা কাগজের মধ্যে খেয়োখেয়ি সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হল বাংলা খবরের কাগজে বিশ্বাসযোগ্যতাকে কম মূল্য দেওয়া হয়। চাঞ্চল্যই এখানে শেষ কথা। নাটক ও চমক সৃষ্টি করার জন্য এখানে উৎসাহ দেওয়া হয় কারণ পাঠকের বড় অংশ অর্ধশিক্ষিত। এই অর্ধশিক্ষিত পাঠকের তোয়াজ করতে গিয়ে রিপোর্টারের মানসিকতাও নিম্নগামী হয়ে যায়। পুলিশকে সহকর্মীর বিরুদ্ধে ওয়াচ লাগাতে দেখেছি। সাংবাদিক জীবনেও দেখলাম সহকর্মীদের অনেকে নিজের চেয়ে অন্যের জীবন সম্পর্কেই বেশি উৎসাহী। নিজের ওঠাটা সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না অন্যকে নামানো না যায়। তবু সাংবাদিকদের মধ্যে ভাল লোক নিশ্চয়ই আছে। যেমন পুলিশের মধ্যে আছে। তাঁরা কেউ বেশি দূর উঠতে পারেননি। আবার উঠলেও টিকে থাকতে পারেননি। ধপাস করে পড়ে গেছেন। নিপাট ভদ্রলোকদের পক্ষে এই দুই প্রফেসন থেকে বেতন ছাড়া কিছুই পাওয়ার নেই।

পুলিশে এমন একজন লোকের কথা বলি তিনি শচীন্দ্রমোহন ঘোষ। উপানন্দবাবু আই জি হয়ে মহাকরণ চলে যাবার পর তিনি সি পি হন।

সে সময় আই পি দের মধ্যে যেমন উপানন্দবাবু, রঞ্জিত গুপ্ত, পি.কে. সেন, দেবব্রত ধর নানা কারণে জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন, শচীন্দ্র মোহনের নামের অতটা পরিচিতি ছিল না। কাজেই উপানন্দবাবুর পর কে সিপি হবে তা নিয়ে সাংবাদিকদেব মধ্যে নানা মতাভিমত ছিল। আমি শচীনবাবুর সিপি হবার খবর আগাম দিয়েছিলাম।

শচীন্দ্রমোহন ঘোষ সিপির আসনে বসলে আমি তাঁর ঘরে নিয়মিত যাতাযাত শুরু করি। ১৯৬২ সালের ১ এপ্রিল শচীনবাবু পুলিশ কমিশনার হন। চীনা আক্রমণেব সময়টা শচীনবাবু কলকাতার পুলিশ কমিশনার। ওই সময় সিভিল ডিফেন্সের কাজ কর্ম পুলিশের সহায়তায় হতে থাকে। যদিও সিভিল ডিফেন্স নামে আর একটি আলাদা দফতরই তৈরি হয়।

শচীনবাবুকে সবাই বলত ঘোষসাহেব। উপানন্দবাবুর মত টিপিক্যাল পুলিশি চেহারা নয়। শ্যামবর্ণ, মাঝারি হাইটের মধ্যবিত্ত বাঙালিসুলভ চেহারা। কথা বলেন খুব কম। যেটুকু বলেন, সেটুকুও ধীরে ধীরে। আমলাতন্ত্রের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলতে অভ্যস্ত। কাউকে রেয়াৎ করেন না। নিজস্ব ফেভারিট নেই। নিজস্ব গ্রুপ নেই। আড্ডা দেন না। ধূমপান করেন না। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় অফিসে আসেন, ঠিক সময় চলে যান। ঘরে গেলে ভদ্র ব্যবহারে কার্পণ্য করেন না।

আমার এক বন্ধু ছিল সৌম্যেন দত্ত। সৌম্যেন জার্নালিজমে ডিপ্লোমা নিয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ঢুকল। আমি সৌম্যেন একই বছর চাকরিতে ঢুকি। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস চাকরি করার পর সৌম্যেনের চাকরি গেল। তখন সৌম্যেন রাসবিহারী এভিনিউতে একটি শাড়ীর দোকান দেয়।

সৌম্যেনের সঙ্গে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। কারণ সে একটু আলাদা

ধরনের ছেলে। ভদ্র। মার্জিত। প্রকৃত শিক্ষিত। নিয়মিত বই টই পড়ে। এই ধরনের ছেলেরা ব্যবসায়ে এলে হয় ব্যবসা খুব ভাল চলে, নয়তো ডুবে যায়।

সৌম্যেন শাড়ি ক্রেতাদের নিয়ে লাকি কুপন করে একটা লটারি করবে ঠিক করল। সেলস প্রমোশনের একটি মাধ্যম এটি।

আমায় বলল : তোমার সঙ্গে তো পুলিশ কমিশনারের খুব খাতির। আমার লাকি ড্র এর দিন তুমি সিপিকে এনে দেবে? আমি তাঁর হাত দিয়ে পুরস্কার দেওয়াবো।

আমি শচীনবাবুকে বলতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। প্রথামত সৌম্যেন একটি চিঠি করে দিল। ঠিক সে সময় সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত (তখন সে আনন্দবাজারে পুরোপুরি জয়েন করেনি) আমাকে বলল : চলো ক দিনের জন্য পুরী ঘরে আসি। সুনীল সেনগুপ্ত আর এস পির শ্রমিক ও বৌদি বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছেন। আমি ও বিজলী যাচ্ছি। তুমিও চলো।

আমি হুজুগে লোক। হঠাৎ হঠাৎ বাইরে চলে যাই। আড্ডায় জমে গিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরি মাঝে মাঝে। বৈচিত্র্যকেই আমি মনে করি জীবন। পুরী আমি আগে কখনও যাইনি। তাই এই সুযোগ ছাড়লাম না।

যাবার আগে সিপিকে বলে গেলাম, আপনাকে সৌম্যেন দত্ত এসে নিয়ে যাবে ওই দিন। সৌম্যেনকে আপনি টিপিক্যাল কাপড় ব্যবসায়ী ভাববেন না মিঃ ঘোষ। ও একজন এক্স জার্নালিস্ট। একজন ইনটেলেকচ্যুয়াল। শচীনবাবু বললেন : ওঁর আসার দরকার নেই। আমি কথা দিয়েছি যখন তখন বিরাট কিছু গণ্ডগোল না হলে নিশ্চয়ই যাবো।

আমরা প্রথমে গেলাম ভুবনেশ্বর। উঠেছিলাম পান্থনিবাসে। ভুবনেশ্বর থেকে বাসে পৌছলাম পুরী। চক্রতীর্থে এক বাঙালি হোটেলে উঠলাম।

সমুদ্র আমায় ভীষণ ভাবে টানে। আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর একা পনের দিন দীঘায় গিয়েছিলাম। একা তো আর থাকা হয় না। বন্ধু জুটে যায়। দীঘাতেও বন্ধু-বান্ধব জুটে গিয়েছিল। সে সময় দীঘা সত্যিই নির্জন সৈকত। ঝাউগাছের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন মিলে-মিশে এক নতুন ধরনের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করত। যা এখনও আমার কানে বাজে। এই মর্মরধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু তারপর এক এক সময় মাঝরাতে যখন সমুদ্রের গোঙানি বন্ধ হয়ে যেত। ঝাউগাছের পাতা বাতাসের অভাবে নিষ্পন্দ হয়ে যেত, হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হত আমি বোধ হয় মৃত্যুপুরীতে চলে এসেছি যেখানে নিঃশব্দই প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে।

বহু বছর পরে আবার সেই বঙ্গোপসাগরকে দেখলাম পুরীতে। এর মাঝে কেটে গেছে পাঁচটি বছর। কত সাগর জলে সিনান করেছি এই পাঁচবছরে। অ্যাটলান্টিক, নর্থ সি, যুগোস্লাভিয়া ও ইতালিকে ভাগ করেছে যে আড্রিয়াটিক, গ্রিসের চরণকমলে প্রবাহিতা অ্যাজেনান সমুদ্র। সব সমুদ্রের কি এক রূপ? কৃষ্ণসাগরের জল কালো নয়।, লোহিত সাগরের জল লাল নয়, সব সমুদ্রেই ঘোলা জল। সব সাগরই প্রবল আক্রোশে ঢেউ এর পর ঢেউ তেড়ে আসে সৈকতের দিকে। কিন্তু তার আগেই ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু তবু মনে হয় পুরী পুরীই। তা অনন্যা। পুরীর সমুদ্র স্নানের কোন বিকল্প

নেই।

আমরা গিয়েছিলাম গ্রীষ্মকালে। বলা যায় তখন পুরীর ফুল সিজন। বিচে বসলেই দেখা হয়ে যায় কিছু পরিচিতের সঙ্গে।

ওমা, আপনি?

আরে তুমি?

কবে এলে?

কাল? তুমি?

আজ এই মাত্র।

এই ধরনের কথা শুনতে পাই সন্ধ্যার পর বিচে, যেখানে অতি কর্মব্যস্ত, মানুষও ফিরে পায় তার যৌবনকে। যুবক ফিরে পায় তার শৈশবকে। সে তৈরি করতে বসে যায় বালুর প্রাসাদ। নাম লেখে বালির ওপর—সাগরের ঢেউ এসে বার বার মুছে দেবে জেনেও।

পুরীর মন্দির টন্দির দেখে আমরা একটা গাড়ি নিয়ে গেলাম খাজুরাহো। অমন সুন্দর একটা ভাস্কর্যকে কামসূত্রের অ্যালবাম বানানোর মধ্যে যে কী দর্শন লুকিয়ে আছে তা আমার বোধগম্য নয়।

সুখরঞ্জন তখন নববিবাহিতা। বউ বিজলীও সঙ্গে এসেছে।

সুনীল সেনগুপ্ত কোনারকের চত্বরে দাঁড়িয়ে আমায় চুপি চুপি বললেন : ওরা নতুন বিয়ে করেছে। ওরা একটু আলাদা করে দেখুক। আমরা আসুন, এখানে বসে চা খাই।

ছুটি কাটিয়ে ফেরার ট্রেন ধরলাম।

কদিনের হৈ হৈতে কলকাতার কাগজ দেখার সময় পাইনি। সুনীলবাবুর ছোট ছোট দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়, বছর বারো বয়স। ছেলে রন্তিদেবের বয়স আট। দুজনেই আমার ভীষণ নেওটা হয়ে গেছে। গল্প বলো কাকু, গল্প বলো। আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি ভূতের গল্প। হঠাৎ এক যাত্রীর কাছে দেখলাম সেদিনের আনন্দবাজার। খবর বুভুক্ষ মনটা নেচে উঠল।

পাতা ওলটাতে গিয়ে ভিতরের পাতায় একটি ছোট্ট খবর চোখে পড়ে গেল। কাপড়ের দোকানের মালিক গ্রেফতার। বিনা অনুমতিতে লাকি ড্র লটারি করার অভিযোগ বালিগঞ্জের এক শাড়ির দোকানের মালিক সৌম্যেন দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চমকে উঠলাম। এতদিনকার এই সুখ ভ্রমণ বিস্বাদ ঠেকল। কী হল? কোথায় গণ্ডগোল হল? সৌম্যেন গ্রেফতার হল কেন? এর মধ্যে কি এমন কিছু গভীর ষড়যন্ত্র আছে?

রন্তি বলল : কী ভাবছ ও কাকু, বল না তারপর সেই ভূতগুলো কোথায় গেল?

ছেলেবেলার সেই গল্প শোনার দিনগুলো কোথায় হারিয়ে যায়। কোথায় মিলিয়ে যায় শৈশবের সেই কল্পনার ভূতগুলো। মানুষ যে কতবার জন্মায়, কতবার মরে তার

ইয়ত্তা নেই।

শুধু লেখককেই সব কিছু মনে রাখতে হয়। স্মৃতির শতদল সব সময় নয়। স্মৃতির পাঁকও হাতড়াতে হয়। কারণ জঞ্জাল পুড়িয়েই পাওয়া যায় নতুন করে গড়ার উপাদান। তাই আর সবাই ভুললেও লেখক কিছুই ভুলতে পারে না। অন্য মানুষেরা যখন বড় হয় তখন আচমকা দর্পণে শৈশবের মুখ দেখে অবাক হয়ে ভাবতে বসে, এই আমি কী সেই আমি? আমি কী এমন ছিলাম? এই কথা বলেছিলাম? এমনই বিস্ময় ছিল আমার সেদিনের চোখে?

কলকাতায় ফিরে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যেনকে ফোন করলাম।

ফোন ধরল সৌম্যেন।

আমি পার্থ বলছি, কাগজে দেখলাম—

তুমি কবে ফিরলে? ও সে আর বোল না। আমি তো যথাসময় ঘোষ সাহেবকে আনতে গিয়েছি। তিনি বললেন : লটারি যে করছেন গভর্মেন্টের পারমিশান নিয়েছেন? আমি বললাম পারমিশান? আমি তো জানি না স্যার, এর জন্য পারমিশান নিতে হয়। ঘোষ সাহেব বললেন : ইগনরান্স অব ল ইজ নো এক্সকিউজ। মাফ করবেন মিঃ দত্ত। আমি আপনার অনুষ্ঠানে যেতে পারছি না। আমি তো মন-খারাপ করে চলে এলাম। অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এখন আমি কী বলি তাদের? বলতে হল সত্যি কথা। পুলিশ পারমিশান পাওয়া গেল না।

কিন্তু তাতেও পার পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে দেখি এনফোর্সমেন্ট থেকে দুজন অফিসার এসে হাজির। আমাকে বেআইনি ভাবে লটারি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে অবশ্য বুঝিয়ে শুনিয়ে কেসটা মিটিয়েছি। লটারি তো আর করিনি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছি...ঘোষ সাহেবকে দণ্ডবৎ জানালাম। একজন সৎ পুলিশ অফিসার হিসাবে তিনি ঠিকই করেছেন।

আমি বা সৌম্যেন আমরা না জেনে এরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়ছিলাম। আমারও শিক্ষা হল। ভুলের মধ্য দিয়ে বার বার শিক্ষা হয়। লন্ডনে অমৃতবাজারের প্রতিনিধি সুন্দর কাবাডি আমাকে বলেছিলেন, চ্যাটার্জি এই প্রফেসনে আমরা বার বার ভুলের মধ্যে দিয়ে শিখি। ট্রায়াল দিতে গেলেই ভুল হবে।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে আছে। মন কতগুলো সরু তার দিয়ে বাঁধা। একটু অসতর্ক টান পড়লেই একটা না একটা তার ছিঁড়ে যায়। তখন বেসুরো বাজে। অথচ তাড়াতাড়ি তার জোড়া দেওয়ারও উপায় নেই। এ তার জোড়া যায় শুধু সময়ের আঠায়। দিন সাতেক পরে সব ভুলে যাবো। তখন আর মনটা খচ খচ করবে না।

রাতের খাওয়া সেরে বসে বসে নানা রাজ্যের চিন্তা মাথায় এল। বাড়ির লোনের দরখাস্ত জমা দিয়েছি। এখনও কোন সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকায় বাড়ি হবে কী ? ত্রিশ টাকা বর্গফুট হিসাবে বাড়ি তৈরির খরচ ধরা হয়েছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে চল্লিশ টাকার কম হবে বলে মনে হয় না।

সাহিত্যিক মনোজ বসুর কাছে একটি চিঠি লিখব ঠিক করলাম। বেঙ্গল পাবলিশার্সে

ইউরোপের সূর্য বইটি ছাপতে দিয়েছি। মনোজদা আগ্রহ ভরে নিয়েছেন। যদি কিছু টাকা উনি দেন তো ভীষণ কাজে লাগে। এর একটু ইতিহাস আছে।

আমাকে মনোজদা প্রায়ই বলতেন—আমায় একটা বই দাও।

এ পর্যন্ত আমার চারটি বই বেরিয়েছে। দেখ অদেখা দূরের আকাশ, বিলেত দেশটা মাটির ও দ্বিতীয় পৃথিবী কিন্তু ইউরোপের সূর্য বই হয়ে বেরোয়নি। এই বইটি আমি খুব নিষ্ঠা নিয়ে লিখেছি। সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বইটির ভাষা। আমার বিশ্বাস এ বই-এর ভাষায় সাহিত্যরস রয়েছে। খুব বিশ্বাস বইটিকে লোকে একদিন পথে প্রবাসে, দেশে বিদেশের সমতুল বলে গণ্য করবে। এখন অবশ্য আমি আর ওই ভাষা ব্যবহার করি না।

মনোজদা বই চাইতে ইউরোপের সূর্যের পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হয়েছিলাম মনোজদার বালিগঞ্জের বাড়িতে।

সব সাহিত্যিকদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে মনের মত বাড়ি করবেন। লেখার ঘর লাইব্রেরি সাজাবেন। আমি রায়পাড়া বাইলেনে যে বাড়ির প্ল্যান করেছিলাম তার মধ্যে লেখার ঘরের প্ল্যান ছিল। মনোজদার বাড়ি বিবেকানন্দ পার্কের পিছনে। বাড়ির একাংশ ডিভিসিকে ভাড়া দেওয়া ছিল। তাঁরা গেস্ট হাউস করেছিলেন। মনোজদার ঘরে নাকি এয়ারকুলার ছিল। তখন বসতবাড়িতে এয়ারকুলার বসানোর রেওয়াজ ছিল না, এখন যেমন হয়েছে। মনোজবাবু আমার ছোটবেলার প্রিয় লেখক। তাঁর ভুলি নাই, বনমর্মর ওগো বধূ সুন্দরী, বাঁশের কেল্লা সমস্ত বই এক সময় গোগ্রাসে পড়েছি।

তাঁর মত মানুষ যেচে আমার বই চাইছেন আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে মনোজদাকে দিয়েছিলাম। তিনি দু চারপাতা পড়ে বললেন—গুরুটা ঠিক যুৎসই হোল না। অমিতাভর অন্যনগরদর্শনটা পড়িছো? কেমন দারুণ বিগিনিং দেছে—এয়ারপোর্ট থেকে নামতি ঠাশ ঠাশ চড়—এই ভাবে শুরু হচ্ছে। ও চড় যেন লেখকের গালে নয়। পাঠকের গালে আসি পড়ল। চড় খেয়ে পাঠক চাঙ্গা। এমন বিগনিং করবা যাতি পাঠক তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকে।

আমি বললাম—তাহলে ক্যামন হওয়া উচিত?

উনি বললেন—তুমি লেখক তুমি সেটা ঠিক করবা। যাও বিগিনিংটা নতুন করে লিখে নে এসো।

আমি পরিচ্ছদটা নতুন করে লিখে নিয়ে আবার গেলাম।

বললেন—কী লিখেছ পড়। তিনি এবার আমি পড়লাম—একটানা কুয়াশা কাটিয়ে প্যারির বিমানবন্দরে যখন নামলাম, তখন কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করল, 'আজি কি মধুর মুরতি হেরিনু।'

— ভেরি গুড। তারপর?

আমি আবার পড়লাম—এয়ার পোর্ট টাওয়ারের ঠিক মাথার ওপর এখন সকাল দশটার স্বাস্থ্যবান সূর্য। মুঠো মুঠো সোনালি রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে রানওয়ের বিস্তীর্ণ চত্বরে। যাত্রীরা উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে উঠছে। কেউ তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে।

সোনালী সূর্যের প্রতিবিম্ব সকল মানুষের চোখে মুখে।

মনোজদা বললেন—ঠিক আছে। আর পড়ার দরকার নেই। তুমি এবার কাজ করো। এটা কোথাও ছাপায়ে আনো।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, আপনি বলছেন কোথাও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে?

হ্যাঁ। পারবা না? ধারাবাহিক লেখা বেরুলি পাবলিসিটি হয়। বিক্রির সুবিধে হয়। দেশে ছাপাতে পারবা না?

আমি বললাম—অসম্ভব। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে ছাপা যেত কিন্তু আমি সেভাবে লেখাটা লিখিনি। এটা সাহিত্যের মত করে লিখেছি।

মনোজদা বললেন—তাহলি প্রাণতোষ ঘটকের কাছে যাও। আমি বলি রেখে দেবানে। তুমি ওরে কপি দিয়ে দাও।

মাসিক বসুমতীর গৌরব তখনও অস্ত যায়নি। ভারতবর্ষ ও প্রবাসী অস্তাচালে। কিন্তু মাসিক বসুমতী সগৌরবে চলছে। বিশাল মোটা বই। কত কী যে থাকে তার মধ্যে। অনেক লেখা ক্ষুদে ক্ষুদে আট পয়েন্টে ছাপা হয়। ডিসপ্লের বালাই নেই। কিন্তু খুঁটিয়ে পড়তে পারলে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া। প্রবাসী বাঙালিদের খুব প্রিয়। একটা মাসিক বসুমতী কিনলে সারা মাস ধরে পড়া যায়।

মাসিক বসুমতীতে আমার কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছে। প্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তবে তাঁর দুই সহকারী শান্তি ও কল্যাণাক্ষকে ডিঙিয়ে প্রাণতোষদার কাছে যাওয়া কঠিন। কিন্তু কল্যাণাক্ষকে বন্ধু করতে পেরেছি।

কল্যাণাক্ষ গুণী ছেলে। কলকাতার বনেদী বড়লোকের ছেলে কল্যাণাক্ষ বসুমতীর সহ-সম্পাদক কাম প্রুফ রিডার হয়েই সারা জীবন কাটিয়ে গেল। পুরনো কলকাতার ইতিহাস ছিল তার কণ্ঠস্থ। বনেদী কলকাতাকে সে গভীরভাবে চিনত। আমার ধারণা প্রাণতোষদার কলকাতা চর্চার পিছনে ছিল তারই সক্রিয় সাহায্য।

উচ্চাশা না থাকলে প্রতিভা একদম পঙ্গু। উচ্চাশাকে ভর করেই প্রতিভা আকাশে ডানা মেলে। আবার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হওয়া চাই।

কল্যাণ আমায় একদিন বিখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর পান ভোজনের মধ্য দিয়ে সেদিনের স্মরণীয় সন্ধ্যা কাটে দেবীপ্রসাদের স্টুডিওতে।

প্রাণতোষদাকে মনোজ দা বলে রেখেছিলেন। লেখা দিতেই তিনি বললেন—তুমি আমাকে সরাসরি লেখা দিতে পারতে। আবার মনোজদাকে বলতে গেলে কেন? তুমি কি আমাকে চেনো না?

আমি বললাম—এটা বড লেখা তাই.....

প্রাণতোষদা আর কথা বাড়ালেন না।

ইউরোপের সূর্য সাত আট কিস্তিতে প্রকাশিত হল। ধারাবাহিক লেখার ক্লিপিং করে ফাইল দিয়ে এসেছিলাম মনোজদার হাতে। মনোজদা বলেছিলেন—এবার ঠিক আছে।

মনোজদাকে তাই চিঠি লিখছিলাম। ইউরোপের সূর্য মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হবার পর অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ নির্বাসিতের আত্মকথা লিখে স্বনামধন্য। বিখ্যাত বিপ্লবী। গণেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল পাবলিশার্স বলে একটি প্রকাশনা করেছিলেন। গণেন্দ্রবাবু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, উনি ইউরোপের সূর্য ছাপবেন। কিন্তু আমি তাঁকে জানালাম, বইটি আমি বেঙ্গলকে দেব বলেছি। মনোজদাকে চিঠি লিখলাম—মনোজদা কিছু টাকার বড় দরকার। ইউরোপের সূর্যবাবদ যদি কিছু টাকা আমাকে দেন। আমি আসছে রবিবার আপনার কাছে যাচ্ছি। ইউরোপের সূর্য একজন অভিজাত প্রকাশক নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই বইটি আপনাকেই দিয়েছি।

রবিবার দিন সকালে মনোজদার বাড়িতে গেলাম। কিছুক্ষণ বসার পর তিনি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলেন। হাতে আমার পাণ্ডুলিপির ফাইল। দাঁড়ানো অবস্থায় দড়াম করে সেটি টেবলের ওপর ফেলে দিয়ে তিনি বললেন—তুমি লিখিছ কোন এক অভিজাত প্রকাশক তোমার এ বই বার করতি চায়। যাও, সেই অভিজাত প্রকাশকরে বইটা দাও।

আমি বললাম—আমি তা বলিনি মনোজদা।

মনোজদা খুব তাচ্ছিল্য ভরে বললেন—

না-না তুমি সেই অভিজাতের কাছে যাও। আমি তোমার বই ছাপব না নে—

আর কালবিলম্ব না করে মনোজদা ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমি পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিয়ে ভুলি নাই এর লেখকের কাছ থেকে আর একটি শিক্ষা নিলাম, যেখানে সেখানে অকপট হতে নেই। অনেক কথা নিজের মধ্যেই রাখতে হয়। মনোজদার কাছে আর একজন প্রকাশকের নাম নেওয়া উচিত হয়নি।

।। আঠাশ ।।

এই করেছ ভাল নিঠুর হে

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটে মামীমার সেদিনের নাটকের পর আর যাইনি। মামীমা অবশ্য লোক দিয়ে পাঁচশ টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আরও নাটক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

একদিন রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই মা বললেন—আজ খুব একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে। এক ভদ্রমহিলা দুটি বড় বড় ছেলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে কড়া নাড়ছিলেন। আমি ভাবলাম বুঝি তুমি এলে। দরজা খুলতেই দেখি অপরিচিত লোক। তবু মেয়েমানুষ দেখে আমি দরজা খুললাম।

দরজা খুলতেই ভদ্রমিহলা ঢুকে হাউমাউ করে বললেন—আমার মেয়েকে আপনার ছেলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে শিগ্রী বলুন। আপনার ছেলে পার্থ কোথায়?

আমি বললাম— সে তো অফিস থেকে এখন ফেরেনি। আপনারা কারা?

ভদ্রমহিলা বললেন—আমি পার্থর বন্ধু প্রভাতের মামীমা। আপনার ছেলে

আপনাকে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলেনি? সে আমাদের বাড়ি নিয়মিত আসে।

আমার মনে পড়ল তুই একবার বলেছিলি বটে, তোর এক ইউনিভার্সিটির বন্ধুর মামার বাড়িতে তুই মাঝে মাঝে যাস। পাকিস্তানে নাকি জমিদারি ছিল। কিন্তু তারা কী বলছে বুঝতে পারলাম না।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে দুটো যোয়ান ছেলে এসেছিল। শুনলাম তারা ওঁর আত্মীয়। বরানগরে না কোথায় থাকে।

তারা বলল—এঁর মেজ মেয়ে সুতনুকা আজ দুদিন ধরে নিখোঁজ। ওঁদের সন্দেহ তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে বলে মনে হল। সুতনুকা নিখোঁজ হল কেন? ওদের বাড়ির মেয়েদের মধ্যে ওই মেয়েটাই সবচেয়ে সপ্রতিভ। কিন্তু আমার সঙ্গে কারও একান্তে কথা বলার কখনও সুযোগ হয়নি। আমি তার মনের কথা কিছুই জানি না। তাছাড়া হিসাব করে দেখলাম অন্তত চার-পাঁচ মাস ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

আমার সব সময় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। বিপদের পূর্বাভাস অনেক আগে থেকে পাই। মনে হল কোথায় একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে। সব কথা খুলে বলে পুলিশ কমিশনার শচীন্দ্রমোহন ঘোষের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তিনি আমায় কোন সাহায্য করতে রাজি হলেন না।

সারারাত ঘুমতে পারলাম না। নিজের ওপরই আফসোস হল। আমি কেন এমন একটা গোলমেলে পরিবারের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। যে প্রভাতকে কেন্দ্র করে তার মামার বাড়ির সঙ্গে পরিচয় সেই প্রভাতই এখন দেশে ফিরে গিয়ে কলেজে পড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই। আমি শুধু জীবন থেকে নাটক খোঁজবার জন্য বার বার স্বাভাবিক পথ থেকে সরে গিয়ে গলি ঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়ি। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই আমি এই ঝুঁকি নেই। সাংবাদিকতা আমাকে শিখিয়েছে ঘরের কোণে নিশ্চিত আরাম আর গতানুগতিক জীবনের মধ্যে আটকে থাকলে বিচিত্র জীবনকে গভীরভাবে দেখা সম্ভব নয়।

নিজেই নিজের মধ্যে বল সঞ্চয় করলাম। আমি কারও সঙ্গে কখনও শঠতা, প্রবঞ্চনা করিনি। যদি বিপদ আসে তার মুখোমুখি হবো। এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে যাবেই। কিন্তু আমার দারুণ কৌতূহল হল জানতে সুতনুকা কেন বাড়ি থেকে পালাল?

পরদিন অফিসে দুপুরে ডিউটি দিচ্ছি এমন সময় মিসিং স্কোয়াড থেকে শাদা পোশাকের দুজন পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি পুলিশ রিপোর্টার। পুলিশের অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। এই দুজন লোকের গায়ে উর্দি ছিল না। তাই পুলিশের মত চেহারা দেখে সহকর্মীরা ওদের পুলিশ বলে সন্দেহ করলেও কখনও ভাবতে পারেনি নারীহরণের মামলা নিয়ে পুলিশ আমাকে জেরা করতে এসেছে।

পুলিশ অফিসার দুজন আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহারই করলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—ওই পরিবারের সঙ্গে আমার কতদিনের পরিচয়। আমি ওদের কীভাবে চিনলাম। আমি সুতনুকা নিরুদ্দেশ রহস্য সম্পর্কে কতদূর জানি?

আমি বললাম—ওদের বাড়ির সঙ্গে আমার কয়েক মাস কোন সম্পর্কে নেই। বলে সেদিনের রাতে মামীমার আমাকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনাটা বললাম।

সুতনুকা কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

দেখুন, ওদের বাড়ি এমন কনজারভেটিভ যে মেয়েদের ইস্কুলে যাবার সময়ও একজন ঝি পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতার কোন পথঘাট ওরা চেনে না। কাজেই কোন বান্ধবীর বাড়ি হয়তো সে লুকিয়ে আছে। তবে এমন বান্ধবী যার বাড়ি হাঁটা পথের মধ্যে। আপনি বললেন— সে দুপুরে হঠাৎ এক বস্ত্রে চলে যায়। টাকা-পয়সাও খোয়া যায়নি। ওই মেয়ে এক বস্ত্রে আর কোথায় বা যেতে পারে? আপনারা ওর ক্লাসের বান্ধবীদের ঠিকানা যোগাড় করে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জেরা করুন।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে অফিসার দুজন বিদায় নিলেন।

পর পর দুদিন আর কিছু ঘটল না। তৃতীয় দিন রাতে নাইট ডিউটি। নাইট ডিউটির দিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যাই, রাত বারোটার পর অফিসের গাড়ি পৌঁছে দেয়। সপ্তাহে একদিন এই ডিউটি বেশ হাল্কা। রাত নটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে সময় কাটে। হয়তো মাঝে মাঝে কোন রিপোর্টার ট্যুরে গেলে তাদের ট্রাঙ্ককল ধরে খবর লিখে নিতে হয়। রাত দশটার পর থেকে আমরা হাসপাতাল, লালবাজার কন্ট্রোল ও রেল কন্ট্রোলে কয়েক রাউন্ড ফোন করি। তারপর অন্য কাগজের নাইট ডিউটি রিপোর্টারের সঙ্গে খবর বিনিময়ের ছুতো করে আর এক প্রস্থ আড্ডা চলে। রাত দশটা নাগাদ একটা ফোন এল।

বেয়ারা নরেন বলল—আপনার ফোন। এই সময় স্টেটসম্যান কিংবা অমৃতবাজারের রিপোর্টাররা ফোন করে। কিছু পেলে নাকি? চাকরিটা রেখো কিন্তু।

আমরাও আবার এই কথাই বলি।

অনেক সময় আবগারি বিভাগ থেকে ফোন আসে। এক কেজি বেআইনি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। নেবেন নাকি?

নাইট ডিউটির মাস্ট খবর ওয়েদার। আবহাওয়া অফিস নিজেরাই ফোন করে জানায়। ক্লিয়ার স্কাই। স্লাইট চেঞ্জ ইন নাইট টেম্পারেচার। ম্যাক্সিমাম মাইনাস টু। মিনিমাম এত মাইনাস ওয়ান। নাইনটি পারসেন্ট। নাইন্টি থ্রি পার্সেন্ট। নিন। এই সব সাঙ্কেতিক কথাগুলি লিখে স্টোরি বানাতে হয়। গোলমেলে আবহাওয়া থাকলে ওরা বলেন—একটা স্টোরি আছে নেবেন নাকি?

আজকের আবহাওয়া খবর এসে গেছে। কপি লিখেও পাঠিয়ে দিয়েছি।

তাই খুব দরকারি ফোন নয় মনে করে ধীরে সুস্থে ধরলাম। ওপার থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

—পার্থদা, আমি সুতনুকা বলছি।

ঘরের মধ্যে একটা বোমা ফাটলেও আমি এত আশ্চর্য হতাম না।

একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম—সুতনু, তুমি কোথায়? জানো, তোমার জন্য আমার হাতে হাতকড়া পড়তে বসেছে। আমার চাকরি চলে যেতে বসেছে।

সুতনুকা বলল—আমি কী করবো পার্থদা আমি কী করবো?

আমি বললাম—তুমি বাড়ি চলে আসবে—

—না, বাড়ি আমি ফিরব না, বাড়ি ফিরলে মা আমায় আস্ত রাখবে না। আমায় মেরে ফেলবে—

তাহলে তুমি আমায় ফোন করছ কেন?

আমি খবর পেলাম আমার মা আপনার বাড়ি গিয়েছিল। আপনাকে সন্দেহ করছে আপনি এর পিছনে আছেন। তাই আমি আপনাকে জানালাম, আমি বেঁচে আছি। আমায় কেউ খুন করেনি।

—তুমি কোথায় আছ?

আমার বান্ধবীর বাড়ি।

সেটা কোথায়?

তা আমি বলবো না।

তোমাকে বলতেই হবে সুতনুকা। তা না হলে পুলিশ আমাকে ছাড়বে না।

আমি তা বলতে পারব না। তবে আমি যেখানেই থাকি আপনাকে ফোন করবো।

আমি বললাম—কী হয়েছিল আমাকে বলবে সুতনু। কেন তুমি বাড়ি থেকে চলে গেলে...।

সুতনুকা বলল—আমি একটি ছেলেকে ভালবাসি পার্থদা। ছেলেটির নাম বলব না। আমাদের পাশের পাড়াতেই থাকে। নামকরা লোকের ছেলে। ও হয়তো লেখাপড়ায় অত ভাল নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি ওর পাশে থাকলে ও জীবনে দাঁড়াবে।

আমাদের প্রেমের কথা মা জানতে পারে। তারপর প্রচন্ড মারধর করে। আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখে। আমি কোনরকমে খিল খুলে পালিয়ে এসেছি। বাড়ি আমি ফিরব না। ওর বাড়ির লোক আমায় খুব ভালবাসে। তাবা আমাকে বাড়ির বউ করে নিতে চায়। আমরা রেজিস্ট্রি করবো।

আমি বললাম— তোমার বয়স এখনও আঠারো হয়নি সুতনু। তুমি আর একটা বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছ। এখন তুমি বাড়ি ফিরে যাও। মায়ের কাছে ক্ষমা চাও— আমি তোমার বড় ভাই-এর মত। আমি তোমায় বলছি। লালবাজারে আমি এমন অনেক কেস দেখেছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। মেয়ের বাবা -মায়ের অভিযোগে পুলিশ মেয়েটিকে ধরে এনে পাঠিয়েছে লিলুয়া উদ্ধার আশ্রমে। যা নরকের চেয়েও জঘন্য জায়গা। ছেলেটিকে পাঠানো হয়েছে হাজতে। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

বাল্যপ্রেম সত্যিই অভিশাপ। একটি ছেলের লেখাপড়া শেষ করে কর্মক্ষম হয়ে জীবনে দাঁড়াতে ত্রিশ বছর লেগে যায়। কুড়ি একুশ বছর বয়সেই মেয়েরা যুবতী হয়।

বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে। সব মেয়ের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ নেই। তাছাড়া যেসব মেয়ে অল্প বয়সে প্রেমে পড়ে তাদের অধিকাংশই পড়াশোনায় ভাল হয় না।

রোমিও ছেলেরাও তেমন প্রতিশ্রুতিবান নয়। ব্যতিক্রমের কথা বলছি না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা দেখেছি তা বলছি। প্রেমিকার চাপে পড়ে প্রেমিক কেরিয়র তৈরির আগেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়। তার মূল্য দিতে হয় সারাজীবন ধরে।

সুতনুকা কোন কথার জবাব দিল না। আমি বললাম, তুমি আমাকে আর আধঘণ্টা পরে ফোন করবে সুতনুকা। আমার আর একটা জরুরি ফোন এসেছে।

কথাটা মিথ্যা বললাম। সেই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা প্ল্যান খুলে গেল। আমি টেলিফোন নামিয়ে রেখে ডিডি ইন্সপেক্টর অর্ধেন্দু সরকারকে* ফোন করলাম।

—কী খবর পার্থবাবু এত রাতে?

আমি আমার সমস্যাটা খুলে বললাম। তারপর বললাম, সুতনুকা আর আধঘণ্টা পরে ফোন করবে। আপনি ফোন শুনে যদি তাকে খুঁজে বার করার একটা হদিশ দেন। অর্ধেন্দু বাবু বললেন, ঠিক আছে। আপনার অপারেটরকে বলবেন, ফোনটা আমার সঙ্গে ক্রশ কানেকশন করে দিতে।

আধঘণ্টা পরে সুতনুকা আবার ফোন করল।

সুতনু, কিছু ঠিক করলে?

কী?

তুমি বাড়ি ফিরে যাবে কিনা।

আমি তো বলেছি যাবো না।

তুমি পরের বাড়ি এভাবে কতদিন থাকবে?

যে কদিন পারি।

তোমার ক্লাশের বান্ধবী?

হ্যাঁ।

তার বাবা-মা অ্যালাউ করছেন এটা?

ওর বাবা জানে না। মেয়ে যা বলবে মা তা করবে। মাসীমা আমাকে খুব ভালবাসেন।

অনু কিছুতেই রাজি হল না বাড়ি ফিরে যেতে।

আমি অর্ধেন্দুবাবুকে বললাম—আপনি শুনলেন তো? কোন এক বন্ধুর বাড়িতে আছে। ফ্ল্যাট নয়, বাড়ি, যেখানে অনেকগুলি ঘর। মেয়ে বাইরের কাউকে লুকিয়ে রাখলেও বাবা জানতে পারে না।

—আপনি দেখছি পুলিশের সঙ্গে থেকে থেকে পুলিশ হয়ে উঠছেন। অর্ধেন্দুবাবু বললেন।

—ভুলে যাবেন না। আমি গোয়েন্দা গল্পও লিখে থাকি।

— মোক্ষম ক্লু ধরেছেন। এমন বান্ধবী যার বাবার বড় বাড়ি আছে।

* অর্ধেন্দুবাবু পরে এসি ডিডি হয়ে অবসর নেন।

—এবং বাড়িটি ওর বাড়ি থেকে দূরে নয়। ও হেঁটেই গিয়েছে। ওর কাছে ট্রাম ভাড়া ছিল না। ও তখন পাগলের মত হয়ে যায়? যার কথা প্রথম মনে হয়েছে তার কাছে গিয়েই উঠেছে।

—দি আইডিয়া। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমতে যান।

—আমাকে এখনও আরও দেড়ঘণ্টা থাকতে হবে এখানে।

মিসিং স্কোয়াড এনকোয়ারি করছে বলছিলেন না? আই ও কে বলুন তো...

—দুজন তো এসেছিলেন। একজনের নাম মনে আছে সোমেশ দাশগুপ্ত।

—কালো লম্বা। চোখে চশমা?

—এগজ্যাকটলি।

—আমি চিনি। *কালই আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো। অর্ধেন্দুবাবু টেলিফোন রেখে দিলেন।*

তিনদিনের মাথায় আই ও সোমেশবাবু আবার এলেন।

মেয়েটি রেসকিউ হয়েছে। আপনাকে জানাতে এলাম।

রিয়েলি। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম—চা খান। আমাদের ক্যান্টিনের চা-এর অবশ্য সুনাম নেই।

অর্ধেন্দুবাবুকে আপনি বলেছিলেন ভালই করেছিলেন।

উনি আমাকে যে ক্লু দিলেন, তাতেই বিকভারি হল। সুকিয়া স্ট্রিটে অমুক বাবুর বাড়িতে ছিল। সত্যিই বিশাল বাড়ি। তিনতলার ঘরে দিব্যি তোফা আরামেই ছিল মেয়েটি। আমরা যেতেই অমুকবাবুতো গাছ থেকে পড়লেন। তাঁর মেয়েকে ডাকতে সেই সব স্বীকার করল। তারপর তিনতলা থেকে সুড় সুড় করে নামল সুতনু না কি যেন নাম মেয়েটার— তাকে বাড়িতে বাবা-মায়ের হেফাজতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

আমি কিন্তু যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়েছি আপনাকে হ্যারাজ করার জন্য। যতদূর বুঝলাম ওদের বড় মেয়ের মনেই সন্দেহ হয়েছিল—আপনি মেজমেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন।

এ পৃথিবীতে যা অবধারিত তাই ঘটে থাকে। কক্ষচ্যুত উল্কার পতনকে কি রোধ করা যায়? বন্ধ করা যায় কী জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প—চন্দ্রের কলাক্ষয়? অথবা পূর্ণচন্দ্রের মায়ামাখা জ্যোৎস্নাকে কী মুছে ফেলা যায়? আপনি, আমি, এই গাছ, এই তৃণ, এই আকাশ, এই বাতাস সবই তো প্রকৃতির নিয়মে আপন কাজ করে যায়। পৃথিবী তার কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে চলে। মানুষ শুধু পারে সাধ্যমত প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা যেখানে সে তা পারে না পারে শুধু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। নিজেকে সতর্ক করতে। পরিস্থিতিকে যতক্ষণ আয়ত্তের মধ্যে না আনতে পারে মানুষ, ততক্ষণই তার উদ্বেগ। আর পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এলেই তার আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম।

সুতনুকা অনু মামীমা সবাই তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। সুতনুকাকে তার

প্রেমিকের সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনের ক্লাশ টেনে পড়া সেই দুঃসাহসিনী বিয়ের পর ধীরে ধীরে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছে। বি এড পাস করে শিক্ষকতা করছে।

বহুকাল পরে একদিন সে নিজেই যোগাযোগ করে আমার বাড়ি এসেছিল। বলেছিল, আপনাকে দেখার বড় ইচ্ছা হয় পার্থদা। টিভিতে আপনাকে দেখি আর আমার মেয়েকে বলি দ্যাখ, এই আমার এক দাদা।

বাড়িটি ভাল করে দেখে সুতনুকা বলল, বাঃ, বেশ ভাল বাড়ি করেছেন তো পার্থদা।

বাড়ির নাম কী রেখেছেন?

আমি বলেছিলাম, তোমার মাকে বহুকাল আগে বলেছিলাম সুতনুকা, যে বাড়ি আমি আমার নিজের প্রয়োজনেই করবো। তাই করেছি। এখনও নাম দিইনি। তবে একটা নাম মনে মনে পছন্দ করে রেখেছি।

—কী নাম?

আমি বললুম—অহঙ্কার। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি সুতনু। যতই অহঙ্কার থাক না মনে মনে, যতই রাগ পুষে থাকি না কেন, যতই অভিযান জমা হয়ে থাকুক না কেন বুকে—জীবনের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছি আমি। তার মধ্যে একটা বড় জিনিস হল—

উপেক্ষা করো, উপেক্ষা করো।

ইগনোর—ইগনোর।

যা কিছু ছিল দুঃখ আজ তা হয়েছে শান্তি।

বাড়ির নাম তাই রেখেছি শান্তম্।

অনু কি বুঝল কে জানে, বড় বড় চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

অমিতাভ চৌধুরী ১৭৮
অনিতা বসু (শেঙ্কল) ১৯৮
অম্বিকা চক্রবর্তী ১১৪
অতুল্য ঘোষ ১৪৪-৪৫
অজিত কৃষ্ণ বসু ৯৮
অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯
অমলেন্দু দাশগুপ্ত ৯৭
অনিল ভট্টাচার্য ২০৭
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১২৭
আলি আকবর ১২৫
উপানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৫১
উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৯৯
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৬৬, ৬৭, ৭৮, ১৩৯
এমিলি শেঙ্কল ১৯৮
কৃষ্ণধব ১৩১
কানাইলাল সবকাব ১২৮, ২৩২
কানাই মহাবাজ ১০০, ১০৫
চিত্তমোহন চট্টোপাধ্যায় ১০৩, ১৫৮
গৌবকিশোব ঘোষ ১২২, ১২৩, ২১৯
জহবলাল নেহরু ৯০
প্রবীব সান্ডেল ১১২
প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১০, ৯০ ৯১
পল্লব সেনওপ্ত ১৪০
তরুণকান্তি ঘোষ ১০৬, ১১৪, ১১৬, ১২৬ ১২৯, ২০৭, ২১৮
নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬
নিশাপতি মাঝি ৯৫
পবিত্র সবকাব ১৩৭
প্রশান্ত সবকাব ১২২
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৭
ফারুকি ওমব ১৫৯
দিলীপ বসু ১১০
নবেন বিশ্বাস ১০০, ১০৪
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ১৩৬
ম্যাকমিলান হ্যারল্ড ১৯০
বংকিম বিহাবী বন্দোপাধ্যায় ৭২, ১২৭
বিনোদ বসু ১৯১, ২১৯২
বিনোবা ভাবে ২১৬
ডাঃ বিধান চন্দ্র বায ১১০, ১৪৯, ২২৩-২৪, ২৩১
বিমল চন্দ্র সিংহ ১৪৪
ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ১২০, ১২২, ১২৬, ২২৮
বরুণ সেনগুপ্ত ১২৭, ২২৮
বিকাশ চক্রবর্তী ৯১-৯২
বিপিনবিহাবী গঙ্গোপাধ্যায় ৮৯
বিনোদ বিহাবী চক্রবর্তী ৯২
বীরু সবকাব ১০৭
ভবানী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৬৭, ১৫৮
মহম্মদ গোলাম কবসি ৯১
শচীকান্ত হাজাবি ৯৫
শিবনাথ বন্দোপাধ্যায় ৯২
শ্রীনিবপেক্ষ ১১৭
শ্যামল ভট্টাচার্য ৯৩, ১১০
শুভংকব চক্রবর্তী ১৩৭, ৩৮, ১৪৯
সত্যবঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৮৮
সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ১২৭
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন২৬৭
সমীব কুমাব দাস ৯৩
সীতাবাম পোবেল ৯৩
সুখবঞ্জন দাশওপ্ত ১২৭
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ১০০
সুহৃদ ভৌমিক ১১৭
সত্যসুন্দব চক্রবর্তী ১২৮, ২৫০
হবযিত ঘোষ ১০৩
হিমালয় নির্ঝব সিংহ ১৩৯
হবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২১১

প্রকাশিত হবে

হতাশ হইনি

২য় খণ্ড

হতাশ হইনি প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত লেখকের জীবন কাহিনীর পটভূমিতে সমকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হচ্ছে চীনা আক্রমণের পর ভারতে রাজনৈতিক পালাবদলের ক্রান্তিকাল থেকে। তখন দেশের রাজনীতি ও জনজীবনে উথালপাতাল চলছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের জীবনসন্ধ্যা, নকশাল আন্দোলনের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন, কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামপন্থী সরকার, বাংলাদেশ যুদ্ধ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লেখকের অভিজ্ঞতা, জরুরি অবস্থা। আশির *দশকে পরিবর্তন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাময়িকপত্রের যুগপরিবর্তন, লেখকের* দ্বিতীয় পর্যায়ে আনন্দবাজারে যোগদান ও, বঙ্গলোক পত্রিকার মাধ্যমে তৃতীয় সাংবাদিকতার পরীক্ষা শুরু। ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমপরিবর্তন। সেই সঙ্গে লেখকের বার বার বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এর পাশাপাশি সমান্তরালভাবে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ঈর্ষা ষড়যন্ত্র ও দীর্ণতার কাহিনী। অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে বহুর মাঝে নিঃসঙ্গ একা এক যাত্রী-মানবের আত্মকাহিনী। স্বজন-উপেক্ষিত স্বেচ্ছানির্বাসিত লেখক যাঁর হতাশ হবেন না মন্ত্র হাজার হাজার তরুণকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁর আত্মকাহিনী ব্যক্তি মাৎসর্যের বিরুদ্ধে উত্তরণের এক দলিল, যা শুধু ইতিহাস নয়, সহায় সম্বলহীন তরুণ তরুণীদের অনুপ্রেরণা।